বুদ্ধদেব।

(যবদ্বীপস্থ কোন প্রস্তর-মূর্ত্তি হইতে গৃহীত ও
শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক চিত্রিত।)

শুদ্ধিপত্র।

(অতিরিক্ত)

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
সোপানপরস্পরা	৬১	১৩	সোপানপরস্পরা
নির্ম্মান	৮১	৬	নির্ম্মাণ
পূব্বক	৯২	১৬	পূর্ব্বক
উঠিয়া	১০২	২	উঠিয়া
সরনাথ	১০২	১১	সারনাথ
গৌতম ও রাহুল	১৬৯	১১	গৌতমপুত্র রাহুল
ধর্ম্মপ্রচার	২০৭	১৯	ধর্ম্মপ্রচারক
প্রসাদে	২১০	৭	প্রাসাদে
আমেরিকায়	২১১	১২	আমেরিকার
পুর্ব্ব	২১২	৩	পূর্ব্ব
মহত্ত্বর	২৩৫	১৬	মহত্তর

কলিকাতা।

২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখাজাতি পুনপ্পুনং
গহকারক! দিট্‌ঠোহসি, পুন গেহং নকাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা।

জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপনে আছে এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ,
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর।
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহ-ভিত্তিচয়,
সংস্কার বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

মূল্য ২৲ টাকা।

উৎসর্গ।

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড়দাদা মহাশয়ের

শ্রীচরণ কমলে—

সূচী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পৃষ্ঠা।

বুদ্ধজীবনী।—

মহাভিনিষ্ক্রমণ—বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি—ধর্ম্মপ্রচার—শেষকথা—পরিনির্ব্বাণ— ১—২০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধ ইতিহাসের কাল নির্ণয়—

বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ—অশোকের অনুশাসন লিপি—গ্রীকদূত মেগাস্থিনীস—চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান, হুয়েন সাং—কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য— ২১—২৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস।—

দর্শন,—নীতি,—দশানুশাসন—কর্ম্মফল—জাতক-মালা—আত্মতত্ত্ব—পঞ্চস্কন্ধ—পরকাল ও নির্ব্বাণ— ২৬—৬৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পৃষ্ঠা।

বৌদ্ধ সঙ্ঘ।—

মধ্যপথ—সঙ্ঘের গঠন,—দলাদলি—বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড—পৌরোহিত্য—জাতিবিচার— ৬৭—৮৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সঙ্ঘের নিয়মাবলী।—

প্রবেশ—আহার—পরিচ্ছদ — বাসস্থান—দারিদ্র্যব্রত—পূজা—ভাবনা, ধ্যান, সমাধি—তীর্থ-দর্শন—প্রায়শ্চিত্তবিধান—পঞ্চায়ৎ—শিলাদিত্যের দানোৎসব— ৮৭—১১৪

ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ— ১১৪—১২৬

বৌদ্ধ গৃহস্থ— ১২৬—১৩২

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র।—

ত্রিপিটক—ধর্ম্মপদ—মিলিন্দ-প্রশ্ন—দ্বীপ-বংশ—মহাবংশ—ললিত বিস্তর— ১৩৩—১৫২

পালিভাষা—আর্য্যভাষা লতিকা— ১৫৩—১৫৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পৃষ্ঠা।

বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর ও বিকৃতি।—

মহাযান হীনযান—ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম—সেণ্ট জোসাফৎ—বুদ্ধতত্ত্ব, হীনযান মত—বুদ্ধতত্ত্ব, মহাযান মত—বোধিসত্ত্ব—ধ্যানীবুদ্ধ—আদিবুদ্ধ — তান্ত্রিকতা — তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম—প্রার্থনা চক্র—ওঁ মণিপদ্মে হুঁ—লামাধর্ম্ম—লামার সহিত শরৎচন্দ্র দাসের সাক্ষাৎকার—স্বর্গ নরক—দার্শনিক শাখা—সম্প্রদায় ভেদ— ১৫৮—১৮৭

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার ও ধ্বংস।—

শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ মণ্ডলী—ধর্ম্মপ্রচার—অশোক রাজা— সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম — চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম—রাজা কনিষ্ক—মার্কিন দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম — উপসংহার — বৌদ্ধধর্ম্ম লোপের কারণ নির্ণয়—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব—জগন্নাথ ক্ষেত্র— ১৮৮—২২৭

পরিশিষ্ট।

তেবিজ্জ সূত্ত।—

ব্রাহ্মণ যুবকের প্রতি বুদ্ধদেবের উপদেশ—ব্রহ্মলাভের উপায়—ব্রহ্ম, ব্রহ্মা।— ২২৮—২৪০

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
পঃখ	৫	৮	দুঃখ
আশ্রহু	৫	১০	আশ্রয়
উপস্থিত	৭	১৩	উপস্থিত
সাস্থনা	১৩	৭	সান্ত্বনা
সই	১৯	১৬	সেই
প্রচণ্ড	২০	১৫	প্রচণ্ড
দাদ্বশ	২৬	২৬	দ্বাদশ
করিয়ফুটিয়া	৩৪	২২	করিয়া ফুটিয়া
ক্রোধ	৩২	১৭	ক্রোধ
দৈবং কুরু	৩৬	১৪	দৈবং নিহত্য কুরু
মৃত্তিতে	৩৮	২৪	মূর্ত্তিতে
অস্তত্ব	৫৫	৪	অস্তিত্ব
বিছিন্ন	৫৬	২০	বিচ্ছিন্ন
যস্মাৎ	৫৮	১	যস্মাৎ
অভাবনীচ	৫৮	৬	অভাবনীয়
কথত	৬০	১২	কথিত
সোহহম	৬৩	২০	সোঽহং
পরিজ্ঞাত	৯৯	২১	পরিজ্ঞান
এয়স্ত্রিংশ	১০৫	২২	ত্রয়স্ত্রিংশ
জীবদ্দশার	১২৫	৬	জীবদ্দশায়
বদ্ধিত	১৩৭	২১	বৰ্দ্ধিত

থয়মঞ্জগা	১৩৮	২৪	থয়মজ্ঝগা
নির্শ্বান	১৩৯	২	নির্ম্মাণ
লাতিকা	১৫৬	১০	লতিকা
উৎসহিত	১৬২	১৯	উৎসাহিত
বদ্ধই	১৬৭	২২	বুদ্ধই
কাননন্	১৭২	২৪	কান্-নন্
তিন	১৯২	২২	তিনি
জম্ম	২০০	৬	জন্ম
কয়িয়াছে	২০২	৬	করিয়াছে
উদয়	২০৭	১০	উদয়
অশ্বথ্র	২০৮	৪	অশ্বথ
এইরূপঁ	২১০	২১	এইরূপ
হিন্দূ	২২৭	১৭	হিন্দু
উৎসর্গ্র	২৩৫	১৯	উৎসর্গ

বৌদ্ধধর্ম্ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস মানবধর্ম্মের ভিত্তিভূমি বলিয়া সামান্যতঃ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা কি আশ্চর্য্য নহে যে অনাত্মবাদী নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম দেশবিদেশে প্রবেশ-লাভ করিয়া কোটি কোটি মনুষ্যের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে; এমন কি, ভক্তসংখ্যানুসারে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের মধ্যে তাহাকে সর্ব্ব-প্রধান আসনের যোগ্য বলিয়া মানিতে হয়? বুদ্ধদেব প্রকাশ্য ভাবে নাস্তিক বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন তাহা নহে, তথাপি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে তাঁহার ধর্ম্মকে 'নিরীশ্বর' ধর্ম্ম বলা অসঙ্গত বোধ হয় না; আর ইহা নিশ্চয় যে তাঁহার সময়ে ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ববিষয়ে [illegible] ও বিশ্বাস জনসাধা-রণে প্রচলিত ছিল, তিনি তাহার [illegible] দণ্ডায়মান ছিলেন। আমরা ত্রিবিদ্যাসূত্রে দেখিতে পাই বুদ্ধদেব কি ভাবে আর্য্য-দেবতা ব্রহ্মকে বৌদ্ধ মন্দিরে স্থান দান করিয়াছেন। এই সূত্রে ব্রাহ্মণ যুবকদ্বয়ের প্রতি তাঁহার যে উপদেশ আছে, তাহাতে ব্রহ্মলাভের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বুদ্ধ-প্রদর্শিত পথ বিশুদ্ধ নীতিমার্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আত্ম-

সংযম, ইন্দ্রিয়-দমন, বাসনা-বিসর্জ্জন—এই সকল উপায়ে, ন্যায়, সত্য, ক্ষমা, দয়া ও বিশ্বব্যাপীমৈত্রীগুণে আত্মোন্নতিসাধন করাই তাঁহার মতে ব্রহ্মসন্মিলনের অব্যর্থ উপায়। বৌদ্ধধর্ম্মনীতির চারিটি প্রধান তত্ত্ব 'ধর্ম্মচক্র' বলিয়া বৌদ্ধসমাজে প্রসিদ্ধ আছে, স্বয়ং বুদ্ধ সেই ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করেন। ইহার বিবরণ বুদ্ধ-জীবনীতে বর্ণিত ; সে জীবনী সংক্ষেপে এই—

গৌতম বুদ্ধ খৃষ্টের পূর্ব্বতন ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত কপিল-বাস্তু নগরে শাক্য-রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র, তাঁহাব মাতা মায়াদেবী, ভার্য্যা যশোধরা ও পুত্র রাহুল। যখন তাঁহার উনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন সংসার দুঃখময় বলিয়া তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় এবং এই দুঃখভার হইতে জীবের পরিত্রাণ সাধনোদ্দেশে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হন। এই মহান্ সঙ্কল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া কোন এক রাত্রিতে যখন তাঁহার প্রিয়তমা যশোধরা শিশুটিকে কোলে লইয়া রাজভবনে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় তিনি চুপে চুপে উঠিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া কহিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সেই তাঁহার মহাভিনিষ্ক্রমণ। তিনি প্রথমে মগধরাজ্যের রাজধানী রাজগৃহে, পরে গয়ায়, তদন্তর বারাণসীতে গিয়া ধ্যান ধারণা সাধনা ও ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সাত বৎসর ধরিয়া তিনি উপোষণপ্রভৃতি তপশ্চর্য্যায় রত থাকিয়া পশ্চাৎ অভীপ্সিতফললাভে বঞ্চিত হইয়া তাহা হইতে বিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে তাঁহার প্রথম পাঁচটী শিষ্য তাঁহাকে উদরপরায়ণ বিবেচনায় পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হন। এই অসহায় অবস্থায় তিনি একাকী

ভ্রমণ করিতে করিতে এক রাত্রে এক বৃক্ষতলে গিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া প্রবুদ্ধ হইলেন; তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। সেই অবস্থায় তিনি জগতের যে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল অবলোকন করেন, তাহা এই—

অবিদ্যা হইতে সংস্কার (সংস্কার)
সংস্কার হইতে বিজ্ঞান (সংজ্ঞা)
বিজ্ঞান হইতে নামরূপ
নামরূপ হইতে ষড়ায়তন অর্থাৎ মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়
ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ
স্পর্শ হইতে বেদনা
বেদনা হইতে তৃষ্ণা
তৃষ্ণা হইতে উপাদান (আসক্তি)
উপাদান হইতে ভব
ভব হইতে জন্ম
জন্ম হইতে রোগ শোক জরা মৃত্যু দুঃখ যন্ত্রণা।

অবিদ্যাই সকল দুঃখের মূল। অবিদ্যা নাশে সংস্কার বিনষ্ট হয়, সংস্কার বিনষ্ট হইলে সংজ্ঞা বিনষ্ট হয়, পরে নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, তৃষ্ণা, আসক্তি প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে বিনষ্ট হইলে জন্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়; পরিশেষে জরা মৃত্যু রোগ, শোক, সর্ব্বদুঃখ বিদূরিত হয়। এইরূপে দুঃখের মূলকারণ ও মূলচ্ছেদ বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিলেন।

এই গভীর ধ্যানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে 'মার' অর্থাৎ যম বা শয়তান কত ভয়, কত প্রলোভন দেখাইয়া অশেষ প্রকারে পীড়ন দ্বারা, শয়তান যেমন যীশুখৃষ্টের প্রতি করিয়াছিল,

বুদ্ধকেও সেইরূপ বিপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু বুদ্ধ অটল রহিলেন। এইরূপে বুদ্ধত্ব পাইবার পর তিনি একাকী সন্দিগ্ধ মনে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহা লোকের মধ্যে বিতরণ করিবেন কি না এই সমস্যা। অবশেষে ব্রহ্মা সহাম্পতি স্বর্গ হইতে নামিয়া তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন ও উৎসাহ-বাক্যে তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারে উৎসাহিত করিলেন। ব্রহ্মার প্ররোচনায় বুদ্ধদেব সত্যপ্রচারে বাহির হইলেন। প্রথমে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিষ্য সেই পঞ্চ ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান-মানসে বারাণসীক্ষেত্রে তাঁহাদের বাসস্থানে উপনীত হইলেন। শিষ্যেরা তাঁহাকে বসিবার আসন দিবে না ও তাঁহার কোনরূপ আতিথ্য করিবে না স্থির করিয়াছিল; কিন্তু তিনি নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহার সুন্দর গম্ভীর মূর্ত্তি ও অমানুষ প্রশান্তভাব দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিল; তথাপি পূর্ব্ব-পরিচিত বলিয়া কেহ তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকে—কেহ তাঁহাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করে—ইহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আমার নাম ধরিয়া ডাকিও না, আমাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিও না। তথাগত এখন সম্বুদ্ধ হইয়াছেন, দিব্য জ্ঞানলাভে লব্ধকাম হইয়াছেন। আমার উপদেশ শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা মোহবশতঃ বিপথে পদার্পণ করে; এক দিকে বিষয়-লালসা ভোগাসক্তি,—অন্যদিকে অনর্থক কঠোর তপস্যায় শরীর শোষণ। আমি মধ্যপথ আবিষ্কার করিয়াছি—সেই আষ্টাঙ্গিক সাধুমার্গ অবলম্বন করিয়া চলিলে দেখিতে পাইবে যে, ক্লেশের মূলচ্ছেদ হইবে,—শান্তি ও নির্ব্বাণমুক্তি তাহার অব্যর্থ ফল।"

এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুরা অবহিত হইলেন ও তখন বুদ্ধদেব যে উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহাই ধর্ম্মচক্র,—তাহাতে চারিটি গভীর তত্ত্ব সন্নিবেশিত আছে।—

প্রথম।—সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়। জন্মে দুঃখ, রোগে দুঃখ, জরামরণ দুঃখময়; যাহা ভাল লাগে না তাহার সঙ্গে মিলনে দুঃখ, ভালবাসার পাত্রের বিয়োগ দুঃখময়।

দ্বিতীয়।—বিষয়তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ।

তৃতীয়।—এই বিষয়তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটন করাতেই দুঃখ-নিবৃত্তি।

চতুর্থ।—দুঃখনিবৃত্তির আষ্টাঙ্গিক পথ আছে সেই পথ আশ্রয় করিয়া চলিলেই বাঞ্ছিতফললাভ হয়।

সে পথ কি—না

১। সম্যক্ দৃষ্টি।

২। সম্যক্ সঙ্কল্প—সঙ্কল্প ঠিক রাখা।

৩। সম্যক্ বাক্য—সত্য সরল প্রিয়বাক্য বলা।

৪। সম্যক্ কর্ম্মান্ত—সদাচরণ।

৫। সম্যক্ আজীব—সর্ব্বভূতে অহিংসাপূর্ণ সাধুজীবিকা অবলম্বন।

৬। সম্যক্ ব্যায়াম—আত্মসংযম প্রভৃতি উপায়ে আত্মোৎকর্ষ সাধন।

৭। সম্যক্ স্মৃতি—ধারণা ঠিক রাখা।

৮। সম্যক্ সমাধি—জীবনের সুগভীর তত্ত্ব সকলের ধ্যান, মনন, নিদিধ্যাসন।

এই আষ্টাঙ্গিক সাধুমার্গ অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে

পথে কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, বিচিকিৎসা প্রভৃতি যে কয়েকটি সংযোজন অর্থাৎ বন্ধন আছে, তাহা ছেদন করিতে হইবে। এই নির্দ্দিষ্ট পুণ্যপথে চলিলে দুঃখ শোক অতিক্রম করিয়া জীব নির্ব্বাণরূপ পরমপুরুষার্থ লাভে সমর্থ হইবেন।

শাক্যমুনি যে সময়ে প্রাতুর্ভূত হন, সে সময়ে বৈদিক পূজার্চ্চনা কতকগুলি জটিল কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে, এই সকল ক্রিয়াকর্ম্মের উপদেশদাতা যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত—তাঁহার আধিপত্যের সীমা নাই। তিনি ব্রাহ্মণাধিপত্যের বিরুদ্ধে*—ব্রাহ্মণদিগের জাত্যভিমানের বিরুদ্ধে—ব্রাহ্মণদিগের বাহ্যাড়ম্বরময় ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে—তাঁহার সরল ধর্ম্ম—সত্য, অহিংসা, ক্ষমা, দয়া, মৈত্রী, আত্মসংযম, সদাচার—প্রচলিত সহজ গ্রাম্য ভাষার আপামর সাধারণ সকল শ্রেণীর মধ্যেই প্রচার করিলেন। তিনি এইরূপে উৎসাহ এবং ওজস্বিতাসহকারে প্রায় ৪৫ বৎসর কাল অযোধ্যা, মিথিলা, বারাণসী এই সমস্ত রাজ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক স্বমতানুযায়ী ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত থাকেন এবং অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমের পর দেহত্যাগ করেন। বারাণসীতে অবস্থিতি কালে প্রথমে উল্লিখিত পঞ্চ ভিক্ষু তাঁহার উপদেশক্রমে দীক্ষিত হয়। ক্রমে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল বর্ষানন্তর তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে একত্র করিয়া এই উপদেশ দিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আমার উপদেশ লাভে এইক্ষণে

---

* আমি এ কথা বলিতে চাহি না যে, বুদ্ধদেব প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি যে ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, তাহাতে ফলে তাহাই দাঁড়াইয়াছিল সন্দেহ নাই। শুধু ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান কেন তিনি সকল প্রকার অভিমানেরই বিরোধী ছিলেন।

পঞ্চরিপু দমন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়াছ। এখন তোমাদের কর্ত্তব্য যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গিয়া উচ্চ নীচ সকল লোকের মধ্যে আমার উপদিষ্ট সত্য ঘোষণা কর। আমি এক্ষণকার মত উরুবেলার বনে গিয়া আমার ব্রত উদ্‌যাপন করি।” উরুবেলায় কিয়ৎকাল বাস করিয়া তিনি কতিপয় নূতন শিষ্য সংগ্রহ করিলেন এবং সেখান হইতে রাজা বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহে সশিষ্য যাত্রা করিলেন। রাজা বহু সম্মানপূর্ব্বক বুদ্ধদেবের দর্শন ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরদিন তাঁহাকে ভিক্ষুমণ্ডলী সহ রাজবাটীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। বুদ্ধদেব যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন এবং আহারাদি সমাপ্ত হইলে বেণুবন (বাঁশ বন) নামক এক সুরম্য উদ্যান গুরুদক্ষিণাস্বরূপ বৌদ্ধসমাজকে দান করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। বুদ্ধদেব এখানে অনেক বৎসর বর্ষকাল যাপন করেন এবং তাঁহার অনেক উপদেশ এখান হইতেই প্রদত্ত হয় বলিয়া এই স্থান বৌদ্ধদের মহাতীর্থরূপে প্রসিদ্ধ।

ইত্যবসরে এক সময়ে তিনি কপিল-বাস্তু গিয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সে রাজ্য হইতে প্রজাবৎসল যুবরাজ যখন বৈরাগ্য-দীপ্ত হৃদয়ে বাহির হইয়াছিলেন, সে এক কাল, আর এইক্ষণে সন্ন্যাসী বেশে, মুণ্ডিত কেশে, ভিক্ষাপাত্র হস্তে সেই রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া গৌতম দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন শুনিয়া রাজা শুদ্ধোদন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তিনি যেখানে ছিলেন সত্বর আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং কাতর স্বরে কহিলেন এই কি আমাদের শাক্যকুলপ্রদীপ যুবরাজ সিদ্ধার্থ ? তুমি দ্বারে

দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছ এ কি কখন সহ্য হয়? হা বৎস! এরূপ কেন হইল?” বুদ্ধ উত্তর করিলেন “মহারাজ! আমার কুলধর্ম্ম এই।” মহারাজ কহিলেন “সে কি কথা? কোন্ বংশে তোমার জন্ম? ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজপুরুষেরা কি তোমার পিতৃপুরুষ ছিলেন না? তাঁহাদের মধ্যে কেহ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, কেহ কখন কি শুনিয়াছে?” গৌতম কহিলেন “আমার বংশ রাজবংশ নয়, বুদ্ধেরা আমার পূর্ব্ব পুরুষ। তাঁহাদেরই চিরন্তন প্রথানুসারে আমি ভিখারী বেশে এই রাজদ্বারে সমাগত হইয়াছি। কিন্তু মহারাজ; আত্মপ্রভাবে এবং প্রেমবলে সেই সে মলিনবসন দীন হীন ভিখারী, মহা-প্রতাপশালী রাজরাজেশ্বর অপেক্ষাও আজ তার উচ্চাসন। আমি যে অক্ষয় অমূল্য রত্ন ভেট লইয়া আসিয়াছি, তাহা পিতৃদেবের চরণে সমর্পণ করি আমার একান্ত ইচ্ছা, প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন।” শুদ্ধোদন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পুত্রের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। তথায় রাজা প্রজা মন্ত্রিবর্গ সভাস্থ সকলকে তিনি তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। চতুর্মহাসত্য, অষ্টমহামার্গ, আত্মসংযম, বৈরাগ্য, অহিংসা, অনুকম্পা, মৈত্রী, শাশ্বত শান্তিরূপিণী নির্ব্বাণ-মুক্তি এই সকল সত্য অমৃতধারার ন্যায় বর্ষিত হইল। সেই উপদেশ শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদন প্রীত হইলেন; তাঁহার সকল সংশয় দূর হইল, সকল ক্ষোভ মিটিয়া গেল।

যখন রাজপুত্র প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য রাজপরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলেই উপস্থিত হইল, কেবল যশোধরা নাই। বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,

"যশোধরা কোথায় ?" তিনি আসিবেন না শুনিয়া গৌতম রাজার সহিত স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখেন, যশোধরা মলিনবেশে রুক্ষ আলুলায়িতকেশে ঘরে বসিয়া আছেন। স্বামীকে দেখিয়া তাঁহার চিরসম্বরিত প্রেমাশ্রু উথলিয়া উঠিল। তাঁর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে রাজাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে এক পার্শ্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অভাগিনী যশোধরা এতকাল পতিবিরহে দীনবেশে, অনাহারে, অনিদ্রায়, কষ্টে দিনযাপন করিতেছিলেন, রাজা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। বুদ্ধের মন গলিয়া গেল। তখন তিনি যশোধরা পূর্ব্বজন্মে কিরূপ গুণবতী ছিলেন তাহার এক 'জাতক' গল্প বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। পরে তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণে তাঁহার হৃদয় মন আকৃষ্ট হইল ও বৌদ্ধদের মধ্যে সন্ন্যাসিনীশ্রেণী স্থাপিত হইবার পর তিনি বৌদ্ধসন্ন্যাসিনীর মধ্যে প্রধানা বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

কপিল-বাস্তুনিবাসীর মধ্যে অনেকে বুদ্ধ-উপদেশ গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা বৌদ্ধসমাজভুক্ত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে সিদ্ধার্থের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আনন্দ একজন—তাঁহার শ্যালক দেবদত্ত, নাপিত উপালি, রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র অনিরুদ্ধ। আনন্দ বুদ্ধের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় তৎপর থাকিয়া তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে যশোধরা তাঁহার পুত্র রাহুলকে রাজপুত্রের মত বেশভূষায় সাজাইয়া তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। রাহুলের বয়স তখন সাত বৎসর। পাঠাইবার সময় বলিলেন, "ওই যে সাধু দেখছিস্, ঐ তোর পিতা। ওর কাছে কত টাকা কড়ি ঐশ্বর্য্য আছে,—

কাছে গিয়া তোর বাপের ধন ভিক্ষা চাস্।” রাহুল বলিল—“আমার পিতা? রাজাইত আমার বাবা, আর কে?” যশোধরা বুদ্ধকে দেখাইয়া দিলেন। রাহুল বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া আপন পৈতৃক সম্পত্তি ভিক্ষা করিল। বুদ্ধ কহিলেন, “বৎস! সোণা, রূপা, মণি, মাণিক্য আমার কাছে নাই। আমার কাছে যে সত্যরত্ন আছে, তাহা আমি দিতে পারি, যদি আমাকে কথা দেও যে, তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে।” এই বলিয়া রাহুলকে তাহার ধারণানুসারে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং বালক পিতৃ-উপদেশ গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধসমাজভুক্ত হইল।

এই বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। সিদ্ধার্থ গেল, আনন্দ গেল, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অনিরুদ্ধ গেল, এখন তাঁর পৌত্রটিকে তাঁর পার্শ্ব হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল, তাঁর রাজ্যাধিকারী আর কেহই রহিল না। রাজা সিদ্ধার্থের প্রতি এ বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করাতে সিদ্ধার্থ নিবেদন করিলেন, “মহারাজ যাহা হইয়াছে মার্জ্জনা করিবেন, ভবিষ্যতে এরূপ আর হইবে না। পিতৃব্যের অনুমতি বিনা অল্পবয়স্ক বালকের দীক্ষাবিধি নিষিদ্ধ—আমি এই নিয়ম করিয়া দিতেছি। এইরূপ অনেক আশ্বাস দিয়া কিছুদিন পরে পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাজগৃহের বেণুবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

বুদ্ধদেবের মহাবোধি বৃক্ষতলে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কপিল-বাস্তু গমন ও তথা হইতে রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত প্রায় আঠার মাস কাল

অতিবাহিত হয়। এই স্বল্পকালব্যাপী বুদ্ধজীবনীর ইতিবৃত্ত বৌদ্ধগ্রন্থ সকলে আনুপুর্ব্বিক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর কাল নির্ণয় করা সুকঠিন, কেন না সেই সমস্ত গ্রন্থে সে বিষয়ে কোন মিল নাই। যে সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণিত আছে, তাহা আর কিছুই নয়—গৌতম বুদ্ধের স্মরণীয় কোন কৃত্য অথবা স্মরণীয় কথাবার্ত্তা উপদেশ। এই স্থলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে—কেবল দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এইভাগ উপসংহার করা আমার ইচ্ছা।

বৌদ্ধধর্ম্মে সদ্যোদীক্ষিত সুরাপরন্তের একটি বণিক্ তাঁহার প্রতিবাসী আত্মীয়বর্গকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে সমুৎসুক হইয়া গুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করাতে বুদ্ধ কহিলেন,— "আমি শুনিয়াছি, সুরাপরন্তের লোকেরা বড়ই দুষ্ট, রাগী ও অত্যাচারী, তাহারা তোমার অপবাদ ও নিন্দা করিলে তুমি কি করিবে ?" তাহার উত্তর, "আমি চুপ করিয়া থাকিব।" "তাহারা যদি তোমাকে ধরিয়া মারে ?" ভিক্ষু কহিল, "আমি তাদের মারিব না।" "যদি তোমাকে বধ করিবার চেষ্টা করে ?" উত্তর,—"মৃত্যুর হাত এড়াইবার উপায় নাই, শমন ত আসিবেই, কিন্তু তাহাতে ভয় কি ? অনেকে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার জন্য অনেক সময় মৃত্যু চায়, কিন্তু আমি তা করিব না। তাকে ডাকিয়াও আনিব না, আর আসে ত বারণও করিব না।" এই উত্তরে গুরুদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচার কার্য্যে বাহির হইতে অনুমতি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আর এক সময় একটি যুবতী স্ত্রী তাহার পুত্রটী হারাইয়া পাগলিনীপ্রায় হইয়া ছুটাছুটি করিতেছিল। তাহার নাম কিসা-

গোতমী। অল্পবয়সে তাহার বিবাহ হয় ও তাহার একটি পুত্র জন্মে। শিশুটি দেখিতে অতি সুন্দর ছিল, আর বেড়াইতে শিখিবার বয়সেই সর্পদংশনে মারা পড়ে। গোতমী মৃত শিশুটি কোলে লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন, যদি কেহ কোন ঔষধ দিয়া তাহাকে বাঁচাইতে পারে। একজন বৌদ্ধভিক্ষু স্ত্রীলোক-টিকে বলিল,—"তুমি যে ঔষধ চাহিতেছ, আমার কাছে তা নাই। কিন্তু আমি জানি একজন তোমাকে ঔষধ দিতে পারেন। ঐ গৈরিকবসনধারী বুদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে যাও, বলিয়া দিবেন।" গোতমী বুদ্ধের নিকট যাইয়া বলিলেন, "প্রভো! আমি আপনার নাম শুনিয়া বড় আশা করিয়া আপনার কাছে এসেছি, এখন একটা ঔষধ বলিয়া দিন যাতে আমার এই ছেলেটি প্রাণ দান পায়।" বুদ্ধদেব কহিলেন—"আচ্ছা বলিয়া দিব যদি আমি যে জিনিষ বলিতেছি আমায় তা আনিয়া দিতে পার; আর কিছু নয়, এক মুঠা সরিষার বীজ।" যখন গোতমী আগ্রহের সহিত আনিয়া দিতে স্বীকৃত হইল, তখন কহিলেন, "কিন্তু একটী সর্ত্ত আছে। এমন ঘর থেকে আনিতে হইবে, যেখানে বাপ, মা, স্বামী, পুত্র কিম্বা ভৃত্য, ইহার কোন একজনের মৃত্যু হয় নাই।" গোতমী তাহাই অঙ্গীকার করিয়া মৃত শিশু কোলে বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন। এক মুঠা সরিষা দিতে সকলেই প্রস্তুত, কিন্তু যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাড়ীতে মা-বাপ-স্বামী-পুত্র কি ভৃত্য কেহ মরিয়াছে কি না? তাহারা বলিল,—"বলেন কি? জীবন্ত লোক অল্প, মৃতের সংখ্যাই অধিক।" কেহ বলে আমার একটি পুত্র মরিয়াছে, কেহ বলে আমার পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে;

কেহ বলে আমার ভৃত্যটি মরিয়াছে। অবশেষে যেখানে একটি লোকও মরে নাই এমন গৃহ না পাইয়া রমণী বুদ্ধের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, সরিষার বীজ এনেছ কি?" গোতমী বলিলেন, "প্রভো, আনি নাই। তাহারা বলে জীবন্ত লোক অল্প, মৃতব্যক্তিই অনেক।" তখন বুদ্ধ তাহাকে জীবনের অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ দিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার মনে প্রতীতি জন্মিল, তখন সান্ত্বনা লাভ করিয়া বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত হইলেন।

বৌদ্ধভিক্ষুরা একদিন বুদ্ধদেবের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভগবন্! সন্ন্যাসাশ্রমী ভিক্ষুরা স্ত্রীলোকদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে?

বুদ্ধদেব কহিলেন,—"তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিও না।"

"যদি তাহারা সম্মুখে আসিয়া পড়ে?"

"তাদের দেখিয়াও দেখিও না এবং তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিও না।"

"যদি তাহারা আমাদের সহিত কথা কহে, তাহা হইলে কি করিব?"

"যদি কথা কহিতেই হয়, তবে মনে যেন কোন কুভাব না থাকে, পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্লিপ্ত থাকিবে।"

বুদ্ধদেব আরও কহিলেন,—

"বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীকে মাতৃতুল্য, যুবতীকে ভগিনীতুল্য, অল্পবয়স্কা বালিকাকে দুহিতা সমান জ্ঞান করিবে।

"পরস্ত্রীর প্রতি কামাসক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করা অপেক্ষা তপ্তলৌহখণ্ড দ্বারা চক্ষু উৎপাটন করাও ভাল।

"রমণী হাবভাবলাবণ্যে পুরুষের হৃদয় বশ করিতে চাহে, সে হৃদয় বজ্রকঠোর হইলেও রমণীর কটাক্ষবাণের নিকট পরাভূত হয়। রমণীর হাসি অশ্রু তোমাদের শত্রু—তাহার ভুজলতাবন্ধন দুশ্ছেদ্য—তার কেশপাশ মুনিজনেরও চিত্তবিক্ষোভকারী।

"সাবধান! সংযমী হও, কামরিপুকে হৃদয়ে স্থান দিও না। রমণীসংসর্গ হইতে দূরে থাকিয়া তোমরা শ্রমণের ব্রত পালন করিবে।"

এইরূপে তাঁহার জীবনের অশীতি বৎসর গত হইল; এই দীর্ঘকাল বিনা দুঃখ কষ্টে বিনা শঙ্কটে অবাধে কাটিয়া গেল, এমন মনে করা ঠিক নয়। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার উপর দিয়া কত বিঘ্ন গিয়াছে, তিনি কত বিপত্তির মধ্যে পড়িয়াছেন, বলা যায় না তথাপি তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যপথ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হন নাই। গৃহস্থেরা আত্মীয় স্বজন-বন্ধুবিচ্ছেদে তাঁহার উপর ক্ষেপিয়া উঠিয়া তাঁহার কত অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা স্বকীয় আধিপত্য নাশ ভয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে কত ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তাঁহার শিষ্য দেবদত্ত একবার তাঁহাকে মহাবিপদে ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা তিনি নিজে এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় পত্তন করিয়া গৌতমের পদারূঢ় হন। তাঁহার মনোরথ পূর্ণ না হওয়াতে তিনি গুরুমারা ফাঁদ পাতিলেন। মগধরাজ অজাতশত্রুকে ফুস্‌লাইয়া তাঁহার বিপক্ষে উত্তেজিত করেন। রাজা গৌতমকে বধ করিবার নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। পর্ব্বত হইতে শিলাখণ্ড তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া

গেল। তাঁহাকে পদদলিত করিতে যে উন্মত্ত বন্যহস্তী প্রেরিত হয়, সে তাঁহার সম্মুখে গিয়া নিরীহ শান্তভাব ধারণ করিল। পরিশেষে এইরূপ কথিত আছে যে, রাজা অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বীয় পাপ সকল প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিয়া বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলেন।

এই জীবনী হইতে বুদ্ধদেবের নিত্য নিয়মিত জীবনকৃত্য আমরা কতকটা কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু শুধু কল্পনা নহে অনেকানেক বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা তাহা বর্ণিত দেখিতে পাই। তিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কোন পরিচারকের সাহায্য ব্যতিরেকে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেন। তখন হইতে ভিক্ষার্থে গ্রামে যাইবার পূর্ব্বে যে সময় টুকু থাকিত, তাহা নির্জ্জনে ধ্যানে যাপন করিতেন। বাহির হইবার সময় হইলে তিনি ভিক্ষুদের ন্যায় বসনত্রয় পরিধান পূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র হস্তে কখনো একাকী, কখনও বা অনুচরসহ সন্নিহিত গ্রামে কিম্বা নগরে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিতেন। তাঁহার দেহ হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতি বিনির্গত হইত। বিহঙ্গমের কলরবে এবং আকাশ হইতে মধুর ধ্বনিতে দিগ্বিদিক্ নিনাদিত হইত। তাঁহার শুভাগমনের নিদর্শন দৃষ্টে গ্রামের স্ত্রীপুরুষ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পুষ্পমালা উপহার লইয়া তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে বাহির হইত। তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ বাধিয়া যাইত কে তাঁহার আতিথ্য করিবে। অনুগ্রহ করিয়া আজ আমার গৃহে পদার্পণ করুন, আপনার জন্য, আপনার অনুচরবর্গের জন্য আহার প্রস্তুত, এই বলিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া, উপস্থিত জনের মধ্যে কোন

গৃহস্বামী তাঁহাকে অনুচরবর্গসহ গৃহে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের আতিথ্য করিতেন। আহার শেষ হইলে বুদ্ধদেব সমবেত লোকসকলকে উপদেশ দিতেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ বা গৃহস্থের মন্ত্র গ্রহণ করিত; আর যাঁহাদের তদপেক্ষা উচ্চাভিলাষ তাঁহারা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতেন। পরে উঠিয়া তিনি নিজ বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিতেন; সেখানে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত দিবসের গতাগত কার্য্য সকল স্থিরভাবে পর্য্যালোচনা করিতেন। তৎপরে দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ উপদেশ দিতেন "সত্যপরায়ণ হও, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। পৃথিবীতে বুদ্ধদর্শন দুর্লভ। বুদ্ধের উপদেশ লাভের সুযোগ অবহেলা করিও না।" পরে তাঁহার পুষ্পবাসিত কক্ষে গিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতেন। সন্ধ্যার সময় ইচ্ছা হইলে স্নান করিতেন। তদনন্তর লোকেরা আশপাশ গ্রাম বা নগর হইতে আসিয়া তাহার বাসস্থানে সম্মিলিত হইলে পর তিনি তাহাদের ধীশক্তি ও ধারণা অনুসারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন; তাঁহারা তাঁহাকে আপন আপন আধ্যাত্মিক অবস্থা জ্ঞাপন করিত; যাহার যাহা জানিবার ইচ্ছা তিনি তাহা পূর্ণ করিতেন; যাহার যে কোন বিষয়ে সংশয়, তাহা মিটাইয়া দিতেন। এইরূপে একপ্রহর রাত্রি কাটিয়া যাইত; পরে সকলকে সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যে বিদায় দিতেন। অবশিষ্ট রাত্রি কতক ধ্যান, কতক বা নিদ্রায় যাপন করিতেন, এবং প্রত্যূষে উঠিয়া কাহার কি আবশ্যক, কাহাকে কিরূপ উপদেশ দিতে হইবে, কি উপায়ে লোকের দুঃখ মোচন ও কুশল বর্দ্ধন করিবেন, এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দিবসের কার্য্য স্থির করিতেন।

আতিথ্য সংকার আর এইক্ষণে এই চুন্দার পক্কান্ন উপহার এ দুইই আমার সমান আদরণীয়। এ বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করে, কহিও যে এ কথা আমার নিজের মুখ হইতে শুনিয়াছ।" অনেক কষ্টে আস্তে আস্তে কুশীনগরসমীপস্থ হিরণ্যবতী নদীতীরে পৌঁছিয়া গৌতম তথায় কিয়দ্দণ্ড বিশ্রাম করিলেন এবং মল্লদের এক শালবনে গিয়া বৃক্ষতলে ডান কাতে শয়ান থাকিয়া মৃত্যুর পর আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে আনন্দের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় আনন্দের বিলাপধ্বনি শুনিয়া বলিলেন "ভাই আনন্দ, আমার জন্য শোক করিও না। আমিত তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যার জন্ম তারই মৃত্যু—যার বৃদ্ধি তারই ক্ষয়—এমন কি কোন জিনিস আছে যাহার বিনাশ নাই? শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক, এক সময়ে প্রিয়জনদের ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। কিন্তু আমার মৃত্যু হইল ভাবিও না। আমার প্রচারিত সত্য সকল, আমার উপদেশ ও অনুশাসন আমার পশ্চাতে রাখিয়া যাইতেছি—সেই সকল আমার প্রতিনিধি—সেই তোমাদের পথপ্রদর্শক। আনন্দ, তুমি অতি যত্নে আমার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছ—আশীর্ব্বাদ করি তোমার কল্যাণ হউক। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপথে চল, বিষয়াসক্তি, অহমিকা, অবিদ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইবে। যতদিন আমার শিষ্যেরা শুদ্ধাচারী হইয়া সত্যপথে চলিবে, ততদিন আমার ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচলিত থাকিবে। পাঁচ সহস্র বৎসর পরে যখন সত্যজ্যোতিঃ সংশয়-মেঘজালে আচ্ছন্ন হইবে, তখন যোগ্যকালে অন্যতর বুদ্ধ উদিত হইয়া আমার উপদিষ্ট ধর্ম্ম পুনরায় উদ্ধার করিবেন। শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা

করিলেন "সে বুদ্ধের নাম কি?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন "মৈত্রেয়।" মল্লদের শালবনে এইরূপ উপদেশ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন বুদ্ধের প্রতি কাহারো কিছু সন্দেহ আছে কি না। তদুত্তরে আনন্দ কহিলেন—"গুরুদেব! আশ্চর্য্য এই যে এত লোকের মধ্যে কাহারো একটি বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। সত্যের প্রতি, বুদ্ধের প্রতি ধর্ম্মের প্রতি আমাদের সকলেরই বিশ্বাস অটল, কাহারো মনে তিলমাত্র সংশয় নাই।" পরে বুদ্ধদেব ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন "যার জন্ম তার ক্ষয় ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—সত্যই মৃত্যুঞ্জয় হইয়া চিরকাল বাস করিবে। তোমরা যত্নপূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম পালন করিয়া আপন মুক্তিসাধন কর।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া নির্ব্বাণ রাজ্যে প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত হইল—প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উঠিল। ব্রহ্মা সহাম্পতি এবং শক্রের কণ্ঠ হইতে আকাশবাণী হইল—"হায়! বুদ্ধদেব মর্ত্ত্য হইতে অন্তর্হিত হইলেন—পৃথিবীর আলোক নিবিয়া গেল।"

তদনন্তর চক্রবর্ত্তী নৃপতির মরণোত্তর যে অন্ত্যেষ্টি-বিধান শাস্ত্র বিহিত, সেই বিধানানুসারে বুদ্ধদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কুশীনগরের প্রধান প্রধান নাগরিক কর্ত্তৃক যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহার দেহাবশেষ গ্রহণ করিতে অনেকানেক রাজ্য হইতে ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দগ্ধদেহের ভস্মরাশি আট ভাগে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেকের উপর একটি স্তূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইল।

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে বুদ্ধের মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষ তিন মাসের ঘটনাবলীর সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহা হইতে এবং অন্যান্য প্রাচীনতর গ্রন্থ হইতে দেখা যায় যে বর্ষার চারি মাস ছাড়িয়া অবশিষ্ট কয়েক মাস তিনি প্রায় প্রত্যহ আট দশ ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ইহাই তাঁহার বল, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রবুদ্ধ হইবার পর প্রায় ৪৫ বৎসর তিনি স্বীয় মতানুযায়ী ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়ান। এইরূপে দক্ষিণ-পূর্ব্ব পাটনা হইতে উত্তর-পশ্চিম সরস্বতী পর্য্যন্ত এক দিকে প্রায় দেড়শত ক্রোশ, অন্য দিকে পঞ্চাশ ক্রোশ ব্যাপিয়া, তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করেন এবং এই বিস্তীর্ণ প্রদেশে রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, বহুবিধ জনপদের সমাগমে তিনি মানবপ্রকৃতি—মনুষ্যের ভাব গতি, রীতি নীতি, সুখ দুঃখ, আশা ভরসা তলাইয়া বুঝিবার বিস্তর সুযোগ পাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

বুদ্ধদেবের যখন অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম, তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের প্রারম্ভ হইতে চতুশ্চত্বারিংশৎ বৎসর, তখন তিনি পাটলিপুত্রে আধুনিক পাটনা নগরের স্থানে গঙ্গা পার হইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন রাজা অজাতশত্রুর মন্ত্রীগণ পাটলিপুত্রের দুর্গ নির্ম্মাণে ব্যস্ত, মগধের ভাবি রাজধানীর সেই প্রথম পত্তন। তাহার রাজ্যশ্রী সহস্রবৎসর স্থায়ী হইবে বুদ্ধ এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যান। সেখান হইতে বৃজি জাতীয় লিচ্ছবিদের আবাসস্থান বৈশালী গমন পূর্ব্বক অম্বপালী গণিকার আম্রবনে বিশ্রাম করেন ও নাগরিকদের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া গণিকার

ভবনে গিয়া আহারাদি করেন। সেই সময় অম্বপালী তাঁহার উদ্যানগৃহ বৌদ্ধ সঙ্ঘে উৎসর্গ করে। বৈশালীর কূটাগারে তাঁর ধর্ম্মের সারতত্ত্বগুলি, যথা চারপ্রকার ধ্যান, চতুঃশমপ্রধান ধর্ম্ম, চারি ঋদ্ধিপদ, অধ্যাত্মিক পঞ্চবল, সপ্ত বোধাঙ্গ, অষ্টাঙ্গ মার্গ ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিলেন ও পরদিন ভিক্ষার পর বৈশালী ছাড়িয়া চলিলেন। বৈশালী হইতে তিনি ভণ্ডগ্রাম ও আর কতকগুলি গ্রাম অতিক্রম করিয়া অবশেষে কুশীনগর যাত্রা করেন—ইহা কপিলবাস্তু হইতে পূর্ব্বদিক প্রায় ২০ ক্রোশ দূর। কুশীনগর যাত্রা কালে 'পাবা' গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী আম্রবনে কিয়ৎ-কাল বিশ্রাম করেন। এই ভূমি চুন্দা নামক জনৈক কর্ম্মকার বৌদ্ধ-সমাজে দান করিয়াছিলেন। চুন্দা ভিক্ষুকদের জন্য তণ্ডুল ও বরাহমাংস প্রস্তুত করিল। প্রবাদ এই যে সেই মাংস ভোজন করিয়াই বুদ্ধদেব পীড়িত হন এবং এই পীড়াতেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়। অপরাহ্নে কুশীনগরের পথে কিয়দ্দূর চলিয়া শ্রান্তি-বোধ হওয়াতে তিনি বসিয়া পড়িলেন এবং আনন্দকে বলিলেন—"আমার বড় তৃষ্ণা লাগিয়াছে, জল আনিয়া দেও।" আনন্দ জল আনিয়া দিলেন। অল্প দূরে কুকুষ্ঠ নদী বহিতেছিল— তীরে পৌঁছিয়া নদীতে শেষ বারের মত স্নান করিয়া লইলেন। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া এবং লোকে পাছে চুন্দার প্রতি দোষারোপ ও কটুবাক্য প্রয়োগ করে এই আশঙ্কায় আনন্দকে বলিলেন "আমার মৃত্যুর পর চুন্দাকে বলিও সে বড়ই পুণ্যফল উপার্জ্জন করিয়াছে; জন্মান্তরে তাহার কল্যাণ হইবে। তাহার প্রদত্ত অন্নাহার করিয়া আমি মৃত্যুরূপ আরোগ্য লাভ করিলাম নির্ব্বাণমুখে উপনীত হইলাম। আমার বুদ্ধত্বের পূর্ব্বে সুজাতার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধ ইতিহাসের কালনির্ণয়।

বুদ্ধদেব ঠিক কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কোন্ সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়, বৌদ্ধেরা কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত এদেশে বিদ্যমান ছিলেন ও কোন্ সময়েই বা এখান হইতে অন্তর্হিত হন, আমাদের সকলেরই সে বিষয়ে জানিবার কৌতূহল হইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কাল নিরূপণের বেলায় আমাদের প্রাচীন ইতিহাস হইতে সাড়াশব্দ কিছুই পাওয়া যায় না। যুক্তি ও অনুমান, শিলালিপি ও প্রোথিত ধাতুমুদ্রা ইত্যাদি সাধন ও উপকরণ হইতে যাহা কিছু স্থির করা যায়, তাহাতেই একপ্রকার সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। তত্রাপি বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদয়াস্ত, উন্নতি অবনতির কাল কতকগুলি বিশেষ কারণ বশতঃ নিরূপণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সেই সকল কালনির্ণায়ক নিদর্শন সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, বুদ্ধ শাক্যসিংহের মৃত্যুকাল যতদূর জানা যায়, খুব সম্ভব পূঃ খৃঃ ৪৮০ বৎসর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধদের চারিটি মহাসভা হয়; তাহার কালও এক প্রকার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে মগধ রাজ্যাধিপতি অশোক রাজার মহাসভা সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই অশোক রাজা গ্রীকদের সান্দ্রাকোতস্ (চন্দ্রগুপ্তের) পৌত্র;

পাটলিপুত্র (পাটনা) ইঁহার রাজধানী। অশোক রাজার পূর্ব্বে দুইটি বৌদ্ধ সভা হয়। বুদ্ধের মরণোত্তর অনতিকালবিলম্বে রাজগৃহে রাজা অজাতশত্রুর আশ্রয়ে ইহার প্রথম সভায় বৌদ্ধ-শাস্ত্র প্রস্তুত হয়। ঐ শাস্ত্র তিন প্রকার;—সূত্রপিটক (বুদ্ধের কথাবার্ত্তা), বিনয়পিটক (ব্যবহার ধর্ম্ম) ও অভিধর্ম্মপিটক (দর্শনশাস্ত্র); এই তিনের সমবেত নাম ত্রিপিটক। ভারত-বর্ষের ভূপতিগণের মধ্যে প্রথমে প্রকাশ্যভাবে মগধরাজ অশোক খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয়শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার উৎসাহ প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়। তাঁহার অনুশাসন লিপি সকল প্রোথিত স্তম্ভ, গিরি ও গিরিগুহায় খোদিত, কাবুল নদীর উত্তর হইতে দক্ষিণে মহীশূর পর্য্যন্ত—পূর্ব্বে উড়িষ্যা হইতে পশ্চিমে গিরনার (কাঠেওয়ার) পর্য্যন্ত—পূর্ব্বাপর তোয়নিধির মধ্যস্থ সমুদয় ভারতবর্ষে প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল লেখ আবিষ্কৃত ও অর্থ সহিত অনুবাদিত হইয়াছে। এই সকল অনুশাসন পত্রে অশোকরাজার স্বধর্ম্মা-নুরাগ, উদার নিঃস্বার্থতা, দয়া দাক্ষিণ্য অহিংসাদি গুণের যে দেদীপ্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি কেন তিনি ধর্ম্মাশোক নামে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার একটি খোদিত স্তম্ভ বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলবাস্তুর চিহ্ন স্বরূপ নির্ম্মিত হয় তাহা তিন চারি বৎসর হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, সেকন্দর সা'র ভারত আক্রমণের পর হইতে যে কয়েক জন গ্রীস দেশীয় লোক ভারতবর্ষ পরিদর্শনার্থ আগমন করেন, তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে তৎকালবর্ত্তী ধর্ম্ম ও রীতি নীতি বিষয়ক কিছু কিছু জ্ঞানলাভ হয়। ইহাদের মধ্যে

গ্রীক্ [illegible] মেগাস্থিনীস্ একজন প্রসিদ্ধ। তিনি প্রায় খৃষ্টাব্দের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে মগধ রাজধানী পাটলিপুত্রে কিয়ৎকাল বাস করেন এবং তাঁহার সমসাময়িক ভারতের সামাজিক অবস্থা-বৃত্তান্ত অল্প বিস্তর লিখিয়া যান। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এই দুই শ্রেণীর লোকের বিষয় উল্লেখ করেন; এবং বৌদ্ধদের কথা প্রসঙ্গে বলেন, যে কতকগুলি শ্রমণ অর্থাৎ সন্ন্যাসী কেবল দয়া—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান উদ্দেশে লোকের চিকিৎসা করিয়া বেড়ান; কাহার নিকট কিছু গ্রহণ করেন না; অপর কতকগুলি ধর্ম্ম-প্রচারক লোকদিগকে নরক ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। কোন কোন সংস্কৃত নাটক হইতে এই বাক্যগুলির সত্যতার পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চতুর্থতঃ, চীন পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। চীনদেশীয় অনেক তীর্থযাত্রী তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আগমন করেন। বুদ্ধ গয়াতে তাঁহাদের খোদিত লিপি বিদ্যমান আছে ও তাহার মধ্যে অনেকের নামও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই সকল যাত্রীর মধ্যে ফাহিয়ান ও হিউ-এন্ সাং আমাদের বিশিষ্টরূপে পরিচিত। তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই শতাব্দীর প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে মহান্ আবিষ্ক্রিয়া—বুদ্ধজন্মভূমি কপিলবাস্তুর স্থাননিরূপণ—এই দুই চীন পরিব্রাজকের লিখিত বিবরণই তাহার সাধনীভূত। ফাহিয়ান ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া ৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং হিউএন্ সাং ৬৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ধর্ম্ম

সংক্রান্ত নানা বিষয় লিখিয়া যান। তাঁহারা উভয়েই গান্ধার, তক্ষশিলা, মথুরা, কান্যকুব্জ, শ্রাবস্তী, কপিলবাস্তু, বৈশালী, মগধ, পাটলিপুত্র, নালন্দ, রাজগৃহ, গয়া, বারাণসী, তাম্রলিপ্ত, কোশল প্রভৃতি বিবিধ স্থানস্থিত বিহার ও বিহারবাসী বহুসংখ্যক ভিক্ষু মণ্ডলী দর্শন করেন। হিউএন্ সাং তদতিরিক্ত প্রয়াগ, সারনাথ, উৎকল, কলিঙ্গ, ভরোচ, মালব, উজ্জয়িনী, দ্রাবিড়, কাঞ্চীপুর, মলয়, কোঙ্কণ, গুজরাট, কচ্ছ, মুলতান, থানেশ্বর, প্রভৃতি বিবিধ স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রায় সমগ্র ভারত ভূমিতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত দেখেন। কিন্তু ফাহিয়ানের সময় অপেক্ষা তাঁহার সময় এ ধর্ম্মে কিয়ৎ পরিমাণে হীন দশা উপস্থিত হইয়াছিল দেখা যায়। ফাহিয়ান যে সমস্ত বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধ দেবালয়ের কার্য্য সুন্দররূপে প্রচলিত দেখেন, হিউএন্ সাং তাহার মধ্যে অনেকানেক স্থান ও তদতিরিক্ত অন্য অন্য বহুতর বৌদ্ধক্ষেত্র ভগ্ন, ভগ্নপ্রায়, বা একেবারে শূন্য দেখিতে পান এবং কোন কোন স্থান ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মের বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অধীন হইতেছে দেখিয়া যান। ঐ সময় হইতে খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি। সপ্তম শতাব্দীতে কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষ পূর্ব্বাবলম্বিত বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঐসময়ের পর যে জৈন সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয়, মহীশূর, বিজয় নগর, আবু প্রভৃতি অনেক স্থানের খোদিত লিপিতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদের যেমন উন্নতি হইতে লাগিল, বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সেই রূপ অবনতি হইয়া আসিল। এদিকে আবার হিন্দুধর্ম্ম তাঁহার সহস্রবৎসরব্যাপী ঘুমঘোর হইতে উত্থান করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের

উচ্ছেদ-সাধন-ব্রতে কটিবদ্ধ হইলেন। খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে এবং তাহার পরেও কিছুদিন বৌদ্ধেরা যদিও ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়েন সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে অন্তর্হিত বোধ হয়।

পণ্ডিতপ্রবর কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্কর ও রামানুজ এই পুনরুদ্দীপ্ত হিন্দুধর্ম্ম প্রণালীর প্রধান প্রবর্ত্তক। কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধসম্প্রদায়ের একজন প্রবল বিপক্ষ ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি নিজ গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বৌদ্ধ-মতের প্রতিবাদ করেন এবং বৌদ্ধদের প্রতি যারপর নাই বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া যান। বেদভাষ্যকার সুবিখ্যাত সায়ণাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন, কুমারিলের সহায়ভূত সুধন্বা রাজা বৌদ্ধসম্প্রদায় সংহার উদ্দেশে এই আদেশ প্রচার করেন যে,—

আসেতোরাতুষারাদ্রে বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকান্।
ন হন্তি যঃ স হন্তব্যো ভৃত্যানিত্যন্বশান্নৃপঃ॥

রাজা স্বকীয় কার্য্যকর্ত্তাদিগকে আদেশ করিলেন, একদিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, অপরদিকে হিমালয় পর্ব্বত, ইহার মধ্যে আবালবৃদ্ধ যত বৌদ্ধ আছে সকলকে সংহার কর। যাহারা বধ না করে, তাহারা বধ্য।

শঙ্করাচার্য্য কুমারিলের উত্তরকালীন লোক, তিনিও বৌদ্ধবিদ্বেষী বলিয়া প্রখ্যাত। যেরূপে তিনি হিন্দুসমাজে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক

গবেষণা ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ গ্রন্থে শঙ্করের কালনির্ণয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। তিনি বলেন, চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্ সাং সপ্তম খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে ভারতবর্ষে অনেক বর্ষ অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় জ্ঞান, ধর্ম্ম ও অন্য নানাবিষয়ে যেরূপ সবিশেষ বর্ণন করেন, তাহাতে ঐ সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে যদি হিন্দুসমাজে তাদৃশ ধর্ম্মবিপ্লব সঙ্ঘটিত বা আন্দোলিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রমণ বিবরণে সে বিষয়ের প্রসঙ্গ না থাকা কোন রূপেই সঙ্গত নয়। যখন ঐ ভ্রমণ বিবরণে সেরূপ ধর্ম্মান্দোলনের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই, তখন ঐ সময়ের উত্তর কালে কোন সময়ে শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব সর্ব্বতোভাবে সম্ভব। যতদূর জানা গিয়াছে শাঙ্কর ভাষ্য রচনার কাল খৃষ্টাব্দ ৮০৪।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দর্শন, নীতি, পরকাল ও নির্ব্বাণ।

উপরে বুদ্ধের জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; এখন বৌদ্ধধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। শাক্যমুনি প্রবুদ্ধ হইয়া যে কার্য্যকারণশৃঙ্খল (দ্বাদশ নিদান) ধ্যানযোগে উপলব্ধি করেন, তাহার অর্থ কি? এই দ্বাদশ

নিদানের অনুক্রম একের পর এক যে হইতে যাত্রারও শয়ন তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা সাধাস্যার দুঃখে কখন মোটামুটি এই দেখা যাইতেছে যে অবিদ্যা শীর্ষস্থানে নেক ন্য—অবিদ্যাই দুঃখোৎপত্তির মূল কারণ বলিয়া নিরূপিত হং বি—বেদান্ত-দর্শনের সহিত এই বিষয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রের ঐক্য দেখা যাইতেছে। বেদান্ত মতেও অবিদ্যা হইতে তাবৎ ভবযন্ত্রণার উৎপত্তি। এই মহারিপু দমন করা উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তবে বেদান্তের অবিদ্যা আর বুদ্ধের অবিদ্যা এক নহে। বৈদান্তিকেরা বলেন, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এই অবিদ্যারই ব্যবধান। এই ব্যবধান দূর হইলে "সোঽহম্" বলিয়া যে অভেদ জ্ঞান জন্মে, তাহা হইতেই জীব ব্রহ্মে একীকরণ সংঘটিত হয়। অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত ব্রহ্মই জীব। অবিদ্যারূপ আবরণের উচ্ছেদ হইলে জীব ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। সেই আবরণচ্ছেদই মুক্তি। বুদ্ধের অবিদ্যা স্বতন্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। অবিদ্যা সেই, যাহা জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব জীবের নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে—সেই যত অনর্থের মূল। যদি কোন ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তাহা হইলে সে ভ্রম যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে অকারণ সর্পভয়ে ভীত, সেই ভ্রম অপনীত হইলে সর্পভয়ও দূর হয়—এও সেইরূপ। এই অবিদ্যার অপগমে দুঃখোৎপত্তির বাস্তবিক কারণ আমাদের জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হয়। সেই কারণ কি—না বিষয়তৃষ্ণা—তৃষ্ণা হইতে আসক্তি—আসক্তি হইতে জন্ম—তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রোগ শোক দুঃখ কষ্ট। এই জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তি। অবিদ্যা দূর হইলে তাহার নীচের

ফুটিয়া যায়; এক কথায়, আমার আমিত্ব বন্ধন ছিন্ন হয়, এবং নির্ব্বাণপথ উন্মুক্ত হয়।

...প্ত হইবার পর বুদ্ধদেব যে চতুর্ম্মহাসত্যের উপদেশ ..., তাহাই বা কি? ইহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। (১) জীবের দুঃখ (২) দুঃখের কারণ (৩) দুঃখের মূলোচ্ছেদ (৪) তাহার উপায় নির্দ্ধারণ এবং উপা... চেষ্টা। উপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া অষ্ট মহামার্গরূপ বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র বিবৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাংখ্য মতের অনেক বিষয়ে পরস্পর ঐক্য দেখিয়া অনেকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সাংখ্য মত হইতে উৎপন্ন বিবেচনা করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, কাপিল সাংখ্যদর্শন এই বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুদর্শন। কপিল ও বুদ্ধ উভয়েই নিরীশ্বরবাদী। বৌদ্ধ ও সাংখ্য উভয় মতেই সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়; সেই দুঃখ হইতে জীবের পরিত্রাণ সাধন চেষ্টা ঐ উভয় মত প্রবর্ত্তনেরই মূলসূত্র। বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলবাস্তু, বুদ্ধের মাতার নাম মায়া (প্রকৃতি)। এ দুইটিও সাংখ্য মতের পরিচায়ক। বৌদ্ধদের এইরূপ এক উপাখ্যান আছে যে বুদ্ধ পূর্ব্ব জন্মে কপিল ছিলেন। শাক্যবংশীয় নৃপতিরা আপনাদের নগর নির্ম্মাণের স্থান-নিরূপণ করিতে গিয়া কপিল ঋষির কুটীর দর্শন ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর, তিনি তাঁহাদিগকে একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, সেই স্থানে নগর নির্ম্মিত হইলে, কপিলের নামানুসারে তাহার নাম কপিলবাস্তু হইল। সে যাহা হউক, এই উভয় মতের যেমন সৌসাদৃশ্য আছে, তেমনি অনেকাংশে

ভিন্নতা ও দৃষ্ট হয়। উভয়েই একস্থান হইতে যাত্রারং য়াছেন, উভয়ের ছাড়িবার স্থান এক—মনুষ্যের দুঃখে কিন্তু গম্যস্থান স্বতন্ত্র এবং গন্তব্যপথও অনেক ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি উভয়েরই লক্ষ্য কিন্তু সে লক্ষ্য কি সিদ্ধ হয়? কপিল মুনি দুইটি মূলতত্ত্ব মানিয়া চলেন, প্রকৃ আর পুরুষ। সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি নর্ত্তকীর ন্যায় পুরুষের সম্মুখে সংসাররূপ মায়ার খেলা খেলিতেছেন, পুরুষ নিজদর্পণে তাহা দর্শন করিতেছেন। প্রকৃতির এই মায়াময়ী প্রতিকৃতি অপসারিত করিয়া, প্রকৃতির অজ্ঞানরচিত আবরণ জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ফেলিয়া দিয়া পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র রূপে আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, তখন সেই মায়ার খেলা থামিয়া যায়; তখনি তিনি দুঃখক্লেশ, জন্মমৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করেন। বুদ্ধ এ সকল তত্ত্বের উল্লেখ করেন নাই। বুদ্ধের রাজ্যে পুরুষের অস্তিত্ব নাই। তিনিও বলেন সকলি অনিত্য—সকলি ক্ষয়শীল—সকলি দুঃখময়; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনশীল নামরূপের মূলে সত্যবস্তু কিছুই নাই। বুদ্ধের গম্যস্থান নির্ব্বাণ—বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞানও নহে—সাংখ্যের আত্ম-তত্ত্বও নহে—কিন্তু নির্ব্বাণ, যার মূলার্থ নিবিয়া যাওয়া—অন্য কথায়, জীবাত্মার অস্তিত্ব লোপ। তাঁহার মতানুযায়ী এই নির্ব্বাণ মুক্তি কি, তাহা পরে সবিশেষ আলোচিত হইবে। কিন্তু বুদ্ধ নিজে যাহাই বলুন, তাঁহার অনুচরেরা তাঁহার নামে যে দর্শন-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহা শূন্যবাদ বই আর কিছুই নহে। আমিও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা, জগতের মূলকারণ ঈশ্বরও মিথ্যা।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

কগুলি দার্শনিক তত্ত্ব ও বিশেষ বিধান ছাড়িয়া দেখা যায় যে বৌদ্ধধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃতিমূলক সহজ তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বুদ্ধদেব ন্যায়, সত্য, ংসাদি নীতির প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়া ও সেই সমুদায়ই নবকুলের সদ্গতি সাধক বলিয়া তদীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্মেও দশানুশাসন প্রচলিত, তন্মধ্যে গৃহস্থ সাধারণের জন্য এই পাঁচটি নির্দ্দেশিত আছে—

বধ করিও না।

অপহরণ করিও না।

ব্যভিচার দোষ করিও না।

মিথ্যা কহিও না।

সুরাপান করিও না।

ভিক্ষুদের জন্য তদতিরিক্ত অপর পাঁচটি ব্যবস্থা আছে; যথা, বিকালভোজন, নাট্যাদি দর্শন, উত্তম পরিচ্ছদ, প্রশস্ত শয্যা, স্বর্ণ রৌপ্যাদি দান গ্রহণ, এই পঞ্চ ব্যসন হইতে বিরতি। উচ্চশ্রেণী ভিক্ষুদের জীবনব্রত যারপর নাই কঠোর। শ্মশানে যে সকল ছিন্ন বস্ত্রাদি কুড়াইয়া পাওয়া যায়, তাহা আপন হস্তে সেলাই করিয়া পরিতে হইত; তাহার উপর এক গেরুয়া বসন। আহার যত সামান্য সাদাসিধা হইতে পারে, আর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাহাদের ভিক্ষাপাত্রে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্যোপায়ে ধনোপার্জ্জন নিষিদ্ধ। দিনের মধ্যে একাহার, মধ্যাহ্নের পর আহার নিষেধ। বনই তাহাদের আশ্রম, বৃক্ষতল তাহাদের আশ্রয় স্থান। সেখানে বড় জোর আসন বিছাইয়া বসিতে

পার, কিন্তু কদাপি শয়ন করিবে না—নিদ্রার সময়েও শয়ন নিষেধ। নিদ্রা যাইবে সেও বসিয়া বসিয়া। যদি কখন গ্রাম কিম্বা নগরে যাইতে হয় সে কেবল ভিক্ষার জন্য—সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে হইবে—কখন কখন শ্মশানে গিয়া সংসারের অসারতা চিন্তা ও ধ্যান মননে রাত্রি যাপন করিবে—এই প্রকার কত কঠোর তপশ্চর্য্যায় রত থাকিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু 'অর্হৎ' পদবী লাভের অধিকারী হইতেন।

উল্লিখিত দশানুশাসনে যে সকল পাপকার্য্য নিষিদ্ধ, তদ্ব্যতীত কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, পরনিন্দা, পরপীড়া প্রভৃতি মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ ও বিধান আছে। যে সমস্ত ধর্ম্মনীতি পালনীয়, তাহা পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি, স্নেহ, দয়া, অহিংসা, চিত্তের স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা। বুদ্ধের উপদেশ এই, সত্য ও প্রিয়বাক্য কহিবে, কাহারো হিংসা করিবে না। সাধুতার দ্বারা অসাধুকে পরাজয় করিবে, সত্যদ্বারা অসত্যকে পরাজয় করিবে, মৈত্রী গুণে শত্রুতা পরাভব করিবে। হিন্দুশাস্ত্রের মতে প্রায়শ্চিত্ত ও যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পাপের বিমোচন হয়; কিন্তু বুদ্ধ তাহা অস্বীকার করিয়া উপদেশ দেন, কায়মনোবাক্যে সর্ব্বজীবে দয়া প্রকাশ ও তদীয় হিতানুষ্ঠান ব্যতিরেকে সদ্গতি লাভের অন্য উপায় নাই। হিন্দুধর্ম্ম জাতিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম্ম দেশগত, জাতিগত নহে; ইহা মনুষ্য কুলের স্বভাবসিদ্ধ সাধারণ ধর্ম্ম; কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কেহই এধর্ম্মের বিরোধী নহে। দুঃখ

ক্লেশ ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল মনুষ্যেরই ভাগধেয়। গৌতম প্রদর্শিত নির্ব্বাণপথের যাত্রীদিগের মধ্যে কোনরূপ জাতিবিচার নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতির মহত্ত্ব নাই। জাতিভেদে মনুষ্যে মনুষ্যে যে পার্থক্য সে কল্পিত, কিন্তু গুণ ও কর্ম্মানুসারেই যথার্থ পার্থক্য। ব্রাহ্মণ শূদ্র জন্মিয়াই হয় না, কিন্তু কর্ম্মগুণে। যিনি সদাচারী, শুদ্ধাচারী, তিনিই ব্রাহ্মণ। অজ্ঞানান্ধ পাপাকারীই শূদ্র। যে ব্যক্তি লোভী, ক্রোধপরায়ণ, হিংসারত, দয়ামায়া শূন্য, সেই চণ্ডাল। মাল্য চন্দন ভস্মলেপন যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না। যিনি সংযত ও জিতেন্দ্রিয়, যিনি কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুদল স্ববশে আনিয়াছেন, সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। ইতিপূর্ব্বে চতুর্ম্মহাসত্যরূপ ধর্ম্ম-চক্রের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতির প্রধান অঙ্গ। বারাণসীতে বুদ্ধদেব সেই তাঁহার প্রথম উপদেশে যে নির্ব্বাণমুক্তির আদর্শ ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই নির্ব্বাণ পথের চারিটি বিভাগ বা ধাপ আছে এবং কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি দশরিপু সে পথের বিঘ্নকারী; সেই রিপুদল দমন করিতে করিতে পথিক এক এক ধাপে উপনীত হন ও সমস্ত রিপুর উপর জয়লাভ না করিলে গম্যস্থানে পৌঁছান যায় না। তন্মধ্যে দুইটি ভয়ঙ্কর শত্রু, 'রূপরাগ' এবং 'অরূপরাগ'—এক বিষয়-বাসনা, অপর স্বর্গ-কামনা,—এ দুইই অনর্থের মূল। শেষ-ভাগে পৌঁছিয়া মৈত্রীর সহিত মিত্রতাবন্ধন হয়। সকল ধর্ম্মের শিরোদেশে—সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রেম ও মৈত্রী ভাব।

মৈত্রী ভাবের দৃষ্টান্ত মাতৃস্নেহ। মাতা যেমন সন্তানকে প্রাণ দিয়াও পোষণ করেন, সেই উদার গভীর মাতৃপ্রেম—যে প্রেম শত্রু মিত্র আত্ম পরে সমান—যে প্রেমের ভেরী-নিনাদ দিগ্বিদিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করে, সেই প্রেম বিতরণের জন্য মর্ত্ত্যলোকে বুদ্ধদেবের আগমন। বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই যে এই সার্ব্বভৌম মৈত্রীভাব জগতে বিস্তার উদ্দেশে ভবিষ্যতে মৈত্রেয় নামক অন্যতর বুদ্ধের উদয় হইবে।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে দয়া মায়া, ধৃতি সংযম, স্বার্থত্যাগ, পরোপকার, এই সকল গুণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনেকানেক নীতিকথা আছে তাহার একটি বলিয়া এই ভাগ শেষ করি। এটি অশোক রাজার পুত্র কুনালের আখ্যান; কুনাল-চরিত্র ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা গুণের দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার বিমাতা তিষ্য-রক্ষিতা তাঁহার শ্রীসৌভাগ্য দর্শনে ঈর্ষান্বিতা হইয়া তাঁহাকে দূর দেশে নির্ব্বাসন করিয়া দেন ও তথাকার রাজ-কর্ম্মচারীর প্রতি কুমারের চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলা হয় এইরূপ রাজনামাঙ্কিত এক আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করেন। কেহ এই অঘোর কৃত্য করিতে প্রস্তুত হয় না, অবশেষে একজন নির্দ্দয় নিষ্ঠুর চণ্ডালের সাহায্যে এই নৃশংস কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। যখন সেই ঘাতক সাঁড়াশী দিয়া তাঁহার দুই চক্ষু একে একে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল তখন লোকেদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল কিন্তু রাজকুমার একটি কাতর শব্দ করিলেন না—চক্ষু দুটি হাতে লইয়া কহিলেন "আমার চর্ম্ম-চক্ষু গেল তাহাতে কি? এখন আমার জ্ঞান-চক্ষু

ফুটিল। রাজা আমাকে পরিত্যাগ করিলেন কিন্তু আমার রাজা ধর্ম্ম, তিনি কখন আমায় পরিত্যাগ করিবেন না। রাণী এই কার্য্যের আদেশ করিয়াছেন শুনিয়া কহিলেন, "মহা-রাণী আমার এত উপকার করিয়াছেন, তাঁর মঙ্গল হউক। আমি চক্ষু হারাইয়াছি সত্য কিন্তু যে ক্ষমা কারুণ্য শিক্ষা করিয়াছি সেই আমার মহৎলাভ, তার তুলনায় এ ক্ষতি কিছুই নহে।" পরে তিনি ভিখারীর বেশে তাঁহার পিতার রাজধানীতে উপনীত হইলেন। একরাত্রে রাজবাটীর সম্মুখে বীণা বাজাইয়া গান করেন, রাজা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেই অন্ধকে দেখিয়া পুত্র বলিয়া চিনিতেই পারিলেন না। পরে সবিশেষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন, রাণীকে বধ করিতে উদ্যত। কুনাল অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলেন "মহারাজ! এমন কর্ম্ম করিবেন না, স্ত্রী হত্যা মহাপাপ। তথাগত উপদেশ দিয়াছেন, ক্ষমাই পরম ধর্ম্ম, ক্ষমার পর আর গুণ নাই। আরো নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! আমার কোন কষ্ট নাই। যিনি আমার উপর এইরূপ অত্যাচার করিয়াছেন আমি তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতেছি। তিনি আমাকে সুখ দিন, আর দুঃখ কষ্ট দিন, আমার কাছে এ দুইই সমান। মাতার প্রতি আমার প্রেম ভক্তি সমানই আছে। যদি আমার কথা সত্য হয় আমার চক্ষু যেন ফিরিয়া পাই।" তৎক্ষণাৎ তাঁহার চক্ষুদ্বয় কোটরে আসিয়া পূর্ব্ববৎ জ্বল জ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভিধর্ম্ম ভাগ (দর্শন) যতই ভ্রান্তিসঙ্কুল ও জটিল হউক না কেন, বুদ্ধের নীতি শিক্ষার উপর কেহই

দোষারোপ করিতে পারিবেনা। ঐহিক পারত্রিক অভ্যুদয় কামনা করিয়া যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধন করা যে নিতান্তই বৃথা কার্য্য, আর আত্মপ্রভাবে ইন্দ্রিয় মন দমন করিয়া এবং চরিত্র সংশোধন করিয়া দয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যে শ্রেয়ঃ পথের একমাত্র দ্বার—এই কথাটীর প্রতি বুদ্ধদেব জনসাধারণের চক্ষু ফুটাইয়া দিলেন। শুধু উপদেশ নহে, বুদ্ধের মহৎ জীবন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ যেরূপ মহান্, তাঁহার সাধু দৃষ্টান্ত তদপেক্ষা মহত্তর। বুদ্ধদেবের ধৈর্য্য, দয়া, মায়া, মমতা, প্রশান্ত গম্ভীর ভাব, যেমন ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রস্তর মূর্ত্তিতে, তেমনি ভক্তদিগের মানসপটে মুদ্রিত রহিয়াছে। বুদ্ধদেব পৃথিবীর মধ্যে একজন সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ধর্ম্মবীর ছিলেন সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতেছি, তিনি ঘোর বিলাসিতার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া পিতৃ-গৃহের অতুল সুখ সম্পত্তি কেমন অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া লোক-হিতার্থে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন, পরে সাত বৎসর কি সুদুঃসহ তপঃসাধন-বলে বিশুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন এবং প্রায় অর্দ্ধশতাব্দ ধরিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নির্ব্বিশেষে জ্ঞান ধর্ম্মে সাধারণ মনুষ্য জাতির সমান অধিকার ঘোষণা করিয়া কিরূপে ভারতে দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচারে জীবন ক্ষেপণ করিলেন। তিনি যে কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি একাকী নির্ভীক চিত্তে, উদ্যমের সহিত সমাধা করিয়া যখন শান্ত সমাহিত চিত্তে, আনন্দমনে তাঁহার শিষ্যবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইয়া

পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন তখন আকাশবাণী হইল—হায় বুদ্ধদেব অন্তর্হিত হইলেন—পৃথিবীর আলোক নিবিয়া গেল! বুদ্ধ-জীবনের ছবি আমাদের সকলেরই মনশ্চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশমান রহিয়াছে।

বৌদ্ধনীতিশাস্ত্র অরাজক রাজ্য। বিশ্বসংসার অকাট্য নিয়মে বদ্ধ অথচ তাহার নিয়ন্তা নাই—ধর্ম্মরাজ্যের কোন রাজা নাই। ফলাফলের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোন ব্যবস্থাপক পুরুষ নাই। পুণ্যের কেহ পুরস্কর্ত্তা নাই, পাপের শাস্তা নাই। দেবতা-প্রীত্যর্থ পশুবলি যাগ যজ্ঞ নিষ্ফল, দেবারাধনা অনাবশ্যক। বৌদ্ধধর্ম্ম সাধনপ্রধান ধর্ম্ম, তাহাতে ভজনের কোন প্রকার বিধি ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ এই যে আত্মপ্রভাব দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া অন্তঃকরণকে দ্বেষ হিংসা কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য হইতে বিনির্মুক্ত কর, তাহা হইলেই সিদ্ধিলাভ হইবে। সাধনেই সিদ্ধি "দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা" এই পুরুষকারই আমাদের মুক্তিপথের একমাত্র সম্বল। আমাদের আপনার মুক্তিসাধন আপনারই হস্তে—আত্মপ্রভাবে এই দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে হইবে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুশয্যার শেষ কথাগুলি তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি ঐ সময়ে তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"ভাই আনন্দ, আমার জীবনের অশীতি বৎসর অতীত হইয়াছে—দিন ফুরাইয়া আসিল, আমি এইক্ষণে চলিলাম। দেখ আমি আত্ম-নির্ভরে নির্ভয়ে চলিয়া যাইতেছি, তোমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। তোমরাও আপনার উপর নির্ভর করিয়া

চলিতে শেখ। তোমরা আপনারাই আপনার প্রদীপ—আপনারাই আপন নির্ভর-দণ্ড। সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর—আপনা ভিন্ন অন্য কাহারো উপর নির্ভর করিও না। আমি চলিয়া যাইতেছি দেখিয়া শোক করিও না। আমার জীবন 'ধর্ম্ম' ও 'সঙ্ঘ' ইহাতেই রাখিয়া যাইতেছি। তাহা অক্ষয় ও অবিনাশী। সেই ধর্ম্ম তোমরা প্রাণপণে পালন কর। সংসারের দুঃখ কষ্ট হইতে পরিত্রাণের জন্য আমি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় তোমাদের জন্য ঔষধ আনিয়াছি—সেই ঔষধ সেবন কর। আমার উপদেশ মনে রেখো, যাহার জন্ম তাহার মৃত্যু, যার বৃদ্ধি তারই ক্ষয়; সংসারের সকলি ক্ষয়শীল, সকলি অনিত্য। ইহা জানিয়া যত্নপূর্ব্বক তোমরা নিজ নিজ মুক্তিসাধন কর। এইরূপে আত্মবলে আমার প্রদর্শিত পুণ্যপথে চল—নিশ্চয় তোমাদের কল্যাণ হইবে; তোমরা দুঃখ শোক অতিক্রম করিয়া অপার শান্তি ও নির্ব্বাণরূপ অমূল্য নিধি লাভ করিবে।"

মানব প্রকৃতির উচ্ছেদকারী—মনুষ্য সমাজের উন্নতির প্রতিরোধী কোন এক অভিনব ধর্ম্মপ্রণালী কালে নিশ্চয়ই অবসাদ প্রাপ্ত হয়। বাসনা-বিরহিত মনুষ্যে মিলিয়া মনুষ্য সমাজ গঠিত হয় না। ঈশ্বরবিহীন ধর্ম্ম অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে না। মনুষ্য আপনা অপেক্ষা উচ্চতর দৈবশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া ধর্ম্মপথে চলিতে অক্ষম। আমরা এমন একজন জ্ঞানময় মঙ্গলময় পুরুষ চাই, যিনি আমাদের পূজার্চ্চনা গ্রহণ করিতে তৎপর—এমন রাজা চাই, যিনি আমাদিগকে সংসারের সমুদয় বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ—

এমন সখা, যাঁহার নিকটে আমাদের সুখ দুঃখ নিবেদন করিয়া আমরা ইহলোকে সুমতি—পরলোকে সুগতি লাভে সমর্থ হই। আধ্যাত্মিক জগতে আত্মপ্রভাব অতীব প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু দেবপ্রসাদ ভিন্ন ধর্ম্মের মূল শুষ্ক হইয়া যায়; এই কারণে কাল সহকারে নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের যে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহা আপনারা অবগত আছেন; তাহার জন্মভূমি এই ভারতভূমি হইতে তাহার বহিষ্কৃত হইবার কারণও এই। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নীতি প্রণালী যেমনই আবিষ্কৃত করুন, কিন্তু দেখা যায় অনেকানেক বৌদ্ধক্ষেত্রে ঘোর পৌত্তলিকতা বিলক্ষণ প্রশ্রয় পাইয়াছে। যে বুদ্ধদেব ঈশ্বরের প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত মুখে আনিতে কুণ্ঠিত হইতেন, সেই বুদ্ধদেবের মতাবলম্বী সাধকেরা তাঁহাতেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। "প্রতিমা পূজা, বুদ্ধ প্রভৃতির অস্থি দন্তাদির অর্চ্চনা এবং নানাবিধ যাত্রা মহোৎসব অবাধে চলিয়া আসিতেছে। ফাহিয়ান খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমে অনেকানেক বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া যান। কেবল শাক্য বুদ্ধ নয়, এক এক দেবালয়ে অন্য অন্য বৌদ্ধদেবতার প্রতিমুর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও অর্চ্চিত হইয়া থাকে।" এদিকে আমরা দেখিতে পাই যে বৌদ্ধেরা নিরীশ্বর এবং দেবপ্রসাদ হইতে পরাঙ্মুখ—ওদিকে দেখি যে, বৌদ্ধেরা মনুষ্যপূজা এবং মূর্ত্তিপূজার আদি গুরু। বুদ্ধদেব যেমনি পৃথিবী হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন, তাহার কিয়ৎপরে ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত শত স্থান শত দেবদেবীর প্রস্তর মূর্ত্তিতে পরিকীর্ণ হইয়া উঠিল, তার সাক্ষী ইলোরা,

অজণ্টা, খণ্ডগিরি, শ্রীক্ষেত্র।—বুদ্ধ গয়ায় তারাদেবী ও বাগীশ্বরী দেবী, বৈশালীতে ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ ও বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, নালন্দ বিহারে অবলোকিতেশ্বর, তারা, ত্রিশিরা বজ্রবরাহী, বাগীশ্বরী ইত্যাদি অনেক স্থানে অনেকানেক বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। দেবপ্রসাদ হইতে বিচ্ছিন্ন আত্মপ্রভাবের নিরতিশয় কঠোর সাধনার যে বিসদৃশ পরিণাম, তাহা আর এক দিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে ধর্ম্মসাধন ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যথেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইল। যথেচ্ছাচারিতার বলে কৃত্রিম সিদ্ধি উপার্জ্জনের প্রণালীই তন্ত্রশাস্ত্র—কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে বিকট বীভৎস তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিল। "হিন্দু মতানুযায়ী সিদ্ধ যোগীরা যেমন অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি প্রভৃতি আট প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করেন লিখিত আছে, সেইরূপ বৌদ্ধদিগেরও বিশ্বাস এই যে ঐ সম্প্রদায়ী সিদ্ধব্যক্তিরা অশেষ রূপ অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়া অতীব অদ্ভুত কার্য্য সমুদয় সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, যেমন বায়ু মধ্যে সঞ্চরণ, জলের উপর গমনাগমন, গৃহ সম্বলিত পর্ব্বত ও সমুদ্র প্রকম্পন, পর্ব্বত ও পৃথিবীর গর্ত্ত দর্শন, ইচ্ছাবলে বায়ু প্রবাহ উৎপাদন, অগ্নি ধারা আনয়ন, নষ্ট বা গুপ্ত বিষয় উদ্ধার করণ ইত্যাদি।"

যদি জিজ্ঞাসা করেন বৌদ্ধশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব—তাহার বীজমন্ত্র কি? তাহার উত্তর "কর্ম্মফল"। কতকগুলি দর্শনতত্ত্ব হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সাধারণ সম্পত্তি—এ তত্ত্বটিও তাহারই মধ্যে। সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে জীবের সদসদ্গতি হিন্দু শাস্ত্রেরও এই শিক্ষা, এই

উপদেশ—ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব নাই। কেহ রাজা কেহ চাষা হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে—কেহ ধনী কেহ দরিদ্র—কেহ সুখস্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিতেছে, কেহ অকারণ কষ্ট ভোগ করিতেছে—অন্যায় উৎপীড়ন সহ্য করিতেছে; এরূপ অবস্থাবৈষম্যের কারণ কি? জীবনে এই দুঃখ শোক, পাপ তাপ, অন্যায় অত্যাচার—এ সকলেরই মীমাংসা "কর্ম্মফল"। ঐহিকে যে অমঙ্গলের কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, পূর্ব্বজন্মকৃত ফলাফল সেই রহস্য ভেদ করে—সেই প্রহেলিকার উত্তর বলিয়া দেয়। তবে এই কর্ম্মের প্রাধান্য যেমন বৌদ্ধধর্ম্মে, তেমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাহার মতে কর্ম্মোদ্যমই জীবন—কর্ম্মই দেবতার স্থলাভিষিক্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর সকলি ক্ষয়শীল, মৃত্যুর অধীন—কেবল কর্ম্মবলের উপর মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। বুদ্ধের উপদেশ এই "যেমন বীজ বপন করিবে তাহার ফলও তদনুরূপ হইবে।" কর্ম্মবন্ধন কেহই অতিক্রম করিতে পারেনা। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, জানিতেছি, তাহা পরিবর্ত্তনশীল নামরূপ মাত্র—ভৌতিক জগতে কোন বস্তু স্থির নহে, অধ্যাত্ম জগতেও কোন বস্তুর স্থায়িত্ব নাই। দেহ পঞ্চভূতের সমষ্টি, আত্মা কতকগুলি গুণ ও সংস্কারের সমষ্টি; তাহাদের বাস্তব্য নাই। কর্ম্মই একমাত্র সত্য পদার্থ, বিশ্বচরাচর কেবল কর্ম্মসূত্রে বাঁধা। বালকের কর্ম্মফল যুবার জীবনে প্রতিফলিত, যুবকের কর্ম্মফল বৃদ্ধের জীবনে প্রতিফলিত; সেইরূপ তোমার ঐহিকের কর্ম্মফল পারত্রিক জীবনে প্রতিফলিত হইবে। যেমন পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল তুমি ইহ জীবনে ভোগ করিতেছ, সেইরূপ যদি পরলোকে

মঙ্গল চাও, তবে পাপকর্ম্ম পরিহার কর। পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, কেননা কোন চিন্তা, কোন বাক্য, কোন কর্ম্ম এ পৃথিবীতে নষ্ট হয় না। অমি সত্য বলিতেছি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যেথানে যাও, সমুদ্রে প্রবেশ কর অথবা গিরি গুহায় লুক্কায়িত থাক, তোমার কর্ম্মফল তোমার পশ্চাৎ ধাবিত হইবে—কিছুতেই তাহা হইতে নিস্তার নাই। তোমার পাপের ফল যেমন দুঃখ ভোগ, সেইরূপ তোমার পুণ্যের সুফলভাগীও তুমি। বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলে তোমার আত্মীয় স্বজনবন্ধু যেমন তোমাকে আনন্দে অভ্যর্থনা করে, সেইরূপ তোমার পুণ্যফল লোক হইতে লোকান্তরে তোমাকে অনুসরণ করিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিবে।”

এইস্থলে বৌদ্ধধর্ম্মের পারলৌকিক মত ও বিশ্বাস একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। মৃত্যু ও পরকাল সম্বন্ধীয় যে সকল প্রহেলিকা মানব হৃদয়ে স্বভাবতঃ উদয় হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্ম শাস্ত্রে তাহার সমর্পক উত্তর সর্ব্বাংশে উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাহা কতক ব্যক্ত, কতক অব্যক্ত রাখিয়াছেন। জীবাত্মার শেষ গতি কি? বুদ্ধদেব মৃত্যুর পর জীবিত থাকিবেন কি না? —এই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি অনেক সময় মৌনভাব অবলম্বন করিতেন। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁর কাছে এই সমস্ত গূঢ় প্রশ্ন উত্থাপন করিতে বিরত হইত না; বুদ্ধদেব সে সকলের যথাসাধ্য উত্তর প্রদান করিয়াছেন—যাহার উত্তর নাই, তাহাও বলিয়া দিয়াছেন।

মালুঙ্খ্যপুত্র যখন এই সকল তত্ত্বের জ্ঞানলাভ মানসে বুদ্ধের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করেন তখন বুদ্ধদেব কহিলেন :—

হে মালুঙ্খ্যপুত্র—অমি কি কখন তোমাকে বলিয়াছি—"এস, আমার শিষ্য হও—আমি তোমাকে বলিয়া দিব, জগৎ সৃষ্ট কি অনাদি, দেহ আত্মা পরস্পর ভিন্ন কি অভিন্ন—বুদ্ধ-মরণোত্তর নব-জীবন ধারণ করিবেন কি না ?—এই সকল সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়া উপদেশ দিব, অমি কি এমন কোন বচন দিয়াছি ?"

মালুঙ্খ্য—না, গুরুদেব, তা দেন নাই।

বুদ্ধ—এই সকল তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশে কি তুমি আমাকে গুরু বলিয়া মানিয়াছ ?

মালুঙ্খ্য—না, তাহা নহে।

বুদ্ধদেব কহিলেন—

এক ব্যক্তি বিষাক্ত বাণে আহত হইয়াছিল। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ একজন সুনিপুণ চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। যদি সেই আহত ব্যক্তি বলিত—আগে আমাকে বল কার কার বাণে আমি আহত হইয়াছি, যে বাণ মারিয়াছে সে লোকটা কে ? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র ? তাহার নাম কি ? নিবাস কোথায় ? সে বাণই বা কি রকমের বাণ ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কি কোন লাভ আছে ? ফলে এই দাঁড়াইত যে কথা শেষ হইতে না হইতেই সে বাণাহত ক্ষত ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে দেখিতে পাইতে।

হে মালুঙ্খ্যপুত্র, তুমি আহত হইয়া আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আসিয়াছ। তোমার আরোগ্যের উপযোগী যে ঔষধ তাহা আমি বলিয়া দিয়াছি। আমি যাহা প্রকাশ করি নাই, তাহা অপ্রকাশিত থাকুক—যাহা ব্যক্ত করিয়াছি তাহা প্রকাশিত হউক।

বৌদ্ধদ্বেষকগণ এই মৌনভাব বশতঃ বুদ্ধের প্রতি দোষারোপ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? মিলিন্দ প্রশ্নে যবনরাজ মিলিন্দ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেনের মধ্যে যে কথোপকথন আছে, তাহাতে বুদ্ধদেবের এই মৌনভাবের কারণ সমালোচিত দেখিবেন।

রাজা—শাক্যমুনি বলিয়াছেন যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব মনুষ্য বুদ্ধির গোচর তাহা আমি অপ্রকাশিত রাখি নাই। তথাপি দেখা যায় যে মালুঙ্খ্যপুত্রের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে তিনি বিরত হইয়াছিলেন। তাহার কারণ দুয়ের এক হইতে পারে—হয় অজ্ঞান বশতঃ উত্তর দেন নাই, অথবা জানিয়া শুনিয়া গুহ্য রাখিবার ইচ্ছায় উত্তর দেন নাই। এ দুয়ের কোন্‌টা ঠিক?

নাগসেন কহিলেন—

রাজন্, বুদ্ধদেব মালুঙ্খ্যপুত্রের প্রশ্নাবলির উত্তর দেন নাই সত্য বটে, কিন্তু তাহা অজ্ঞানবশতঃ নহে। কোন প্রশ্ন এমন আছে, যাহার উত্তরে অন্য এক প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে —আবার এমনও প্রশ্ন আছে, নিরুত্তর থাকাই যাহার উত্তর। সে সকল প্রশ্ন কি—না

জগৎ নিত্য কি অনিত্য?

দেহ আত্মা এক কি স্বতন্ত্র?

মৃত্যুর পরে তথাগত জীবিত থাকিবেন কি না? এই সমস্ত প্রহেলিকা একপাশে ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ইহাদের কোন উত্তর নাই—উত্তরে কোন লাভ নাই—এই সকল প্রশ্নের অনর্থক উত্তর দানে তথাগত বাক্যব্যয় করিতে উৎসুক

ছিলেন না। যে সকল দুরূহ সত্য মানব বুদ্ধির অগম্য, তৎ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মত ব্যক্ত করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

জীবাত্মা অমর কিম্বা মৃত্যুর অধীন—মৃত্যুর পর জীবাত্মার গতি কি হইবে? এই প্রহেলিকা ভেদ করা মনুষ্যের পক্ষে দুঃসাধ্য সন্দেহ নাই। অথচ আবার মানব জাতির জীবিতাশা ও সুখাশা এতাদৃশ বলবতী, যে তাহা এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে সীমাবদ্ধ থাকিয়া তৃপ্ত হইবার নহে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই গভীর উচ্ছ্বাস আত্মা হইতে স্বতই উত্থিত হয়—যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্। এই হেতু পারলৌকিক আশার উদ্রেক-কারী আশ্বাস বচন প্রায় সর্ব্বজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই সন্নিবিষ্ট দৃষ্ট হয়। কোরাণ ত স্বর্গ বর্ণনায় ও স্বর্গসুখ বর্ণনায় পরিপূর্ণ। খৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলেও একথা আছে, আর তা ছাড়া খৃষ্টানেরা ঈশার সশরীরে স্বর্গারোহণ বিশ্বাস বলে অনন্ত জীবন ও মুক্তি লাভের প্রত্যাশা করেন। বুদ্ধ এ বিষয়ে কোন আশ্বাস বাক্য দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়না। ঐহিক সুখ বাসনার ন্যায় স্বর্গ কামনাও তাঁহার নীতিরাজ্য হইতে বহিস্কৃত। বুদ্ধ স্বয়ং অমর জীবনের অধিকারী কি না; তাহাও প্রকাশিত হয় নাই। কোশলরাজ ও সন্ন্যাসিনী ক্ষেমার মধ্যে যে কথোপকথন তাহাতে ক্ষেমা স্পষ্টই বলিতেছেন—"স্বয়ং বুদ্ধ যাহা প্রকাশ করেন নাই, আমরা তাহা কি বলিব? বুদ্ধের প্রকৃতি সমুদ্রের ন্যায় অতলস্পর্শ গভীর। যদি বল বুদ্ধ অমর, তাহা ভুল—যদি বল তিনি মরণশীল, তাহাও ঠিক নহে।" এই উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হইলেন কি না জানি না, কিন্তু ইহার উপর কাহারো

কিছু বলিবার নাই। যে সকল বিষয় মানববুদ্ধির অগোচর সে বিষয়ে মৌন থাকা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই।

বৌদ্ধেরা যদি এইখানে থামিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আর কোন কথা বলিবার থাকিত না। কিন্তু এদিকে আবার দেখা যায়, তাঁহারাও হিন্দুদের ন্যায় মৃত্যুর পর নানারূপ যোনি ভ্রমণ স্বীকার করেন। ইহকালে যিনি যেরূপ শুভাশুভ কর্ম্ম করেন পরকালে তিনি তদনুরূপ যোনি প্রাপ্ত হন। কেবল পশু পক্ষী কীটাদি নিকৃষ্ট জন্তু নয়, পাতকের পরিমাণানুসারে মৃৎপিণ্ডাদি জড় বস্তু হইয়াও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। বৌদ্ধেরা বলেন, শাক্যমুনি নিজে অশেষ জন্মচক্রে ঘূর্ণিত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। পূর্ব্ব জন্মের কথা তোমার আমার মত যে-সে লোকের মনে থাকে না, বুদ্ধের ন্যায় সিদ্ধ পুরুষেরাই তাহাদের বিগত জীবন-কাহিনী স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন। বুদ্ধদেব পশু পক্ষ্যাদি কোন্ যোনিতে কিরূপে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জাতকমালায় সন্নিবেশিত আছে। বুদ্ধ জাতকে আত্মার নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধমুখী অভিব্যক্তি নাই—জীবনের ক্রমোন্নতির ভাব লক্ষিত হয় না। কি কারণে কি নিয়মে জীবের অবস্থান্তর ঘটিতেছে তাহা বুঝা যায় না। আমরা দেখিতে পাই চারিবার তিনি মহাব্রহ্ম, বিশ বার ইন্দ্র—তিরাশীবার সন্ন্যাসী—আটান্নবার রাজা—চব্বিশবার ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন বানর, হস্তী, সিংহ, বরাহ, শশক, মৎস্য, বৃক্ষ, চোর, বাজীকর, ভূতের ওঝা—এইরূপ কত কত জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বুদ্ধ কখন নারী জন্ম গ্রহণ করেন নাই—ভূত প্রেত রূপেও জন্মান নাই।

সকল জন্মেই তিনি বোধিসত্ত্ব ছিলেন ও জগতের মঙ্গল সাধন উদ্দেশে অশেষ দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের পূর্ব্ব জন্ম কাহিনীতে বুদ্ধজীবনী স্বার্থহীন পরোপকারী দয়ার অবতার রূপে চিত্রিত; ও এই সকল মহদ্‌গুণ-ভূষিত তাঁহার সেই জীবনী মানবের দৃষ্টান্ত স্বরূপে জাতক-মালায় বর্ণিত দেখা যায়। একস্থানে বুদ্ধদেব কহিতেছেন—"আমি 'সাম' নাম ধারণ করিয়া উপত্যকারণ্যে বাস করিতাম। সর্ব্বভূতে সম দৃষ্টি দ্বারা আমি সকলকেই বশে আনিয়াছিলাম। সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বন বরাহ মহিষ পালিত পশুর ন্যায় আমার কাছে আসিয়া বসিত। আমাকে ও কেহ ভয় করে না, আমিও কাহাকে ভয় করি না, আমি দয়ার উপর পা রাখিয়া নির্ভয়ে পর্ব্বত প্রদেশে বিচরণ করিতাম।"

যিনি পরোপকার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করেন তাঁহাকে কত প্রকার কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়—সময়ে সময়ে প্রাণ পর্য্যন্ত অকাতরে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হয়। বুদ্ধদেব স্বীয় জীবনে সেইরূপ আত্ম ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

পূর্ব্বজন্মে বুদ্ধ যখন রাজকুমার বশ্বন্তর হইয়া জীবন যাপন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বিপদের আর অন্ত ছিল না। বশ্বন্তর অন্যায়রূপে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হয়েন। তাঁহার যাহা কিছু ধন সম্পত্তি ছিল—পরিশেষে চড়িবার রথটি ও অশ্ব-সহ দানে ক্ষয় হইয়া গেল। স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে পদব্রজে প্রখর সূর্য্য তাপের মধ্য দিয়া বনে ফিরিতেছেন। বালক বালিকা পথের মধ্যে বৃক্ষে ফল ঝুলিয়া আছে দেখিয়া তাহা

পাড়িবার জন্য লালায়িত—বৃক্ষ পর্য্যন্ত তাহাদের দুর্দ্দশায় সমবেদনা অনুভব করিয়া অবনত হইয়া তাহাদিগকে ফল পাড়িতে দিল। পরে তাঁহারা বঙ্ক পর্ব্বতে সন্ন্যাসী বেশে এক পর্ণ গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। "আমি, রাজকন্যা মাদ্রী, দুই পুত্র কন্যা, জালী ও কর্ণাজিনা, এই চারি জনে সেই পর্ণ কুটীরে বাস করিতে লাগিলাম—পরস্পর পরস্পরের শোকাশ্রু মুছাইয়া সান্ত্বনা অনুভব করিতাম। আমি ছেলে মেয়ে দুটির সংরক্ষণে আশ্রমে থাকিতাম, মাদ্রী বন হইতে ফল কুড়াইয়া আনিয়া আমাদের আহার যোগাইত। এই সময়ে একজন ভিক্ষুক আসিয়া আমার নিকট পুত্র কন্যা ভিক্ষা করিল। আমি একটু মুচকি হাসিয়া ছেলে মেয়েদের দিয়া ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম। পরে স্বর্গ হইতে ইন্দ্র নামিয়া আসিয়া মাদ্রীকে ও লইতে চাহিলেন—আমার সতী সাধ্বী স্ত্রী, আমি তাহার হাত ধরিয়া তাহার হস্তে জল রাখিয়া মাদ্রীকেও সন্তোষ চিত্তে জলাঞ্জলি দিলাম। এই দান দেখিয়া দেবতারা উপর হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন—বৃক্ষের তরুরাজি শুদ্ধ মেরু পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। আমার পুত্র, কন্যা—রাজকুমারী সকলকেই আমি বুদ্ধত্ব পাইবার আশায় পরিত্যাগ করিলাম—সেই মুনি-জন-অভীপ্সিত মহামূল্য রত্নের নিকট এ সকল জিনিস কি ক্ষুদ্র—কি তুচ্ছ!

দানশীলতায় আর একটী আখ্যান শ্রবণ করুন। বুদ্ধের পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্তে একটী বিজ্ঞ শশকের গল্প আছে। বুদ্ধ বলিতেছেন :—

পূর্ব্বজন্মে যখন আমি শশক ছিলাম পার্ব্বত্য অরণ্যে চরিয়া বেড়াইতাম। তৃণ পল্লব ফল মূল যাহা পাইতাম আহার করি-

তাম। এক বানর, এক শৃগাল, এক বিড়াল, আর আমি— আমরা এই চারি জনে মিলিয়া বনে বিচরণ করিতাম। আমার সহচর দিগকে আমি ধর্ম্মোপদেশ করিতাম—কি ভাল কি মন্দ তাহা শিক্ষা দিতাম—ভাল গ্রহণ করা মন্দ পরিত্যাগ করা এই-রূপ উপদেশ দিতাম। পূর্ণিমার উপবাস পর্ব্বে আমি তাহার দিগকে বলিতাম "এই পুণ্য দিনে ভিক্ষুকদিগের জন্য অন্নদানের সংগ্রহ করিয়া রাখ। পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া ভিক্ষা দান করিবে ও আগে হইতে তাহাদের জন্য ভিক্ষাসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিবে।" আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এই উপ-লক্ষে কি দান করা যায়? কলাই মটর ডাল ভাত আমার কিছুই নাই। আমি তৃণ ভক্ষণ করিয়া থাকি তাহা ত আর কাহাকেও দেওয়া যায় না। ভাল মনে পড়িয়াছে! কেহ আসিয়া ভিক্ষা চাহিলে আমি আপনাকে দান করিব—তাহাকে শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইতে হইবে না! শক্র আমার মনের ভাব জানিতে পারিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। ব্রাহ্মণ বেশে আমার বিবরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহি-লেন "ভিক্ষাং দেহি।" আমি কহিলাম আপনি ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে—আমি আপনাকে এমন জিনিস দিব যে কেহ কখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে না। মহাশয় সাধু পুরুষ, কাহারো অনর্থক কষ্ট দিতে ইচ্ছা করিবেন না। আমার মিনতি যে আপনি শুষ্ক কাষ্ঠ সকল একত্র করিয়া জ্বালাইয়া দিন—আমি নিজে দগ্ধ হইয়া আপনার আহার যোগাইব।" ইন্দ্র আমার কথা মত করিলেন এবং অগ্নির পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। কাষ্ঠ জ্বলিয়া উঠিলে আমি জ্বলন্ত

অনলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। জল প্রবেশ করিলে যেমন অঙ্গদাহ নিবারিত হয় সেই চিতানলে তেমনি আমার সকল কষ্টের অবসান হইল। অস্থি চর্ম্ম মাংস শিরা উদর হৃৎপিণ্ড সমেত আমার সমুদয় দেহ ভস্মসাৎ হইল; ব্রাহ্মণের হস্তে আমি অকাতরে আত্ম সমর্পন করিলাম।

বুদ্ধের পূর্ব্ব জন্ম কাহিনীর নমুনা স্বরূপ দুই একটী ক্ষুদ্রগল্প উপরে দেওয়া হইল—এই সকল নীতি পূর্ণ উপাখ্যানে জাতক-মালা পরিপূর্ণ।

পরলোক ও মুক্তি বিষয়ে বৌদ্ধ মত জানিতে হইলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে আত্ম-তত্ত্বের শিক্ষা ও উপদেশের প্রতি মনোনিবেশ করা আবশ্যক। আত্মার পরলৌকিক গতি ও মুক্তির কল্পনা আত্ম-স্বরূপ লক্ষণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আত্মাকে যদি দেহের সহিত অভিন্ন—মস্তিষ্কের প্রক্রিয়া মাত্র মনে করা যায়, তাহা হইলে দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ সহজে নিষ্পন্ন হয়। এই আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ও বৌদ্ধশাস্ত্রে আকাশ পাতাল প্রভেদ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন, উপনিষদে আত্মা বলিয়া যাহা নিরূপিত, তাহা শরীর হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। আত্মা যে আমি, আমি শরীর হইতে ভিন্ন—আমি চক্ষু নহি, কর্ণ নহি, মনোবৃত্তি নহি—চক্ষু কর্ণ মনোবৃত্তি আমার। ছান্দোগ্য উপনিষদে আত্মজ্ঞান বিষয়ে একটি আখ্যা-য়িকা আছে, তাহাতে প্রজাপতির যে উপদেশ, তাহা শ্রবণ করুন—

"এই দেহ নশ্বর—মৃত্যুর অধীন। আত্মা অজর অমর অশরীরী, এই দেহ তাহার বাসস্থান। অশ্ব যেরূপ রথে যুক্ত,

এই আত্মাও সেইরূপ শরীরের সহিত সংযুক্ত। যখন আলোক চক্ষের তারকে প্রবেশ করে, তখন আত্মাই দর্শক, চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়; যিনি আঘ্রাণ করেন তিনি আত্মা, নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়। যিনি ভাবেন আমি বাক্য উচ্চারণ করিতেছি, তিনি আত্মা, রসনা বাগিন্দ্রিয়! যিনি শ্রবণ করেন তিনি আত্মা, কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়। যিনি মন দ্বারা মনন করেন, তিনি আত্মা, মন দিব্যচক্ষুস্বরূপ; আত্মাই এই মনোরূপ দিব্যচক্ষে কাম্য বিষয় সকল দর্শন করত রমণ করেন। আত্মা যতদিন এই শরীরে অবস্থিতি করেন, ততদিন তিনি মোহপাশে বদ্ধ থাকিয়া বিষয় বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া সুখ দুঃখে বিচলিত হয়েন; কিন্তু যখন তিনি দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন, তখন সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যেমন অশরীরী বায়ু মেঘ বিদ্যুৎ আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিতে গিয়া নিজ নিজ রূপ ধারণ করে সেইরূপ আত্মাও এই শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই পরম জ্যোতিকে পাইয়া নিজরূপে প্রকাশিত হয়েন—তখনই তিনি উত্তম পুরুষ—তখন সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা। দিব্য জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া বিষয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তখন তিনি পরম শান্তি পরমারোগ্য উপভোগ করেন।

উপনিষদের এই উপদেশ—বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ স্বতন্ত্র। যে ধর্ম্ম হিন্দুসমাজ হইতেই বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহার উপর বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনের প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু বুদ্ধদেব আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে

হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ পার্থক্য ঘটিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম দেহ মনের আড়ালে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে বলে দেহ আত্মা এক। পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন কুট প্রশ্ন বলিয়া বুদ্ধদেব তাহার উত্তর দানে বিরত ছিলেন। অপরাপর গ্রন্থে ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতর অবিশ্বাসের কথা আছে অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করা হইয়াছে দৃষ্ট হয়।

মিলিন্দ প্রশ্ন হইতে নিম্নে যে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে বৌদ্ধ মত স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে।

রাজা মিলিন্দ বৌদ্ধাচার্য্য নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় আপনার নাম কি ?"

নাগসেন উত্তর দিলেন "মহারাজ! আমার নাম নাগসেন কিন্তু নাগসেন নাম মাত্র, ইহা শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার কোন বাস্তব্য নাই, কোন বিষয় নাই।"

রাজা—"কোন বিষয় নাই ? বলেন কি ? যদি কোন বিষয় না থাকে, কে তোমাকে অন্ন বস্ত্র দিয়া তোমার অভাব পূরণ করে ? পীড়িত হইলে কে তোমাকে ঔষধ পথ্য দেয় ? কে এই সকল বস্তু ভোগ করিতেছে ? কে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে ? পুণ্য ফল ভোগ করে ? কে নির্ব্বাণ লাভ করে ? চৌর্য্য হত্যা পঞ্চ পাপাদি কে করে ? তোমার মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই। পাপ পুণ্যের ফলাফল নাই। কর্ম্মের কোন কর্ত্তা নাই। প্রভুজি, আপনাকে কেহ প্রাণে বধিলে তাহার হত্যা দোষ হয় না।"

তখন নাগসেন কহিলেন, "রাজন্, আমার কেশ গুচ্ছ কি নাগসেন ?

"তা নয়"

নখ দন্ত অস্থি মাংস কি নাগসেন ?

"তা নয়"

বেদনা কি নাগসেন ? নাম রূপ, সংস্কার, বিজ্ঞান—ইহারা কি নাগসেন ?

"না"

তবে নাগসেন কোথায় ? আমি যে দিকে দৃষ্টি করি নাগসেন নাই। নাগসেন একটি শব্দমাত্র।"

পরে আরো বলিলেন

মহারাজ ! আপনি রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে পবব্রজে চলিয়া যাইতে শ্রান্তি বোধ করেন। এখানে আপনি পদব্রজে আসিয়াছেন কি রথে আসিয়াছেন" ?

রাজা—"আমি পায়ে চলিয়া বেড়াই না, রথে আসিয়াছি।"

"যদি রথে আসিয়া থাকেন ত রথ কি আমাকে বলুন। যুগকাষ্ঠ খানা কি রথ ? যুগকাষ্ঠ, চক্র, আসন, ইহার কোনটাই রথ নহে। এই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগও রথ নহে। আমি যে দিকে দেখি রথ নাই, ইহা একটি শব্দমাত্র। মহারাজ ! আপনি বলিলেন রথে আসিয়াছি—একি অসত্য নহে, যদি সত্য হয় ত রথ কি আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

রাজা—"আমি যাহা বলিয়াছি সত্যই বলিয়াছি, যুগকাষ্ঠ, চক্র, চক্রনাভি, অর, আসন এই সব মিলিয়া রথের নাম রথ।"

নাগসেন—"যদি তাহাই ঠিক হয়, নাগসেন ও সেইরূপ। রূপ বেদনা, সংস্কার, বিজ্ঞান, এই সকল মিলিয়া তাহার নাম নাগসেন। তাহার আভ্যন্তরিক বিষয় আর কিছুই নাই। জীবাত্মা এই পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি।"

আত্মজ্ঞান বিষয়ে উপনিষদ আর বৌদ্ধধর্ম্মের কি প্রভেদ দেখুন। বৌদ্ধমতে জীবাত্মা বলিয়া দেহ হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। জন্ম সংস্কারে জীবন স্রোত বহিয়া যাইতেছে তাহার মধ্যে "আমি" "তুমি" কোন মূল সত্তা বিদ্যমান নাই।

এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় আমার আমিত্ব চলিয়া আসে অথবা বিনষ্ট হইয়া হইয়া যায় বৌদ্ধদর্শন ইহার উত্তর কি দেন? এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্য দীপশিখার সহিত আত্মার উপমা দেওয়া হয়। জীব দীপশিখা, বহির্জগৎ হইতে তৈল কিম্বা ইন্ধন আসে। দীপশিখা যেমন বায়ুভরে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু আশ্রয় করিয়া জ্বলিয়া উঠে, জীব সেইরূপ এক যোনি হইতে অন্য যোনিতে ভ্রমণ করে, এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ আশ্রয় করে। বায়ুর ন্যায় বিষয় তৃষ্ণা জীবাত্মাকে যোনি হইতে যোনিতে লইয়া যায়। এই যে জীবাত্মা অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে ইহা একও নহে—ভিন্নও নহে।

রাজা—"একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিন।"

নাগসেন—"একটা দীপ জ্বালাইয়া দিলে সমস্ত রাত্রি তাহা জ্বলিতে থাকে। প্রথম প্রহরে যে শিখা জ্বলিতেছে তাহা কি মধ্য রাত্রির শিখার সঙ্গে সমান?

"না"

মধ্যরাত্রির শিখা ও শেষ প্রহরের শিখা—ইহারা এক কি ভিন্ন?

"এক নহে"

"তবে এই একই শিখার কি ভিন্ন রূপ বলিবেন? তাহা ও নহে, সমস্ত রাত্রি সেই একই শিখা জ্বলিতেছে। আমাদের জীবনের ও এই গতি, এক যায়, এক আসে। আদি নাই, অন্ত নাই, জীবন-চক্র ঘুরিতেছে। পূর্ব্বাপর এক ও নহে, আবার ভিন্নও বলা যায় না।"

এই জীবন-শিখা কার্য্য কারণ গতিকে নূতন নূতন ক্ষেত্র অধিকার করিতেছে। জ্বলিতেছে, জ্বলিয়া নিবিয়া যাইতেছে—নূতন ইন্ধন পাইয়া পুনর্ব্বার জ্বলিয়া উঠিতেছে—মনে হয় এক অথচ ভিন্ন, ভিন্ন অথচ এক।

জীবাত্মার যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকে তাহা হইলে তাহার যোনিভ্রমণ কিরূপে সম্ভবে?

আত্মা ছাড়িয়া অনাত্মবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক সুখদুঃখভোগী যে জীব তাহার জীবন সমস্যা পূরণ—বৌদ্ধধর্ম্ম এই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন।

এই সমস্যা পূরণের প্রণালী এই :—বৌদ্ধমতে যে সমস্ত উপকরণে জীবের জীবন সঙ্গঠিত, তাহাদের নাম "স্কন্ধ"। এই স্কন্ধ পঞ্চসংখ্যক, এই পঞ্চস্কন্ধ ন্যূনাধিক মাত্রায় সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান। সেই পাঁচটি এই—

বিষয় প্রপঞ্চ—রূপ;
বিষয়জ্ঞান প্রপঞ্চ—বেদনা;
সংজ্ঞা প্রপঞ্চ—নাম;
সংস্কার প্রপঞ্চ—বাসনা;
বিজ্ঞান প্রপঞ্চ—(consciousness)

প্রত্যেক স্কন্ধের আবার অন্যতর নানাপ্রকার বিভাগ। এই পঞ্চ স্কন্ধের সংযোগে জীবের জন্ম—তাহাদের বিয়োগে জীবের মৃত্যু। এই সকল স্কন্ধ ছাড়িয়া জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

এই পঞ্চ স্কন্ধ কখন কখন 'নামরূপ' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়, মোটামুটি বলিতে গেলে জীব নামরূপের সমষ্টিমাত্র। মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপার নামের অন্তর্গত—দৈহিক ও বাহ্য বিষয় রূপের অন্তর্ভূত।

মৃত্যুকালে দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে স্কন্ধপুঞ্জের বিয়োগ হইবা-মাত্র অন্যত্র তাহাদের সংযোজন ঘটে, হয় ইহলোক অথবা অন্য লোকে এইরূপে নূতন নূতন জীব সৃষ্টি হয়। এই কয়েকটি স্কন্ধের যোগাযোগেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—মনুষ্যের চরিত্র—মনুষ্যের আত্মা। এই সমস্ত স্কন্ধের মূলে আত্মা যে আমি, আমি কতক গুলি গুণ ও সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। এই যে আমি, আমার নিয়তই পরিবর্ত্তন হইতেছে; আজ একরূপ কল্য অন্যরূপ। শিশু যে সে বালক নহে, বালক যে সে যুবা নহে। এই পরিবর্ত্তন অনুসারে নামের ভিন্নতা, যেমন একই দুগ্ধের পরি-বর্ত্তনে ক্ষীর, দধি, ঘোল প্রভৃতি নাম ভেদ হয়। ইহাতে একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে—যদি আত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ না থাকে তাহা হইলে শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে জীবের ভাল মন্দ যোনিভ্রমণ কিরূপে সম্ভবে? আত্মা নাই ত যোনি ভ্রমণ কাহার? যেমন কথায় বলে, "মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।"—ইহার উত্তরে বৌদ্ধশাস্ত্রে বলে, যদিও আত্মার অন্য সমস্ত উপাদান (স্কন্ধ) ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তথাপি কর্ম্মফল—

কর্ম্মবল—অক্ষত থাকে! জীব নিজ নিজ কর্ম্মবলে নূতন জন্ম ধারণ করে। যে সকল সংস্কার এই ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে কার্য্য করিতেছে, মৃত্যু তাহাদিগকে বিয়োজিত করে, কিন্তু কর্ম্ম-বলের উপর মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। মৃত্যু ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জীব দেহ হইতে বিশ্লেষিত আত্মার অবয়ব খণ্ড নূতন যোনিতে সংযোজিত হয়—নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরিত হয়; এইরূপে জীবন-স্রোত অব্যাহত থাকে। পূর্ব্বজন্ম ও নবজন্মের মধ্যে কর্ম্মসূত্রই একমাত্র বন্ধন। মনে করুন তাড়িত শক্তির ন্যায় কর্ম্মবল বলিয়া একটি শক্তি আছে, তাহার গতিবিধিতেই জীবন গঠিত হইতেছে—সংসার চলিতেছে। যেমন রথচক্র উঁচু নীচু নানা স্থান নানা দৃশ্যের মধ্য দিয়া গমন করে, অথবা দীপশিখা কিয়ৎকাল জ্বলিয়া আবার নিবিয়া যায়—পুনর্ব্বার জ্বলিয়া উঠে—তাহাকে পূর্ব্বাপর একই শিখা বলা যায় না অথচ ভিন্নও নহে। এইরূপে কর্ম্মবলে জীবনচক্র নিয়তই ঘূর্ণমান—অথচ বৌদ্ধধর্ম্ম আত্মার অনুবর্ত্তিত্ব, আমার আমিত্ব অঙ্গীকার করেন না। আমার কর্ম্মের স্রোত জীবনে প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু কর্ম্ম-কর্ত্তা কোন পুরুষ নাই। মোটামুটি, বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বের সারাংশ এই—আত্মার পৃথক সত্তা নাই। দেহ এবং আত্মা ও আত্মার উপকরণ সমস্ত মৃত্যু দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; কর্ম্মবলে সেই সকল ছিন্ন অবয়ব-খণ্ড সংসারের ক্রীড়াক্ষেত্রে নূতন নূতন জড়পিণ্ড ও জীবাকারে পরিণত হইতেছে—বিশ্বসংসার এই অখণ্ডনীয় নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। কোন্ত সম্প্রদায়ী লোকেরা (ইংরাজীতে যাদের Positivist বলে) তাদের মতও কতকটা এই-

রূপ। তাঁহারা ব্যক্তিকে—পুরুষকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে মনুষ্য জাতিকে সংস্থাপিত করেন। মনুষ্যের বিনাশ—মানব জাতির অমরতা। মৃত্যুকালে মনুষ্যের দেহ মন বিযুক্ত হইয়া আদি ভূতে মিশিয়া যায়; যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা তাঁহার সুকৃতি এবং সাধু দৃষ্টান্ত;—অন্য কথায় কর্ম্মবল এবং কর্ম্মফল; তাহা তাঁহার, তাঁহার পরবর্ত্তী সন্তান সন্ততি ও অন্যান্য লোকের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া জনসমাজ সংরক্ষণ এবং তাহার উন্নতি সাধনে সহায়ভূত হয়।

সে যাহাই হউক, এই প্রশ্ন উৎপন্ন হইতেছে, এই কর্ম্মবল কাহার? আমার, তোমার, কি অন্য কোন জীবের? আত্মা বিনষ্ট হইলে কর্ম্মবল কিসের উপর স্বীয় শক্তি চালনা করিবে? কর্ত্তা ব্যতিরেকেই বা কর্ম্মবল কিরূপে দেহের বাহিরে ও অভ্যন্তরে কার্য্য করিবে? বৌদ্ধধর্ম্মের সহস্র ব্যাখ্যা-তেও এই সকল প্রশ্নের সমর্পক উত্তর পাওয়া যায় না। কর্ত্তা ছাড়িয়া দিলে কর্ম্মের বল আপনাপনি বিনষ্ট হইয়া যায়; স্বাধীন পুরুষ ছাড়িয়া দিলে শুভাশুভ কর্ম্মের জন্য দায়িত্ব চলিয়া যায়। পরকালে বিশ্বাসও এই আত্মজ্ঞানের উপর অনেকটা নির্ভর করে। আমি আছি, আমি পরে থাকিব, আমার আমিত্ব নিরন্তর বহমান থাকিবে, এই বিশ্বাস পরকাল-বিশ্বাসের মূল। আমার আমিত্ব গেলে কর্ম্মবলের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়—পরকালে বিশ্বাসও হীনবল হয়।

তবে কি এই কর্ম্ম নিবন্ধন জন্মের পাকচক্র হইতে জীবের কিছুতেই পরিত্রাণ নাই? আছে, এবং বুদ্ধদেব সে উপায় বলিয়া দিয়াছেন! তিনি সেই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন

"যস্মাৎ ভূয়ো ন জায়তে"। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বনের শেষফল নির্ব্বাণ মুক্তি। এই নির্ব্বাণ মুক্তি কি? ঘুরিয়া ফিরিয়া এই প্রশ্নে আসিয়া পড়িতে হয়! বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্ব্বাণের অনেক কথা, অনেক উপদেশ আছে। বুদ্ধের নির্ব্বাণ যে অবস্থা তাহা ভাবাভাব এতদুভয়েরই অতীত এক অভাব নীচ অবস্থা—

"ন চাভাবোঽপি নির্ব্বাণং কুত এবাস্ত ভাবতা।
ভাবাভাব বিনির্মুক্তঃ পদার্থো নির্ব্বাণ মুচ্যতে।"

(রত্ন কূট সূত্র)

মিলিন্দ প্রশ্নে নাগসেনের নির্ব্বাণ ব্যাখ্যার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"দুঃখ শোক পাপতাপ হইতে মুক্তি লাভ—শান্তি আনন্দ পবিত্রতা—এই নির্ব্বাণের অবস্থা।"

"যিনি স্বীয় জীবনকে পুণ্য পথে নিয়োজিত করিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করেন তিনি কি দেখেন? জন্ম রোগ শোক জরা মৃত্যু, চতুর্দ্দিকে পরিবর্ত্তন—সকলই অস্থির—সর্ব্বত্রই অশান্তি। এই দৃশ্যে তাঁহার শরীর জ্বরে অভিভূত হয়, মন অশান্তিতে পূর্ণ হয়, কিছুতেই তাঁহার সন্তোষ নাই, তৃপ্তি নাই, পুনঃপুনঃ জন্ম ভয়ে তিনি সদাই ভীত ও ত্রস্ত থাকেন ও সেই ভীতি বশতঃ আরোগ্য লাভে অসমর্থ। এই অবস্থায় তিনি চিন্তা করেন, এই জ্বালা যন্ত্রণা হইতে কি উপায়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়? এই অশান্তির মধ্যে শান্তি কোথায় পাওয়া যায়? যদি এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, সেখানে জন্ম ভয় নাই, মৃত্যু ভয় নাই, বাসনার দংশন নাই,

আসক্তি বিহীন হইয়া শান্তি, আরাম, নির্ব্বাণ উপভোগ করা যায়, তাহা হইলেই আমার সকল কামনা পূর্ণ হয়। সাধনা দ্বারা তাঁহার সেই অবস্থা উপলব্ধ হয়, যেখানে জন্ম-ভয় শোক তাপ অতিক্রম করিয়া তিনি শান্তি লাভ করেন। তখন তিনি পুলকে উৎফুল্ল হইয়া মনে করেন, এতক্ষণে আমি আশ্রয়স্থান লাভ করিলাম। সেই মোক্ষধাম অর্জ্জন ও রক্ষণ করিতে তিনি কায়মনে সচেষ্ট হন; সংযমী জিতে-ন্দ্রিয় ও অহিংসাপরায়ণ হয়েন, সর্ব্বভূতে দয়া ও প্রেমে তাঁহার হৃদয় অভিষিক্ত হয়। এইরূপ সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারের অতীত যাহা স্থায়ী, যাহা সত্য, অর্হৎ মণ্ডলীর চিরকাঙ্ক্ষিত ফল, তাহা তাঁহার হস্তগত হয়। তখনই তিনি নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন।"

এই নির্ব্বাণ মুক্তি স্থানবিশেষে বদ্ধ নহে। ধর্ম্মই তাহার আশ্রয় স্থান। চীন, তাতার কাশ্মীর, গান্ধার, স্বর্গ মর্ত্ত্য যেখানেই থাকুন, প্রত্যেক সাধু পুরুষ বুদ্ধনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম পথে চলিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের অধিকারী। যাঁহার চরিত্র পবিত্র, যিনি ধ্যান ও বিবেক অর্জ্জন করিয়াছেন, যিনি আসক্তি বিহীন মুক্তহৃদয়, তিনি জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণরূপ অমৃত লাভ করেন।"

নাগসেন আবার কহিলেন, নির্ব্বাণের যেমন স্থান নির্দ্দেশ করা যায় না, তেমনি তাহার কারণও নির্দ্দেশ করা যায় না। যে পথ নির্ব্বাণে লইয়া যায় সে পথ প্রদর্শন করা যাইতে পারে; কিন্তু নির্ব্বাণের উৎপত্তি কোথা হইতে তাহা বলা যায় না। আর জিনিসটা যে কি তাও স্পষ্ট বলা যায় না।

রাজা—তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাতে দাঁড়ায় এই 'নির্ব্বাণ' কি না 'নির্ব্বাণ' অর্থাৎ তাহা কিছুই নয়।

নাগসেন কহিলেন—"মহারাজ তা নয়—নির্ব্বাণ আছে ইহা সত্য।

ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেও উপনিষদের এই উপদেশ "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে", "আছেন" এ বলা ভিন্ন আর কিসে তিনি উপলব্ধ হন?

নাগসেনের এই সমস্ত উপদেশেও নির্ব্বাণের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া গেল না। যে অবস্থায় আসক্তি নাই, জন্মভয় মৃত্যুভয় নাই, রাগ দ্বেষ স্নেহ মমতা প্রভৃতি সকলই নষ্ট, মনোবৃত্তি সমুদায় তিরোহিত, সে যে কি অবস্থা কে বলিতে পারে? কাহার সাধ্য ভাবিয়া উঠে? কথিত আছে বুদ্ধদেব স্বয়ং এই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার শিষ্যেরা সে অবস্থা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; দেখা যাক্ এই বর্ণনা হইতে বেশী কিছু জ্ঞানলাভ হয় কি না?

বুদ্ধদেব তাঁহার আসন্ন মৃত্যুকালে শিষ্যদিগকে ডাকিয়া উপদেশ করিলেন, পৃথিবীর তাবৎ বস্তুই অনিত্য, তোমরা যত্ন পূর্ব্বক আপনারা আপন মুক্তি-সাধন কর।" এই কয়েকটি কথা তথাগতের শেষ কথা।

পরে বুদ্ধদেব গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া নির্ব্বাণের প্রথম সোপানে পাদনিক্ষেপ করিলেন। প্রথম সোপান উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় সোপানে, দ্বিতীয় সোপান হইতে তৃতীয় সোপানে, তৃতীয় হইতে চতুর্থ সোপানে। তখনও তাঁহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই, কতক জ্ঞান, কতক আনন্দ অবশিষ্ট আছে।

আরও উচ্চে উঠিতে হইবে। চতুর্থ মহাধ্যান-সোপান অতিক্রম করিয়া তিনি সেই সোপানে পদক্ষেপ করিলেন, যেখানে কেবল অনন্ত আকাশ বিরাজমান। অনন্ত আকাশের সোপান হইতে অনন্ত জ্ঞানের সোপান। অনন্ত-জ্ঞান-সোপান হইতে তথায় পদার্পণ করিলেন, যেখানে কোন চিন্তা, কোন ভাব, কোন মনোবৃত্তি বিদ্যমান নাই—সকলি শূন্য। কিন্তু ইহা-তেও নিস্তার নাই। শূন্যতার অনুভবেও আনন্দ, তাহাও বিনষ্ট করা আবশ্যক। পরে শূন্যতার সোপান হইতে এমন স্থানে উপনীত হইলেন যাহা জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যবর্ত্তী স্থান। এই সোপান উল্লঙ্ঘন করিয়া এমন স্থানে পৌঁছিলেন যাহা সম্পূর্ণ চেতনাশূন্য, যেখানে সমুদয় মনোবৃত্তি তিরোহিত, যেখানে কোন ভাব-জ্ঞানও নাই, অভাব-জ্ঞানও নাই। এই শিখর দেশে পৌঁছিবার পর তিনি সোপানপরম্পরা দিয়া নিম্নদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার প্রথম ধ্যান-সোপানে আসিয়া পড়িলেন। দ্বিতীয়বার উঠিতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থ ধাপের উচ্চে আর উঠিতে পারিলেন না, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল; তিনি নির্ব্বাণ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

বুদ্ধদেব উল্লিখিত প্রকারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। বৌদ্ধমতে আমরাও সাধনাবলে, পুণ্যবলে, বিষয় তৃষ্ণা পরিহার করিয়া, সত্য সাধুতা স্বাধীনতা উপার্জন করিয়া, আমাদের জীবদ্দশায় অথবা পরলোকে এই নির্ব্বাণ মুক্তিলাভে জীবনের সাফল্য সম্পাদন করিতে পারি। বৌদ্ধেরা বলেন, অর্হন্মণ্ডলী নিজ নিজ পুণ্যবলে এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। (নির্ব্বাণ প্রাপ্ত অর্হৎ চরিত্র বৌদ্ধদের আদর্শ চরিত্র) এই নির্ব্বাণাবস্থা

জ্ঞান কিম্বা অজ্ঞানাবস্থা, চেতন কিম্বা অচেতন ভাব, বুদ্ধের উপদেশে তাহার ব্যখ্যা নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, এ অবস্থা কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের অতীত। সেখানে কার্য্যকারণ শৃঙ্খল বিদ্যমান নাই। এরূপ অবস্থা "নেতি "নেতি" ভিন্ন আর কোন্ শব্দে ব্যক্ত হইতে পারে? এখানে বাসনা ছিন্ন-মূল—দুঃখ ক্লেশ জ্বালা যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি—এক কথায় আমার আমিত্ব লোপ। বৌদ্ধধর্ম্মে মনুষ্য জীবনের এই চরম ফল—এই শেষ গতি। এখন কথা এই বেদোপনিষদের ব্রহ্ম অথবা বুদ্ধের নির্ব্বাণ—আমাদের যথার্থ লক্ষ্যস্থান কি হইতে পারে? এই দুই আদর্শের মধ্যে কোন্‌টা ঠিক? নির্ব্বাণের অর্থ যদি শূন্যতা হয়, তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে মানব প্রকৃতি এই শূন্যতা অবলম্বন করিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। মনুষ্য শূন্যতা চায়না, মনুষ্য পুরুষের আশ্রয় চায়। আমরা ধর্ম্মরাজ্যে পুরুষের প্রাধান্যই দেখিতে পাই, তার সাক্ষী এই বৌদ্ধধর্ম্ম দেখুন। বুদ্ধদেবই কি এ ধর্ম্মের প্রাণ নহেন? আরো দেখুন, ঈশার পুরুষকার খৃষ্টধর্ম্মের সর্ব্বস্ব—ঈশাকে ছাড়িয়া দিলে খৃষ্ট-ধর্ম্মের আর কি অবশিষ্ট থাকে? মহম্মদ বিহনে মুসলমান ধর্ম্ম কোথায় থাকে? চৈতন্য প্রভুর প্রভুত্ব ছাড়িয়া দিলে বৈষ্ণব ধর্ম্মই বা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়? এই সকল ধর্ম্মবীরেরাই মহা-পুরুষ। এই সকল মহাপুরুষ সময়ে সময়ে অভ্যুদিত হইয়া মনুষ্যের অচেতন আত্মাকে সচেতন করিয়া তোলেন—দুর্গতি প্রাপ্ত মনুষ্য সমাজকে উদ্ধার করেন। পুরুষ শব্দ পূর্ণতা ব্যঞ্জক। ভক্তের উপাস্য দেবতা যে পরমাত্মা তিনিও পুরুষ—তিনি পূর্ণ পুরুষ।—"জ্ঞানে পরিপূর্ণ—প্রেমে পরিপূর্ণ, আর

অটল প্রশান্ত মহদ্বল এবং মহোদ্যমে পরিপূর্ণ,।” আমি যে কথাগুলি বলিলাম বৌদ্ধধর্ম্ম স্বয়ং তাহার সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে বৌদ্ধ নির্ব্বাণ নানাস্থানে নানারূপ ধারণ করিয়াছে। বুদ্ধ ব্রহ্মকে স্বীয় ধর্ম্ম মন্দিরে স্থান দান করেন নাই; তথাপি তিনি স্বয়ং যেমন অনেকানেক ভক্ত কর্ত্তৃক দেবতা রূপে পূজিত হইয়াছেন, সেইরূপ নির্ব্বাণের শূন্যতাও স্বর্গসুখকল্পনায় ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, শূন্যতা আশ্রয় করিয়া কোন ধর্ম্মই টিকিতে পারে না।

আমার মনে অনেক সময় এই তর্ক উপস্থিত হয় বৈদান্তিক মুক্তি আর বৌদ্ধ নির্ব্বাণ ইহার মধ্যে প্রভেদ কি? এই দুই শুনিতে যত ভিন্ন, আসলে তত নয়। বেদান্ত দর্শন বলেন, নদী যেমন সমুদ্রে পড়িয়া স্বীয় নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া যায়, জীবাত্মাও সেইরূপ মোক্ষাবস্থায় নিজত্ব ছাড়িয়া পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। “বেদান্ত দর্শনের চৌতালা দেবমন্দিরে বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশান, এই তিন দেবতার তিনটি বিভিন্ন বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; চৌতালায় দেওয়া হইয়াছে তুরীয় অবস্থাকে; এস্থানটি জীবেশ্বরের ঐক্য স্থান বা সমাধিস্থান। এ অবস্থায় জীব ‘সোহহম’ জ্ঞানে ব্রহ্মত্ব লাভ করে—এখানে রোগ নাই শোক নাই, “তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহা গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।” বৌদ্ধ চৌতালা মন্দিরে নির্ব্বাণ মুক্তিও ইহার অবিকল প্রতিচ্ছবি।” আসল কথা এ অবস্থায় আমার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য—আমার আমিত্ব বজায় থাকিবে কিনা? যদি

আমার আমিত্ব বিলুপ্ত হইল, তবে আমি প্রস্তরে পরিণত হই, কিম্বা ব্রহ্মেতে বিলীন হই, অথবা নির্ব্বাণ মহাসাগরে মিশিয়া যাই, আমার পক্ষে সে একই কথা। আমি জানিতে চাই, আমার ব্যক্তিগত জীবন—আমার আমিত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হইবে অথবা ক্রমোন্নতি সহকারে উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরূঢ় হইয়া জ্ঞান ধর্ম্ম স্বাধীনতায় উন্নত হইবে ? যদি জিজ্ঞাসা করেন 'আমি কি',—ইহা যুক্তি ও তর্কের কথা নহে, আমরা প্রত্যেকে অন্তরাত্মাতে জ্ঞানালোকে তাহা অনুভব করিতেছি। আমি জড় হইতে পৃথক্—অন্য জীব হইতে পৃথক্, এই পার্থক্য হইতেই আমার আমিত্ব ফুটিয়া উঠে। আমার এই আত্মা কর্ম্ম বাসনা—প্রেম মমতা ও অনুরূপ সহস্র আকর্ষণের মধ্য দিয়া, এই ক্ষণ-স্থায়ী বাসগৃহে থাকিয়া দুঃখ ক্লেশের মধ্য দিয়া, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমি যে অনন্ত জীবন প্রতীক্ষা করিতেছি, তাহাতে আমার আমিত্ব সুরক্ষিত থাকিবে ; আমার নিজের শুভাশুভের জন্য আমি নিজেই দায়ী ; আমার নিজের কর্ম্ম ফল যখন আমি নিজেই ভোগ করিব ; আমার পুণ্যফল পাপের ভোগ আমারই। বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বেদান্ত দর্শন এ উভয়ের উপ-দেশ অনুসারে যদি আমার আমিত্ব লোপেই মুক্তি হয়, তবে আমার পক্ষে এ দুইই সমান। ব্রহ্মেতে আত্মার লয় কিম্বা মহানির্ব্বাণে আত্মার লয়, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি ? বৌদ্ধধর্ম্ম যদি এই অহমিকার উচ্ছেদে, এই আত্মঘাতে মুক্তি অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন তবে বুদ্ধের উপদিষ্ট সার্ব্বভৌম মৈত্রের আধার কোথায় মিলিবে ? অন্যের প্রতি আসক্তি ছাড়িয়া দিলে কি প্রেমের মূল শুষ্ক হয়না ? আসক্তিবিহীন প্রীতি—এ ত

আমাদের কল্পনাতীত! মনুষ্য যদি কখন ঈশ্বর লাভে সমর্থ হন তবুও তাঁহার জীবিত স্রোত পৃথক্ ভাবে প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজনীয়। মনুষ্য জন্ম দুঃখময় বলিয়া তাহার উচ্ছেদ সাধন করা—কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া স্পন্দহীন অচল নিশ্চেষ্টতার মধ্যে প্রবেশ করা—সকল জীবনের মূল যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া ব্রহ্মে কিম্বা শূন্যে মিশিয়া যাওয়া, ইহার পরিণামে মনুষ্যত্বের আর কি অবশিষ্ট রহিল? ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম ও আর্য্যধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধবিষয়ক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "বৈদান্তিক চৌতালা মন্দিরের তুরীয় অবস্থা এবং বৌদ্ধ চৌতালা মন্দিরের নির্ব্বাণ-মুক্তি এ পিঠ ও পিঠ।" বেদান্ত মতে জীবাত্মার পরব্রহ্মে বিলীন হওয়া—বৌদ্ধ মতে নির্ব্বাণ প্রলয়সাগরে ডুবিয়া যাওয়া—ইহার উর্দ্ধে আর কিছুই নাই=অন্ধকার, নিস্তব্ধতা, শূন্যতা, বিনাশ!

টিপ্পনী—বুদ্ধদেব বৈশালীর কূটাগার শালায় যে উপদেশ দেন তাহার ব্যাখ্যা।

চারিটী স্মৃতি-উপস্থান (ধ্যান)—

১। কায় অপবিত্র
২। সংসার দুঃখময়
৩। চিত্ত চঞ্চল
৪। পদার্থ সমুহ অলীক

চারিটী ধর্ম্ম-চেষ্টা—

১। অর্জ্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ
২। অলব্ধ পুণ্যের উপার্জ্জন
৩। পূর্ব্ব সঞ্চিত পাপের পরিত্যাগ
৪। নূতন পাপের অনুৎপত্তি

চারিটী ঋদ্ধিপাদ
অলৌকিক সিদ্ধি লাভের—

১। অভিলাষ
২। চিন্তা
৩। উৎসাহ
৪; অন্বেষণ

পঞ্চবল—

১। শ্রদ্ধা
২। সমাধি
৩। বীর্য্য।
৪। স্মৃতি
৫। প্রজ্ঞা

সপ্ত বোধাঙ্গ—

১। স্মৃতি
২। বিবেক
৩। বীর্য্য
৪। প্রীতি
৫। শ্রদ্ধা
৬। বৈরাগ্য
৭। সমাধি

অষ্ট আর্য্যমার্গ—

১। সম্যক্ দৃষ্টি
২। সম্যক্ সঙ্কল্প
৩। সম্যক্ বাক্
৪। সম্যক্ কর্ম্মান্ত
৫। সম্যক্ আজীব
৬। সম্যক্ ব্যায়াম
৭। সম্যক্ স্মৃতি
৮। সম্যক্ সমাধি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধ সঙ্ঘ।

উপক্রমণিকা।—

বৌদ্ধধর্ম্ম ত্রিরত্নে খচিত—বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ। হিন্দুধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তির ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম ক্ষেত্রে এই তিনের ত্রিমূর্ত্তি কল্পিত দেখা যায়। মুমূক্ষু ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সময় এই ত্রিবর্গের শরণাপন্ন হইয়া দীক্ষা লাভ করেন।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

বৌদ্ধদের এই দীক্ষা মন্ত্র।

সঙ্ঘ।—

এ পর্য্যন্ত 'বুদ্ধ' ও 'ধর্ম্ম' এই দুই অঙ্গ লইয়াই অল্প-বিস্তর চর্চ্চা করা গিয়াছে। বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত এবং তাঁহার উপদিষ্ট ধর্ম্মতত্ত্ব যথাসাধ্য সমালোচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের তৃতীয় অঙ্গ যে সঙ্ঘ এই প্রবন্ধে তাহার অবতারণা করাই সঙ্গত বোধ হয়।

আমরা দেখিয়াছি যে, বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র এই যে মনুষ্য জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়; বিষয় তৃষ্ণাই সেই দুঃখের মূল এবং

বুদ্ধ নির্দ্দিষ্ট আর্য্যমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক তৃষ্ণা পরিহারই সেই মূলোচ্ছেদের উপায়। এইরূপ বিশ্বাস ও উপদেশের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ সঙ্ঘের উৎপত্তি। গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের উপদেশ সম্যক্‌রূপে পালন করা গৃহীর পক্ষে সম্ভব নহে। সংসারের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া গৃহের বাহির হওয়া নির্ব্বাণ লাভের উৎকৃষ্ট সাধন; সহজ কথায়, নির্ব্বাণ পথের পথিক হইতে গেলে গৃহস্থের সন্ন্যাসী হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধদেব স্বয়ং মুণ্ডিত কেশে, গৈরিক বেশে, ভিক্ষাপাত্র হস্তে সেই জীবন ব্রত অবলম্বন করিলেন এবং স্বকীয় দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা অন্যকে সেই পথে নিয়োজিত করিলেন। কাজেই তাঁর শিষ্যবর্গ মিলিয়া এক উদাসীন সম্প্রদায় স্বতই সংগঠিত হইল। বুদ্ধ সম্প্রদায়ী উদাসীনের নাম ভিক্ষু এবং সমাজ বদ্ধ ভিক্ষুদলের নাম সঙ্ঘ।

বৌদ্ধধর্ম্ম যখন হিন্দু সমাজ হইতেই বিনিঃসৃত তখন সহজেই মনে করা যাইতে পারে যে এই উদাসীন সম্প্রদায় বুদ্ধ-দেবের স্বকপোল-কল্পিত নূতন সৃষ্টি নয়। ইহার নিয়মাবলীর মধ্যে হিন্দু সমাজের রীতিনীতি বহির্ভূত অভিনব ব্যাপার কিছুই নাই। হিন্দুদের আদর্শ জীবন ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বান-প্রস্থ, সন্ন্যাস, এই চতুরাশ্রমে বিভক্ত। ইহার শেষ আশ্রম-বাসী যিনি তিনি সন্ন্যাসী। বুদ্ধের সময়েও যোগী, বৈরাগী, যতী, মৌনী, নির্গ্রন্থ, অচেলক, দিগম্বর প্রভৃতি নানা ধরণের সন্ন্যাসী বিদ্যমান ছিল, তাঁহার প্রবর্ত্তিত উদাসীন-সম্প্রদায়ও উহাদের সহিত এক ছাঁচেই গঠিত। তবে ইহার বিশেষত্ব কোন্‌খানে, পরে পরে বিবৃত হইবে।

মধ্যপথ।—

অন্যান্য উদাসীন সম্প্রদায়ের সহিত বৌদ্ধ সঙ্ঘের এক বিষয়ে পার্থক্য প্রতীয়মান হয়। শরীর-শোষণ, উপোষণ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রভৃতি কষ্ট সাধন বুদ্ধ দেবের অনুমোদিত ছিল না। তাঁহার মহাভিনিষ্ক্রমণের পর ৭ বৎসর ধরিয়া তিনি ঘোরতর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত থাকেন। প্রথমে তিনি আলার ও উদ্রক এই দুই গুরুর নিকট যোগ শিক্ষা করেন, তাহাতে কোন ফল না পাইয়া রাজগৃহ হইতে উরুবেলার বনে গিয়া আর পাঁচ জন সন্ন্যাসী সহ নিঃশ্বাস-রোধ, দীর্ঘ উপবাস, শরীর শোষণকারী অশেষ প্রকার কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আহার কমিয়া কমিয়া ক্রমে এক মুঠা চাউল, তাহা ও রহিল না। শেষে একদিন এমন হইল যে চলিতে চলিতে মূর্চ্ছা গিয়া ভূতলে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর এই সমস্ত কঠোর সাধনা নিতান্ত নিষ্ফল বিবেচনায় তাহা হইতে বিনিবৃত্ত হইলেন। অনশন ব্রত পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ আহারাদি দ্বারা শরীরে বল পাইলেন—তখন ধর্ম্ম সাধনের অন্য পন্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধত্ব পাইবার পর তাঁহার বারাণসী বক্তৃতায় বলেন যে একদিকে কঠোর তপস্যায় শরীরক্ষয়, অন্য দিকে আমোদ প্রমোদ বিলাসিতা, তিনি এই উভয়ের মধ্য-পথ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। উপবাস বা শরীর শোষণ প্রকৃত ধর্ম্মসাধন নহে কিন্তু আত্ম-সংযম ও সত্যানুশীলনই আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়; শরীরে বল না থাকিলে আত্মার ও বলহানি হয় বুদ্ধদেব তাহা পরীক্ষায় জানিয়াছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক জীবনের বীণাতন্ত্রীর সহিত সাদৃশ্য দেওয়া

হয়—খুব জোরে বাঁধিলে তার ছিঁড়িয়া যায়, বেশী ঢিলা থাকিলে ও সুস্বর হয় না। অতএব শারীরিক কষ্ট কল্পনা ছাড়িয়া অন্তরের দিকে দৃষ্টি করা—ধ্যাণ ধারণা আত্ম-সংযম দ্বারা মনো-বৃত্তি সমুদায়ের সামঞ্জস্য সাধন করা বুদ্ধ এই রূপ উপদেশ দিতেন। তাঁহার ভিক্ষুদল সেই উপদেশানুসারে চলিত। আহার বিহার বাস বসনে অন্যান্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায় হইতে তাহাদের চাল চলন স্বতন্ত্র ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষান্নজীবি ছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহার কোন অন্ন কষ্ট ছিল না। স্বহস্ত-স্যূত চীরপুঞ্জ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র কিন্তু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দিগম্বরের ন্যায় বিবস্ত্র থাকিতেন না—ত্রিবসন মণ্ডিত সুরুচি সঙ্গত ভদ্র সাজে সজ্জিত হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন। কথিত আছে যে একদিন অনাথপিণ্ডিকের বাড়ী একদল জটাধারী, ভস্ম-বিভূতি মাখা, বীভৎস নগ্ন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহার স্ত্রী আপন পুত্রবধূ সুমাগধাকে ডাকিয়া বলিলেন "আসিয়া দেখ কেমন সন্ন্যাসী আসিয়াছে।" সুমাগধা ভাবিলেন সারীপুত্র কি আর কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেখিতে পাইবেন। এই মনে করিয়া মহোল্লাসে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া দেখেন, একি অদ্ভুত দৃশ্য। এই সকল বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁর চক্ষু স্থির! অমনি বিমর্ষ ভাবে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন "বাছা, তোমায় বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?" তিনি বলিলেন "ইহারা যদি ভিক্ষু সাধু হয় তবে না জানি দুর্জন কাহাকে বলে?"

সঙ্ঘের গঠন—দলাদলি।—

এই উদাসীন সম্প্রদায় যে কঠোর সামাজিক শাসনতন্ত্রে

বদ্ধ ছিল তাহা নহে। রাজার ন্যায় কোন শাসনকর্ত্তার উপর সঙ্ঘের শাসন ভার ন্যস্ত ছিল না; সুশাসন উদ্দেশে ঐ সম্প্রদায়ের কোন প্রতিনিধি সভাও সংস্থাপিত হয় নাই। বুদ্ধদেব মঠপতি সদৃশ আপনার কোন উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই, তাঁহার মরণানন্তর তাঁহার শিষ্য আনন্দ তাহা স্পষ্টই বলিয়াছিলেন। আনন্দ তখন রাজগৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহারাজ অজাতশত্রু সেখানে এক দুর্গ নির্ম্মাণের আদেশ করেন ও তাঁহার প্রধান অমাত্য এই কার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আনন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, "বুদ্ধদেব কি তাঁহার কোন শিষ্যকে আপন উত্তরাধিকারীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন?" আনন্দ তাহার উত্তরে কহিলেন—না। মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্ঘ হইতে কি কোন একজন ভিক্ষু মঠাধিকারী রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন?" তাহার উত্তরেও বলিলেন "এরূপ কোন ভিক্ষু নিযুক্ত হন নাই।" "যদি তোমাদের কোন পথ প্রদর্শক আশ্রয় না থাকেন তবে তোমাদের মধ্যে ঐক্য বন্ধনের উপায় কি?" উত্তর—"আমাদের সে আশ্রয়ের অভাব নাই—আমাদের শরণ—ধর্ম্ম।" ভিক্ষুদল যে সমস্ত আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন তাহা ভগবান বুদ্ধের আদেশ বলিয়া প্রচারিত হইত। বুদ্ধই ভিক্ষুদলের দলপতি—তাঁহার আদেশ, তাঁহার উপদেশ ও অনুশাসন ভিক্ষুদের সকলেরই মাননীয় ও পালনীয়। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহার শাসন অনতিক্রমণীয় ছিল কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আর সে শাসনের বল রহিল না। তখন তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ নিবারণের একমাত্র উপায় ছিল ভিক্ষুসভা আহ্বান

করিয়া তাহাদের মন্ত্রণা গ্রহণ; এই উদ্দেশেই রাজগৃহ ও বৈশালীতে বৌদ্ধসভা হয় কিন্তু এই সকল সভার স্থানীয় অধিকার ভিন্ন অধিক কিছু কল্পনা করা যায় না। সে সভার শাসন-বল কতটা? সে সভার মতামত সাধারণ বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত করিবার উপায় কি ছিল? তাহার কোন নিয়ম জারী হইলে তাহা যদি কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পালন করে সে অন্যকথা কিন্তু না করিলেই বা কি? বুদ্ধদেবের মৃত্যুতে সাধারণ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যেমন শোকধ্বনি উঠিয়াছিল তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আবার এই কথাও শুনা গেল—"আঃ গৌতম গেল বাঁচা গেল। এখন আমরা মনের সাধে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিব, আমাদের শাসন করিবার জন্য কোন গুরু মহাশয় নাই।" এই কথা শুনিয়া কাশ্যপের মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল ও তাঁহারই মন্ত্রণায় ভিক্ষু সভা বসিল। কিন্তু তাহার বিধান মানে কে? এইরূপ কথিত আছে যে রাজগৃহের সভা-স্থলে স্থবির ভিক্ষু পুরাণ উপস্থিত ছিলেন না। সভাভঙ্গের পর তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলা হইল—"হে পুরাণ, স্থবিরদের মতে এই যে শাস্ত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা অনুমোদন করিতে আজ্ঞা হউক।" পুরাণ কহিলেন "তাঁহারা শাস্ত্র বাঁধিয়াছেন ভালই কিন্তু স্বয়ং বুদ্ধ ভগবানই আমার গুরু; তাঁহার মুখে আমি যে উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি আমি তাহাতেই অনুরক্ত থাকিব।" বৈশালীর সভাও এই দলাদলি হইতে উৎপন্ন, কতকগুলি ভিক্ষু সঙ্ঘ-নিয়মের কঠোরতা নিবারণ জন্য কোন কোন নিয়মের পরিবর্ত্তন হয় এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাঁহারা এইরূপ দশটি নিয়ম নির্দ্দেশ করেন—অশন

বসন সম্বন্ধে কতকগুলি ছোটখাট নিয়ম, তাছাড়া সোনারূপা গ্রহণের যে নিষেধ ছিল তাহা দূরীকরণ। এই সকল বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্কের পর নবীন মত অগ্রাহ্য হইয়া সঙ্ঘের প্রাচীন পন্থীদের মর্য্যাদাই রাখিতে হইল। তথাপি প্রতিপক্ষীয়েরা সন্তুষ্ট হইলেন না। তাহারাও স্বপক্ষ হইতে এক সভা করিলেন, এই সভা 'মহাসঙ্গীতি' বলিয়া অভিহিত। এই বিপক্ষ দলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া দীপবংশ বলেন—"ইহারা ধর্ম্মনষ্ট ও শাস্ত্র উল্টাইতে চায়—বুদ্ধের উপদেশের নূতন অর্থ করিয়া স্বমত সমর্থন করে—সূত্র বিনয় ও পরিবার পাঠ, অভিধর্ম্ম, নিদেশ, জাতক প্রভৃতি একদিকে ফেলিয়া দিয়া নিজেদের মনগড়া শাস্ত্র পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে উদ্যত।" বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই মতভেদ দলাদলি আরো বাড়িয়া উঠিল—ক্রমে বৌদ্ধেরা অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল—তাহাদের গুরুও ভিন্ন ভিন্ন। এই কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রতিকূলে বুদ্ধের উপর ভক্তি শ্রদ্ধা, বৌদ্ধশাস্ত্রে আস্থা, ধর্ম্ম-বন্ধনে সাধারণ অনুরাগ ও উৎসাহ এ ভিন্ন আর কোন শক্তি ছিল না। ভারতে বৌদ্ধ-সঙ্ঘ নির্ম্মূল হইবার এক কারণ মনে হয় সঙ্ঘের এই প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশা হইতেই এইরূপ মতভেদের সূত্রপাত দেখা যায়, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলে আলোচ্য বিষয়ের স্পষ্টীকরণ হইবে; আমরা ও আমাদের এখনকার সমাজের বিচ্ছেদ দলাদলি দূর করিবার সদুপায় স্থির করিতে পারিব।

যখন ভগবান্ বুদ্ধ কৌশম্বীতে বাস করিতেছিলেন সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর প্রতি অকারণে দোষারোপ করা হয় কিন্তু তিনি

নিজ দোষ কিছুতেই স্বীকার করেন না; ভিক্ষু মণ্ডলী তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া বহিষ্কার দণ্ড বিধান করে।

সেই ভিক্ষু বিদ্বান্ বুদ্ধিমান ধর্ম্মশাস্ত্র বিশারদ এবং বিনীত স্বভাব ছিলেন। তিনি নিজ বন্ধুগণের নিকট গিয়া বলিলেন "আমি ত কোন দোষ করি নাই আমাকে অনর্থক দণ্ড বিধান করা হইয়াছে। আমি আপনাকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত মনে করিতে পারি না। আপনারা আমাকে এই অন্যায় দণ্ড হইতে মুক্তি করুন।"

তাঁহার বন্ধুগণ বিচারকদের নিকট গিয়া আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর দুই দলের মধ্যে ঘোর কলহ বিবাদের উপক্রম হইল।

বুদ্ধের নিকট ইহার মীমাংসার জন্য উভয় দলই উপস্থিত হইল। বুদ্ধদেব দুপক্ষকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন ও যাহাতে সদ্ভাব রক্ষিত হয় তাহার উপদেশ দিলেন।

তবুও দলাদলি ভাঙ্গে না। উভয় পক্ষ স্বতন্ত্রভাবে উপবাস প্রভৃতি নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হইল। বুদ্ধদেব তাহা দেখিয়া বলিলেন দুই দলের মধ্যে যখন ঐক্য নাই তখন তাহাদের স্বতন্ত্র ভাবে নিজ নিজ ধর্ম্মকৃত্য অনুষ্ঠান করাই বিধেয়। এবং তিনি বিবাদের সূত্রধারদিগকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন "হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা পরাহত হয় না কিন্তু প্রেমগুণে বিজিত হয়। অজ্ঞানবশতঃ যে ব্যক্তি বিবাদ কলহে প্রবৃত্ত হয় তাহাকে কিছু বলিবার নাই কিন্তু জানিয়া শুনিয়া এইরূপ অসদ্ব্যবহার দূষণীয়। তোমরা সকলে শান্তি সদ্ভাবে বাস করিতে শিক্ষা কর, এই আমার

উপদেশ। আর তা না পার ত বনে গিয়া নির্জ্জনে বাস কর। দুষ্টের সহবাস অপেক্ষা অরণ্যের নির্জ্জনতা শতগুণে শ্রেয়স্কর।"

এইরূপ উপদেশে ও ভিক্ষুদলের বিবাদ ভঞ্জন না হওয়াতে ভগবান্ বুদ্ধ কোশম্বী পরিত্যাগ করিয়া শ্রাবস্তীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে এই কলহ বিবাদ আরো অধিক প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। পরে কোশম্বীর গৃহস্থেরা স্থির করিল এই সকল ভিক্ষু মহা গণ্ডগোল বাধাইয়াছে, ইহাদের দৌরাত্ম্যে বুদ্ধদেবও চলিয়া দূরে গমন করিলেন। এই সকল ভিক্ষুদিগকে আমরা আর ভিক্ষা দান করিব না। ইহারা গৈরিক বসন ধারণের উপযুক্ত নহে—ইহারা সংসারে ফিরিয়া গেলেই ঠিক হয়।" গৃহীদের এইরূপ আচরণে ভিক্ষুদলের চৈতন্য হইল ও তাহারা তখন পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপনে কৃতনিশ্চয় হইল।

উভয় পক্ষের লোকেরা শ্রাবস্তী গিয়া উপস্থিত হইল। সারীপুত্র বুদ্ধদেবের নিকট নিবেদন করিলেন, ভগবন্ এই সকল কলহপ্রিয় ভিক্ষুদল সমাগত হইয়াছে, ইহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব ?

বুদ্ধদেব কহিলেন।—

ইহাদিগকে ভর্ৎসনা করিও না—কর্কশবাক্য কাহারো ভাল লাগে না। উভয়পক্ষের কথা শুনিয়া বিচার কর। এক পক্ষের কথা শুনিয়া ইতি কর্ত্তব্য স্থির করা অসম্ভব। উভয় পক্ষের দোষগুণ প্রণিধান পুরঃসর বিচার করা মুনির লক্ষণ।

কুলস্ত্রী প্রজাপতি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এইক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য ?

বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন "উভয় দলকেই গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া পরিতুষ্ট কর—কোন এক দলের প্রতি পক্ষপাতী হইও না।"

উপালী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের কলহের ব্যাপার তদন্ত না করিয়া কি ইহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন বিধেয়? বুদ্ধ কহিলেন—"না এরূপ হইতে পারে না। অনুসন্ধান দ্বারা ইহাদের দোষ গুণ বিচার না করিয়া এর শেষ পর্য্যন্ত তলাইয়া না দেখিলে সন্ধি স্থাপনের উপায় নির্ণয় করা অসাধ্য। মৌখিক সন্ধি, কোন কার্য্যের নহে—অন্তরের সহিত পরস্পরের দোষ মার্জ্জনা না করিলে স্থায়ী ফল প্রত্যাশা করা বৃথা। এক মৌখিক সন্ধি—অন্য যে আন্তরিক সখ্য-বন্ধন তাহাই প্রকৃত সন্ধি।" এই বলিয়া তিনি দীর্ঘায়ুর গল্প বলিলেন।

পুরাকালে কাশীতে ব্রহ্ম দত্ত নামক এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তিনি দীর্ঘেতি নামক কোশল রাজের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কারণ তিনি মনে ভাবিলেন কোশল এক ক্ষুদ্র রাজ্য—দীর্ঘেতি আমার সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পারিয়া উঠিবে না। দীর্ঘেতি নিজের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন ও নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে কাশী আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় তিনি সন্ন্যাসী বেশে এক কুম্ভকার গৃহে রাণীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাণীর এক সন্তান জন্মিল, তাহার নাম দীর্ঘায়ু। দীর্ঘায়ু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা তাঁহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাহাকে দূরে পাঠাইয়া দিলেন।

যখন ব্রহ্মদত্ত জানিতে পারিলেন যে কোশল রাজ ছদ্মবেশে রাণীর সহিত কুম্ভকার গৃহে বাস করিতেছেন তখন তিনি তাহাদের উভয়কে ধৃত করিয়া প্রাণদণ্ড আদেশ করিলেন।

তাঁহাদের পুত্র দীর্ঘায়ু কাশীর বাহিরে বাস করিতেছিল, তাঁহার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে আনাইয়া উপদেশ দিলেন—"হে পুত্র দীর্ঘায়ু, অধিক দেখিও না—অল্প দেখি ও না। হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা পরাজিত হয় না—মৈত্রীগুণে হিংসাকে পরাজয় করিবেক।"

দীর্ঘায়ু বনে গমন করিয়া কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি নগরে ফিরিয়া আসিয়া নৃপতির হস্তী-রক্ষকের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি বীণা বাজাইয়া মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিলেন। রাজা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করাতে পরিজনেরা বালকটীকে রাজার নিকট লইয়া গেল; রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পার্শ্বের অনুচর করিয়া রাখিলেন।

একদিন রাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়া তাঁহার অনুচর বর্গ হইতে দূরে গিয়া পড়িলেন—সঙ্গে কেবল দীর্ঘায়ু রহিল। দীর্ঘায়ুর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া রাজা নিদ্রা গেলেন।

দীর্ঘায়ু মনে মনে ভাবিলেন, রাজা আমাদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন—আমার পিতা মাতাকে হনন করিয়া আমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন। এখন তাহার প্রতি-শোধের সময় আসিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি কোষ হইতে তরবারি উন্মোচন করিলেন।

তখন পিতার শেষ কথাগুলি দীর্ঘায়ুর স্মরণ হইল—স্মরণ করিয়া আবার খড়্গ কোষমধ্যে রাখিয়া দিলেন।

রাজা এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রাজা কহিলেন "আমার কখনই সুনিদ্রা হয় না, আমি সর্ব্বদাই এই দুঃস্বপ্ন দেখি যে দীর্ঘায়ু তরবারি হস্তে আমাকে মারিতে আসিতেছে—দেখিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। আমি তোমার কোলে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছি এই স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে জাগিয়া উঠিলাম।"

তখন যুবক বাম হস্ত রাজার মস্তকে রাখিয়া দক্ষিণ করে খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন "মহারাজ! আমিই দীর্ঘায়ু দীর্ঘেতি রাজার পুত্র—আমার পিতাকে হনন করিয়া আপনি তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন করিয়াছেন। দেখুন এখন প্রতিশোধের সময় আসিয়াছে।"

রাজা আপনাকে অরক্ষিত দেখিয়া কহিলেন "হে দীর্ঘায়ু আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও—আমাকে বাঁচাও—প্রাণে মারিও না।"

দীর্ঘায়ু বলিল—"কেমন করিয়া আপনার প্রাণদান করিব যখন আমার নিজের প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত। যদি আপনি আমাকে অভয় বচন দেন তাহা হইলে আমিও আপনার প্রাণ রক্ষা করিব।"

রাজা সম্মত হইয়া কহিলেন "তুমি আমার প্রাণদান কর, আমিও তোমাকে অভয়বচন দিতেছি।"

পরে তাঁহারা পরস্পর হাতে হাত দিয়া বন্ধুত্ব শপথ করিলেন।

ব্রহ্ম দত্তকে দীর্ঘায়ু তাঁহার পিতার শেষ উপদেশগুলি ভাঙ্গিয়া বলিলেন। ব্রহ্মদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতা মৃত্যু কালে যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহার অর্থ কি? "অধিক দেখিও না—অল্প দেখিও না—হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা জিত হয় না।"

দীর্ঘায়ু কহিলেন—"অধিক দেখিও না অর্থাৎ হিংসা অধিক কাল মনে স্থান দিও না। অল্প দেখিও না অর্থাৎ বন্ধুবিচ্ছেদ অল্পে হইতে দিও না। হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা নিবারিত হয় না—তাহার অর্থ এই তুমি আমার পিতা মাতাকে বধ করিয়াছ—আমি যদি তাহার প্রতিশোধ লইবার মানসে তোমাকে হত্যা করি তাহা হইলে তোমার পক্ষের লোকেরা তাহার প্রতিশোধ তুলিয়া আমাকে বধ করিবেও আমার পক্ষের লোকেরা আবার তাহার শোধ তুলিবার চেষ্টায় ফিরিবে—প্রতিহিংসা দ্বারা হিংসা জিত হয় না। মহারাজা এখন তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ—আমিও তোমাকে প্রাণদান করিলাম—অহিংসা দ্বারা হিংসার পরাজয় হইল।"

ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুর কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার রাজ্য অশ্ব রথ সেনা সম্পত্তি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। এবং স্বীয় কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দিলেন।

হে ভিক্ষুগণ! বড় লোকদের এই সাধু দৃষ্টান্তে তোমরাও ক্ষমা দয়া অভ্যাস কর; গুরুজনকে ভক্তি কর—সকলকে প্রেম দৃষ্টিতে দেখ। তোমরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিও না—শান্তি ও সদ্ভাবে মিলিত হইয়া বাস কর এই আমার উপদেশ। আশীর্ব্বাদ করি যে গৃহস্থেরা তোমাদের সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সুখী হউক।

ভগবান বুদ্ধ গল্পচ্ছলে এই উপদেশ প্রদান করিয়া ভিক্ষু-দিগকে বিদায় করিলেন।

ভিক্ষুদল মিলিত হইয়া তাহাদের বিবাদ কলহ মিটাইয়া ফেলিল ও সেই অবধি তাহারা সুখে সদ্ভাবে কালযাপন করিতে লাগিল। সঙ্ঘের মধ্যে শান্তি স্থাপন হইল।

বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড।

পৌরোহিত্য।—

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব কালে আর্য্য সমাজে বলি, হোম, যাগ, যজ্ঞ ক্রিয়া কলাপ প্রবহমান ছিল এবং এই সকল কর্ম্ম কাণ্ডের অধিনায়ক হোতা ঋত্বিক্ অধ্বর্য্যু প্রভৃতি নানা শ্রেণীর পুরোহিত বিদ্যমান ছিলেন। এই আড়ম্বর পূর্ণ ক্রিয়া কর্ম্ম ও পৌরোহিত্য পরিবর্জন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি ভিত্তির উপর বুদ্ধদেব তাঁহার সঙ্ঘ স্থাপন করিলেন। তিনি বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড, বিশেষত পশু বলির প্রতি কিরূপ বীতরাগ ছিলেন তাহার নিদর্শন বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনেক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিষয় লইয়া এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হয় তাহাতে বুদ্ধদেব এইরূপে উপদেশ দেন ঃ—

পুরাকালে এক মহা প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন, তিনি এক মহা যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। কুল পুরহিতকে ডাকিয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করাতে পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ! এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রজাদের সুখ শান্তি ও কল্যাণ সাধনে মনোনিবেশ করুন। এই পরামর্শ ক্রমে রাজ্যের সমস্ত অকল্যাণ দূর করিয়া পরে তিনি যজ্ঞারম্ভ করিলেন। সে যজ্ঞে কোন পশু হত্যার ব্যবস্থা নাই। কোন বৃক্ষ ছেদন, একটী

তৃণের ও উচ্ছেদ সাধনের প্রয়োজন হইল না। ভৃত্যেরা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া গেল। ক্ষীর দুগ্ধ মধু-পর্ক এই সমস্ত বলিতে যজ্ঞের কার্য্য সমাধা হইল। কিন্তু বুদ্ধ কহিলেন ইহা অপেক্ষাও মহত্তর বলি আছে অথচ তাহা অপেক্ষা কৃত সহজসাধ্য—সে কি, না ভিক্ষুদিগকে অন্ন দান, বুদ্ধ ও সঙ্ঘের জন্য আশ্রম নির্ম্মান। ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলি যথন ভক্ত আসিয়া বুদ্ধধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হয়—যথন তিনি কোন প্রাণী হিংসার প্রশ্রয় দেন না, তাঁহার প্রতাপে সর্ব্ব প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা সুদূর পরাহত হয়; যথন তিনি ভিক্ষুর ন্যায় সুখ দুঃখ হইতে নিবৃত্ত হইয়া শান্তি সলিলে নিমগ্ন হয়েন। কিন্তু সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলি যথন তিনি দুঃখ শোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করিয়া জ্ঞান নেত্রে এই নির্ব্বাণাবস্থা অনুভব করেন ও জানিতে পারেন "আর আমাকে এই মর্ত্ত্য লোকে ফিরিয়া আসিতে হইবে না।"

বুদ্ধের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ তখনি বিনীত ভাবে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি এক বৃহৎ যজ্ঞ করিবার মানসে অনেক পশু সংগ্রহ করিয়াছিলেন সে সকলকে ছাড়িয়া দিয়া বুদ্ধকে কহিলেন তেমনি

"দেখুন আমি এই সকল জীবকে মুক্ত করিয় বিধানানুসারে গৃহ-

মনের সুখে চরিয়া বেড়াক্—মুক্ত বায়ু ইহারদি ন তাহারা পূর্ব্ব বংশ

এইরূপ কথিত আছে যে বুদ্ধের উ পুত্রীয় ভিক্ষু নামেই

তাঁহার রাজ্যে যজ্ঞে পশু হত্যা উঠা সন্ন্যাসধর্ম্মের উপদেশ

দিলেন "এখন হইতে যজ্ঞে আর পশু কোন রাজভৃত্য বা অনু-

প্রতি মনুষ্য সদয় হইলে দেবতারা ম কায়মনোবাক্যে শুদ্ধাচারী

পুরোহিতের কর্ম্ম কাণ্ড ছাড়িয়া দিলে পৌরোহিত্য কাজেই চলিয়া যায়—বৌদ্ধ সঙ্ঘে ও তাহাই দেখা যায়। গুণ ও বয়সে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রাধান্য ছিল—বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রথম বয়সে তাহার মধ্যে পৌরোহিত্যের প্রভাব উপলক্ষিত হয় না। সে প্রভাব কেনই বা থাকিবে? যে ধর্ম্মে দেবতার আসন নির্দ্দিষ্ট নাই—শান্তি স্বস্ত্যয়নের বিধান নাই—যে ধর্ম্মে যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কর্ম্ম ভজন পূজনের কোন বিধি ব্যবস্থা নাই সে ধর্ম্মে পুরোহিত কিসের জন্য? যাগ যজ্ঞের অধীশ্বর, দেব মানবের মধ্যস্থ এরূপ কোন কার্য্যকর্ত্তার কিছুই প্রয়োজন নাই।—বৌদ্ধ মতে প্রত্যেক মনুষ্য নিজ পুণ্য প্রভাবে নির্ব্বাণ লাভের অধিকারী, প্রত্যেক বৌদ্ধ আপনি আপনার প্রদীপ, আপনি আপন নির্ভর যষ্টি। প্রত্যেক বৌদ্ধ ভিক্ষু আপনই আপনার পুরোহিত, আপনই আপনার যজমান। বুদ্ধদেব মুমূক্ষু মাত্রকেই সংসার ও গৃহ সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্য পথে আহ্বান করিতেছেন কিন্তু সাধকের মোক্ষ লাভ নিজের যত্ন চেষ্টা ও সাধনার উপরেই নির্ভর।

এই নিয়ম যাহা বলা হইল তাহা আদি বৌদ্ধ সমাজে খাটে, ...ক্কারে ও স্থান বিশেষে ইহার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ ...ঙ্গ সঙ্গে সিংহল, চীন, তিব্বত প্রভৃতি ভিন্ন ...কার প্রকার নিয়ম বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ... ইহা যে অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে ...র অনুমোদিত কে বলিবে? আচার্য্য ...ীর মণ্ডিত পণ্ডিত-পুরোহিত, সমস্বরে ...ণ্টার ঘটা, বৃহৎ মঠ মন্দিরে পট

পুত্তলী প্রতিষ্ঠা, শান্তি জল সিঞ্চন, উপোষণ ও গুরু সন্নিধানে আত্মদোষ স্বীকার, পার্গেটরি সদৃশ নরকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ, সেণ্ট প্রতিম বোধিসত্ত্ব কল্পনা, পোপের স্থানীয় ধর্ম্ম যাজক লামার অধিকার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম্ম মূলধর্ম্ম হইতে বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছে, বরং আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম্মের সহিত উহার সাতিশয় সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

জাতি বিচার।—

বর্ণাশ্রমের সহিত বৌদ্ধ সঙ্ঘের সম্পর্ক কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে গুটি কতক কথা বলা আবশ্যক।

যদি ও জাতিভেদ প্রথা উন্মূলিত করিয়া হিন্দু-সমাজ ভাঙ্গিয়া ফেলা বুদ্ধদেবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে বর্ণ বিচার তাঁহার সমাজের পত্তন ভূমি নহে— ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি শ্রেষ্ঠ বর্গের ন্যায় নীচ বর্ণের লোকে ও ভিক্ষু সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকারী। বুদ্ধদেব একস্থানে বলিয়া গিয়াছেন "হে ভিক্ষুগণ—যেমন গঙ্গা যমুনা—মহী অচিরাবতী প্রভৃতি নদনদী যেমনই হউক না কেন সাগরে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ পুরাতন নাম ধাম হারাইয়া একই সাগর নাম ধারণ করে তেমনি যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চতুর্বর্ণ আমার বিধানানুসারে গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করে তখন তাহারা পূর্ব্ব বংশ মর্য্যাদা পূর্ব্ব নাম পরিত্যাগ করিয়া শাক্য পুত্রীয় ভিক্ষু নামেই অভিহিত হয়।" রাজা অজাতশত্রুকে সন্ন্যাসধর্ম্মের উপদেশ প্রদান কালে বুদ্ধ বলিতেছেন—"যদি কোন রাজভৃত্য বা অনুচর গৈরিক বসন পরিধান পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে শুদ্ধাচারী

হইয়া ভিক্ষু বৃত্তি অবলম্বন করে, হে রাজন্ তখন কি তুমি বলিবে এ আমার ভৃত্য—আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিবে—আমার নিকট প্রণতভাবে আমার আজ্ঞাধীন থাকিবে—সকল সময় আমার কথা মত চলিবে—আমার সেবা তৎপর থাকিবে ?” রাজা উত্তর করিলেন “প্রভো তাহা নহে—আমিই তাঁহার নিকট প্রণত হইব—তাঁহাকে বসিবার আসন দিব—তাঁহাকে অন্ন বস্ত্র ঔষধ পথ্য যখন যাহা আবশ্যক তাহা দান করিব—তাঁহার সকল অভাব মোচন করিয়া যাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত থাকেন তাহার উপায় বিধান করিব।”

বুদ্ধ শিষ্যের গৈরিক বসনে রাজা প্রজা ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই একীভূত। একমাত্র উচ্চবর্ণের লোকে নির্ব্বাণ লাভের অধিকারী তাহা নহে—সুরনর উচ্চ নীচ সকলেরই কল্যাণ উদ্দেশে এই ধর্ম্ম প্রচারিত।

বুদ্ধের প্রথম শিষ্যদলের মধ্যে আমরা রাজনাপিত উপালীর নাম দেখিতে পাই। থেরাগাথায় সুনীত নিজ কাহিনী যাহা বলিতেছেন তাহা শ্রবণ করুন—

“নীচকুলে আমার জন্ম—আমি দীন দরিদ্র অজ্ঞান ছিলাম, মন্দিরের শুষ্ক ফুল ঝাঁট দিয়া মন্দির পরিচ্ছন্ন রাখা এই আমার কাজ। লোকে আমায় হেয়জ্ঞান করিত, আমি বড়লোকের নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইতাম। ভগবান বুদ্ধ যখন তাঁহার শিষ্যগণ সহ মগধের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছেন তখন তাঁহার দর্শন লাভ মানসে আমার মাথার বোঝা ফেলিয়া দিয়া ধাবিত হইলাম। আমায় দেখিয়া তিনি কৃপালু হইয়া ক্ষণেকের তরে দাঁড়াইলেন। রাজাধিরাজ তুল্য কোথায় সেই ভগবান্ বুদ্ধ আর

কোথায় আমার মত এই দীনহীন অকিঞ্চণ—আমার আবেদন শুনিবার জন্য থামিলেন। আমি প্রভুচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলাম—প্রভো এই অধীনকে আপনার ভিক্ষুদলে গ্রহণ করুন, তথন পরম কৃপালু ভগবান বুদ্ধ কহিলেন—"হে ভিক্ষু এস—আমার সঙ্গে চল।" এই আমার একমাত্র দীক্ষা।" পরে সুনীত কহিতেছেন "আমি অরণ্যে গিয়া ধ্যানধারণায় নিযুক্ত রহিলাম এবং মুক্তির উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। তথন দেবতারাও আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। বুদ্ধদেব আমাকে দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন "সদাচার শুদ্ধাচার পুণ্যবলে হীনবর্ণও ব্রাহ্মণ হয়—ব্রাহ্মণত্বের প্রকৃত লক্ষণ তাহাই।" জন্মিয়াই ব্রাহ্মণ হয় না, কর্ম্মগুণেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া যায়—বৌদ্ধশাস্ত্রে এইরূপ ভূরি ভূরি বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধদেব মাতঙ্গের গল্পে বলিয়াছেন—"মাতঙ্গ চণ্ডাল নিজ কর্ম্মগুণে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। জন্মিয়াই কেহ চণ্ডাল হয় না—জন্মিয়াই ব্রাহ্মণ হয় না—নিজ কর্ম্মগুণেই ব্রাহ্মণ—নিজ কর্ম্মদোষেই চণ্ডাল।" (সুত্ত নিপাত) "তিনিই ব্রাহ্মণ যিনি সত্য প্রেম ক্ষমা দয়া অভ্যাস করেন—যিনি সংযমী ও জিতেন্দ্রিয় অজ্ঞান ও পাপ-কলঙ্ক হইতে বিনির্ম্মুক্ত।" (ধর্ম্মপদ) কিন্তু ইহা হইতে মনে করিবেন না যে বুদ্ধদেব জাতিভেদ প্রথা উন্মূলন করিয়া সমাজ সংস্কারে সচেষ্ট ছিলেন। সমাজের মধ্যে যাঁহারা পিছিয়া পড়িয়াছে তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা, হীনবর্ণকে উন্নত করিবার চেষ্টা, অথবা সামাজিক কুরীতি কুসংস্কার সংশোধন চেষ্টা, ইহার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। সমাজ সংস্কার তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের

অঙ্গীভূত ছিল না। রাজ্য ও সমাজ যে অবস্থায় থাকুক না কেন, ভিক্ষু যিনি সমাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহার তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তিনি আপনার সঙ্ঘ নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিলেই হইল। ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ও চাতুর্বর্ণ্যের অন্যান্য নিয়ম রক্ষায় ভিক্ষুরা হস্তক্ষেপ করিতেন না—তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে বৈদিক আচার ক্রিয়া কাণ্ড বুদ্ধদেব ভিক্ষু সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইতে দেন নাই। 'বিদ্যার আকর' বলিয়া তাঁহার নিকট বেদের কোন মাহাত্ম্য ছিল না; তিনি নিজে প্রবুদ্ধ হইয়া যে মহাসত্য উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা বেদের ও অনধিগম্য, বেদবাক্য হইতেও উচ্চতর। সে সত্য বিশ্বজনীন, দেশ বিশেষে অথবা জাতিবিশেষে বদ্ধ নহে। তিনি সেই সত্য ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ নীচ সকলেরই মধ্যে প্রচার করিতে ব্রতী হইলেন, তাঁহার সঙ্ঘের দ্বারও সকলেরই জন্য উন্মুক্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সঙ্ঘের নিয়মাবলী।

প্রবেশ।—

বৌদ্ধ সঙ্ঘের অবারিত দ্বার, যাহার ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারে; প্রথম প্রথম প্রবেশ নিয়মের কঠোরতা ছিল না। বুদ্ধ দেবের জীবদ্দশায় যে সকল শিষ্য ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইত তাহার পরীক্ষার কাল সামান্যতঃ ৪ মাস নিরূপিত ছিল কিন্তু যোগ্য পাত্র হইলে সে নিয়মের ও ব্যতিক্রম ঘটিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি, বুদ্ধ যখন মল্লদের শালবনে মৃত্যু শয্যায় শয়ান সেই সময় সুভদ্র নামক একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আনন্দকে ডাকিয়া কহিলেন "আমি অনেকানেক বয়োবৃদ্ধ সাধু পুরুষের নিকট শুনিয়াছি তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাব জগতে দুর্লভ, তিনিই এইক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছেন। আজ রাত্রে না কি শ্রমণ গোতম ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। আমার মনে নানা সংশয় আসিয়া সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে একমাত্র শ্রমণ গোতম সেই সকল [illegible] দূর করিতে সক্ষম। আমি তাঁহার দর্শন লাভের তাহাদে[illegible] আসিয়াছি —তাঁহার কি দর্শন পাইব ?

অথবা সা[illegible]নন্দ কহিলেন—"এখন থাক্—আর না—তথাগতকে লক্ষণ দেঃ[illegible]ক্ত করিও না। তিনি এখন পীড়িত।"

এই কথোপকথন ভগবান বুদ্ধ তাঁহার রোগশয্যায় শুনিতে পাইয়া আনন্দকে ডাকিয়া কহিলেন—"আনন্দ! সুভদ্রকে আসিতে দেও। তিনি জ্ঞানলাভ মানসে আসিয়াছেন, আমাকে বিরক্ত করিবার জন্য নয়। তিনি যাহা শুনিতে চান আমি সাধ্যমত উত্তর দিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিব, তাঁহাকে আসিতে বারণ করিও না।"

তাঁহার অনুমতি ক্রমে সুভদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বুদ্ধদেব সুভদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করত তাঁহার সকল সংশয় ভঞ্জন করিলেন। সুভদ্র কহিল "ভগবন্, আপনার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণে আমি ধন্য হইলাম। যাহা গুহ্য তাহা মুক্ত হইল, যাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাহা গড়িয়া তুলিলেন। বিপথগামীকে আপনি সরল পথ প্রদর্শন করিলেন আমার সমক্ষে সত্য ধর্ম্ম প্রকাশিত করিলেন। অদ্য হইতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইতেছি। এখন হইতে প্রভু আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন।"

বুদ্ধ কহিলেন "যে কোন ব্যক্তি আমার এই ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে দীক্ষিত হইবার প্রার্থনা করে সাধারণ নিয়মানুসারে তাহার পরীক্ষার কাল চার মাস কিন্তু তোমাকে অব্যাহতি দিলাম—তুমি এখন হইতেই সঙ্ঘভুক্ত হইলে।" এই বলিয়া আনন্দকে ঐরূপ আদেশ করিলেন। আনন্দ সুভদ্রের মস্তকমুণ্ডন ও তাঁহাকে বসনত্রয় পরিধান করাইয়া এবং ত্রিশরণ মন্ত্র দিয়া শিষ্যদলে গ্রহণ করিলেন, পরে তিনি আসিয়া ভগবান বুদ্ধের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। সুভদ্র বৌদ্ধ ভিক্ষুরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং সাধনার গুণে কালক্রমে তিনি অর্হৎ পদে উন্নীত হইলেন।

ইনিই বুদ্ধের স্বহস্ত-দীক্ষিত শেষ শিষ্য। (মহা পরিনির্ব্বাণ সূত্র)

ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে বুদ্ধের সময় দীক্ষা বিধির কোন আড়ম্বরময় অনুষ্ঠান ছিল না। কালক্রমে প্রবেশিকার কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। যাহারা কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী, কুষ্ঠ প্রভৃতি মহাব্যাধিগ্রস্ত, রাজ ভৃত্য বা সৈনিক পদধারী, তাহাদের প্রবেশ নিষেধ। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক পিতা মাতার সম্মতি ব্যতীত সংঙ্ঘ প্রবেশের অনধিকারী, বার বৎসরের নীচে কেহ প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতে পারিবে না—২০ বৎসরের কমে ভিক্ষুর পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইবে না। সঙ্ঘের দুই সোপান—প্রথম প্রব্রজ্যা—দ্বিতীয়, উপসম্পদ। কোন গৃহস্থ ভিক্ষু-সঙ্ঘভুক্ত হইবার প্রার্থী হইলে নিয়মিত দিবসে দশ অথবা দশাধিক ভিক্ষু একত্রিত হন।) প্রার্থীকে একজন ভিক্ষু সভাস্থলে আনয়ন করিলে পর তিনি স্থবিরদিগকে প্রণাম করিয়া যথাসাধ্য গুরু দক্ষিণা দিয়া উপবিষ্ট হয়েন। তৎপরে তিনবার সঙ্ঘে নিবেদন করেন "আমাকে অনুগ্রহ করিয়া দীক্ষাদান করুন যাহাতে আমি দুঃখ শোক অতিক্রম করিয়া নির্বৃতি লাভের অধিকারী হইতে পারি।" সঙ্ঘপতি তাহার স্কন্ধে ভিক্ষুর বসনত্রয়ের গাঁঠরী ঝুলাইয়া দেন। প্রার্থী বসনত্রয় পরিধান পূর্ব্বক সন্ন্যাসী বেশে সমাগত হইয়া তিনবার মন্ত্রদ্বয় পাঠ করেন ঃ—

প্রথম—ত্রিশরণ মন্ত্র (বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ইত্যাদি)—দ্বিতীয়; দশশীল মন্ত্র যথা—

১। জীবহত্যা, ২। অপহরণ, ৩। ব্যভিচার, ৪। মিথ্যাকথন, ৫। সুরাপান এই পঞ্চপাপ হইতে নিবৃত্তি—সাধারণ নিষেধ।

৬। অকাল ভোজন, ৭। নৃত্যগীতাদিতে অনুরক্তি, ৮। গন্ধমাল্য প্রভৃতি সেবন, ৯। আরাম শয্যায় শয়ন, ১০। সোণারূপা গ্রহণ এই পঞ্চব্যসন হইতে নিবৃত্তি—ভিক্ষুদিগের প্রতি বিশেষ বিধান।

পরিবাসোত্তীর্ণ যুবকের সঙ্ঘে পূর্ণ প্রবেশ কালে স্বতন্ত্র দীক্ষা বিধি অনুষ্ঠিত হয়; তাহার নাম উপসম্পদ। ভিক্ষু যুবক সঙ্ঘ সমীপে উপনীত হইয়া স্থবিরদের মধ্য হইতে একজন উপাধ্যায় বাছিয়া লন। পরে ভিক্ষা পাত্র তাহার স্কন্ধে সংলগ্ন হয়। তৎপরে উপাধ্যায় ও অপর একজন ভিক্ষু এই দুইজনের মধ্যে দণ্ডায়মান হইলে যুবককে প্রশ্ন করা হয়, তাঁহার নাম কি? তাঁহার উপাধ্যায়ের নাম কি? তিনি ভিক্ষাপাত্র ও বসনত্রয় পাইয়াছেন কি না? তিনি কুষ্ঠ প্রভৃতি মহাব্যাধিগ্রস্ত কি না? তাঁহার বয়স কত? তিনি স্বাধীন কি না? দীক্ষায় তাঁহার অভিভাবকের সম্মতি আছে কি না? এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাইলে পরীক্ষার ফলাফল সঙ্ঘে জানান হয়। পরে যুবক দীক্ষার জন্য তিনবার প্রার্থনা করেন, কাহারও কোন আপত্তি না থাকিলে সঙ্ঘভুক্ত হন। সঙ্ঘের নিয়মাবলী পঠিত হইবার পর তিনি বৈধরূপে গৃহীত হন। দীক্ষার পর আচার্য্যের নিকট ৫ বৎসর অধ্যয়নের নিয়ম আছে। দীক্ষিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নাম ভিক্ষু অথবা শ্রমণ। ইহাদের ব্রত সংযম এবং দারিদ্র্য।

দীক্ষা বিধি সমাপ্ত হইলে দীক্ষিতের কর্ত্তব্যগুলি আচার্য্য উপদেশ করেন—

আহার, ভিক্ষা করিয়া যাহা সংগ্রহ করা যায়।

পরিচ্ছদ, স্বহস্ত-স্যুত চীরপুঞ্জ।

বাসস্থান, অরণ্যের বৃক্ষতল।

ঔষধ, গোমূত্র।

চতুরনুশাসন—

জীব হত্যা করিবেক না।

ব্যভিচার করিবেক না।

চুরি করিবেক না।

আপনাতে দৈবশক্তি আরোপ করিবেক না।

এই শেষ অনুশাসনটী জারী হইবার বোধ হয় বিশেষ কারণ ছিল, কেন না বিনয় পিটকে দেখা যায়, এক সময়ে বৃজী প্রদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তাহাতে একদল ভিক্ষু মহা কষ্টে পড়ে। কেহ কেহ গৃহস্থ ঘরে চাকুরি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিবার প্রস্তাব করিলেন; এক জন ধূর্ত্ত ভিক্ষু এক ফন্দী বাহির করিল, এস আমরা সিদ্ধ যোগী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া পরস্পরকে খুব বাড়াইয়া তুলি, 'এই ভিক্ষু মহা সাধু,'—'ইনি ত্রিবিদ্যা কণ্ঠস্থ করিয়াছেন', 'ইনি সিদ্ধ যোগী'। তাঁহার মতলব সিদ্ধ হইল। গৃহস্থেরা বলিল, এই সকল মহা পুরুষেরা আমাদের মধ্যে বর্ষা যাপন করিতে আসিয়াছেন, আমাদের পরম ভাগ্য বলিতে হইবে। তাহাদের দান ও সেই পরিমাণে ফাঁপিয়া উঠিল, ভিক্ষুরা খাইয়া পরিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিল। এইরূপ ভণ্ডামি নিবারণের জন্য চতুর্থ অনুশাসনটী উপদেশের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে।

সঙ্ঘদলে যেমন প্রবেশ সহজ সঙ্ঘ হইতে নির্গমনও তেমনি সহজ। চৌর্য্য খুণ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ সাব্যস্ত হইলে

ভিক্ষু বহিষ্কার দণ্ড যোগ্য—তাহা ছাড়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সঙ্ঘ ছাড়িয়া যাইবার কোন বাধা নাই। যিনি বলিবেন পিতা মাতার জন্য আমার ভাবনা হইতেছে, স্ত্রী পুত্রের জন্য আমার ভাবনা হইতেছে, আমার পূর্ব্বকার জীবনের জন্য ভাবনা হইতেছে, তিনি সঙ্ঘ ছাড়িয়া সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারেন। হয় একাকী কাহাকেও কিছু না বলিয়া কহিয়া চলিয়া যাইতে পারেন কিম্বা একজন ভিক্ষুকে সাক্ষী মানিয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন, কেহ তাঁহাকে বারণ করিবে না। সঙ্ঘের প্রবেশ দ্বার যেমন মুক্ত, নির্গমনের পথও তেমনি সোজা—কোন দিকে কোন কণ্টক নাই।

ভিক্ষুদের আহার পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক খুঁটিনাটি নিয়ম আছে সে সমস্ত দেখিতে যত কঠোর কার্য্যতঃ তত নয়, অনেক বিষয়ে শৈথিল্য দৃষ্ট হয়, বাঁধাবাঁধির মধ্যেও কতকটা স্বাধীনতা আছে।

আহার।

ভিক্ষুরা একাহারী; দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা পর্য্যটন পূর্ব্বক আহার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বাহ্ণে এক স্থানে একত্রে ভোজন করা ইহাদের নিয়ম। ভিক্ষার সময় কোন কথা কহিবেক না। যদি কেহ ভিক্ষা দান করে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্য দ্বারে গমন করিবে; কিছু না পাইলেও মৌনভাবে পরদ্বারে চলিয়া যাইবে। অনেক সময়, বিশেষতঃ পূর্ণিমার দিনে গৃহস্থ ব্যক্তি ভিক্ষুকদিগকে মধ্যাহ্ণ ভোজনে নিমন্ত্রণ করিত, ভিক্ষুমঠে আহার পাঠাইয়া দিবার ও রীতি ছিল।

পরিচ্ছদ।—

স্বহস্ত-স্যূত চীরপুঞ্জ পরিধান করা নিয়ম কিন্তু কেহ বস্ত্র দান করিলে তাহা গ্রহণ করা নিষেধ নহে। গৈরিক বসনত্রয় ভিক্ষুকের পরিধেয়, অন্তর-বাসক, মধ্য-বসন, আর উত্তরীয়। 'কসায়' (পাপ) হইতে বিমুক্ত না হইলে 'কাষায়' অর্থাৎ গেরুয়া বসনের যোগ্য হয় না। এতদ্ভিন্ন কোন বেশভূষা ব্যবহারের বিধান নাই। মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন ভিক্ষুদলের সন্ন্যাস ব্রতের বাহ্য লক্ষণ।

বাসস্থান।—

বুদ্ধ মনে করিতেন যে নির্জ্জন বনবাস আত্ম-সংযম শিক্ষার প্রকৃষ্ট সাধন কিন্তু বিজন বাস করিতেই হইবে এরূপ কোন নিয়ম প্রচারিত হয় নাই। ভিক্ষুদের দলবদ্ধ হইয়া থাকিবারই রীতি ছিল। তাহারা উদ্যানে, বনে, গ্রাম ও নগরের প্রান্তে যেখানে মন যায় দলে দলে বাস করিত, ক্রমে তাহাদের জন্য মঠ বিহার প্রভৃতি বাসগৃহ প্রস্তুত হইল। গ্রীষ্ম ও শীতের সময় দেশ ভ্রমণ—বর্ষার ৩ মাস একস্থানে স্থির হইয়া বসা, এই—তাহাদের নিয়ম। কিন্তু অরণ্যই যাহাদের প্রশস্ত বাসস্থান তাহারাই ভারতে গৃহনির্ম্মাণ কৌশলের সূত্রপাত করিয়া যায়। ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে স্তূপ চৈত্য বিহারের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় তাহা তাহাদেরই হস্ত-রচনা। গিরি খুদিয়া গুহাশ্রম নির্ম্মাণ করায় যে কি বিপুল পরিশ্রমের ব্যয় তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন। এই সকল গিরিমন্দির কোন কোনটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় খৃষ্টাব্দে বিরচিত; এইরূপ নির্ম্মাণের উৎকৃষ্ট নমুনা পুণা সমীপস্থ কার্লীগুহা খৃষ্টাব্দের প্রথম

শতাব্দে রচিত হয়। হিন্দুদের দেবদেবী মন্দির সে দিনকার রচনা—যেন বৌদ্ধ মন্দিরের দেখাদেখি তাহাদের সুত্রপাত মনে হয় আর যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কঠোর জ্ঞান ও নীতির ধর্ম্ম, যাহাতে ভজন পূজনের বিধি ব্যবস্থা কিছুই নাই, ক্রিয়া কাণ্ডের কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই, আশ্চর্য্য যে তাহারই সেবকেরা প্রকাণ্ড শিলাস্তম্ভ স্তূপ চৈত্য বিহার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের হস্ত-চিহ্ন সকল নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছেন। বিহার ও চৈত্য ব্যতীত বৌদ্ধেরা তাহাদের তীর্থক্ষেত্রে বুদ্ধের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ ঘণ্টাকৃতি স্তূপ সমূহ নির্ম্মাণ করিত, কোন কোন স্তূপ আশ্চর্য্য কারুকার্য্যময় রেলিং বেষ্টিত, এই সকল স্তূপের মধ্যে ভূপালের অন্তর্গত ভিলসা স্তূপ সুপ্রসিদ্ধ। কাশীযাত্রীগণ সারনাথ ক্ষেত্রের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা সেখান-কার স্তূপও দেখিয়া থাকিবেন, তাহা সেই ক্ষেত্র স্মরণ করাইয়া দেয় যেখানে গৌতম তাঁহার ধর্ম্মচক্র প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। এতদ্ভিন্ন গিরিগুহা-নিহিত চৈত্য বিহার প্রভৃতি কোথায় না প্রক্ষিপ্ত ? শতপর্ণী যেখানে প্রথম বৌদ্ধ সভার অধিবেশন হয়, নাসিকের লেনা, কার্লী, অজন্তা, সালসেট দ্বীপস্থিত কাম্হেরীর গুহামন্দির, ভুবনেশ্বরের খণ্ডগিরি উদয়-গিরির গুহাশ্রম, এই সমস্ত চিরস্মরণীয় বৌদ্ধকীর্ত্তি ভারতে প্রকীর্ণ দেখা যায়।

দারিদ্র্য ব্রত।—

দারিদ্র্য ও সংযম বৌদ্ধমণ্ডলীর এই দুই মহাব্রত। সোনা রূপা গ্রহণ করা তাহাদের একেবারেই বারণ, যদি কোন গৃহস্থ দান করেন ভিক্ষু তাহা নিজের জন্য রাখিতে

পারিবেন না। হয় তাহা দাতাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে কিম্বা অন্য কোন গৃহস্থের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে যিনি তাহার বিনিময়ে ঘৃত লবণ তৈল তণ্ডুল প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল দান করিলে, তাহা অপর ভিক্ষুদের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে, নিজের জন্য নয়। সোনা রূপার ব্যবহার লইয়া অতি প্রাচীন কাল হইতে ভিক্ষুদলে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয় এবং বৈশালী সভায় এই বিষয় লইয়া বিষম আন্দোলন হয়। যে সকল ভিক্ষু এই নিয়ম পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন অবশেষে তাহাদেরই পরাভব হইল ও অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত এই নিবৃত্তি ব্যবস্থা ভিক্ষু মণ্ডলীর মধ্যে সুরক্ষিত থাকে। ইহা ছাড়া ভূমি দাস দাসী রাখা অথবা অশ্ব গো মেষাদি পশু পালন করা ভিক্ষুদের নিষেধ। চাস বাস কৃষিকার্য্যও নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়। এক কথায়, ভিক্ষুর পক্ষে দারিদ্র্য ব্রত প্রাণপণে পালন করা বিধেয়। তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি সব মিলিয়া অষ্টবিধ—বসনত্রয়, কটিবন্ধ, ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, সূচি, জীবহত্যা নিবারণোপযোগী জল ছাঁকিবার বাসন। যদিও প্রত্যেক ভিক্ষুর জন্য এই ব্যবস্থা, তথাপি ভিক্ষুসঙ্ঘের কথা স্বতন্ত্র। গ্রন্থ প্রভৃতি অস্থাবর বস্তু ছাড়িয়া দেও, ভূমি বিহার প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তি, সঙ্ঘ তাহারও অধিকারী ছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং সঙ্ঘের জন্য এই সমস্ত উপহার গ্রহণ করিতেন তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রত্যেকে যতই নির্ধন হউন না কেন, অনেকানেক বৌদ্ধক্ষেত্র রাজা ও শ্রীমন্ত গৃহস্থদের প্রসাদে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিল সন্দেহ নাই; ইউরোপের মধ্যযুগের খৃষ্টীয় দেবালয় অপেক্ষা তাহাদের ধনসম্পত্তি অল্প ছিল না।

পূজা।—

আমরা দেখিয়াছি বৌদ্ধধর্ম্ম নীতি প্রধান ধর্ম্ম, তাহাতে বৈদিক হোম যাগ ক্রিয়াকলাপ নাই—যজ্ঞে পশু বলি তাহার অহিংসাধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। ব্রাহ্মণ্যের ভজন পূজনের বিধিব্যবস্থাও তাহাতে নাই। বৌদ্ধদের দেবপূজার পাত্র ও প্রণালী স্বতন্ত্র এবং দেবালয় প্রভৃতি পূজার উপকরণও নাই। ধর্ম্ম সাধনের জন্য আশ্রম চাই তাই দেবমন্দিরের বদলে বৌদ্ধ ক্ষেত্র সাধকমণ্ডলীর বাসোপযোগী চৈত্য বিহারে সমাকীর্ণ। তবে কি বৌদ্ধ শাস্ত্রে পূজার নিয়ম আদতেই নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে আমরা যাহাকে সহজ ভাষায় পূজা বলি—কোন দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া স্তব স্তুতি প্রার্থনা এরূপ সাধনা আদি বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গ নহে। বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশে দেবারাধনার কোন বিধান নাই, এমন কি, বুদ্ধদেব স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে হে ইন্দ্র, হে সোম, হে বরুণ, এইরূপ প্রার্থনার কোন ফল নাই। বৌদ্ধ জগতে স্বয়ং বুদ্ধদেব দেবতার আসনে আসীন ছিলেন। তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন ততকাল তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া ভক্তেরা তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিত এবং তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পর কাল ক্রমে বুদ্ধই দেবাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বুদ্ধ ছাড়া বোধি-সত্ত্ব-কল্পনা বৌদ্ধদের মধ্যে কিরূপে উদয় হইল তাহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। এইক্ষণে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে হিন্দু দেবদেবী আর বৌদ্ধ দেবতা, ইহাদের মধ্যে এক বিষয়ের পার্থক্য আছে। হিন্দু শাস্ত্রের মতে রামকৃষ্ণাদি দেবগণ মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন; বৌদ্ধ মতে

মনুষ্যগণ সাধনাগুণে অর্হৎ, বোধিসত্ত্ব, বুদ্ধ এইরূপে উত্তরোত্তর দেবত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সে যাহা হউক মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধদের মধ্যে আমাদের মত দেবপূজার ব্যবস্থা নাই—ব্রাহ্মণ্যের দেবতার স্থানে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত—তাহাদের লইয়াই বৌদ্ধদের পূজার্চ্চনা।—এই সকল দেবতার মধ্যে বুদ্ধ দেবের সর্ব্বোচ্চ আসন—ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে বুদ্ধের অর্চ্চনা—তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষণ—তীর্থ দর্শন—তাহা ছাড়া তাঁহার উপদিষ্ট ধর্ম্ম পালন—এই সমস্তই পূজার সাধন।

ভাবনা ধ্যান, সমাধি।—

অন্যান্য ধর্ম্মে যেমন দেবারাধনা, স্তুতি প্রার্থনা ভজন পূজনের ব্যবস্থা আছে, বৌদ্ধদের সেইরূপ ভাবনা, ধ্যান ও সমাধি। বিষয় বাসনা হইতে বিরত হইয়া ভিক্ষুদিগকে বিরলে পঞ্চ ভাবনা সাধন করিতে হয়।—মৈত্রী, করুণা, মুদিত, অশুভ ও উপেক্ষা, ভাবনা এই পাঁচ প্রকার।

মৈত্রী—কি দেবতা কি মনুষ্য সকল জীবই সুখী হউক, শত্রুর ও কল্যাণ হউক, সকলেই রোগ শোক পাপ তাপ হইতে মুক্ত হউক এইরূপ শুভ চিন্তাকে মৈত্রী ভাবনা বলে।

করুণা—দুঃখীর দুঃখে সমবেদনা অনুভব করা, জীবের কিসে দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন হয় অহরহ এইরূপ চিন্তা করা করুণা ভাবনা।

মুদিত—ভাগ্যবান্ ব্যক্তির সুখে সুখী হওয়া, তাহাদের সুখ সৌভাগ্য স্থায়ী হউক এই চিন্তা মুদিত ভাবনা।

অশুভ—শরীর ব্যাধিমন্দির, তড়িৎসম ক্ষণস্থায়ী, মরীচিকার ন্যায় অসত্য, এবং মূত্র পূরিষে পরিপূর্ণ ঘৃণিত বস্তু, মানব জীবন

জন্ম মৃত্যুর অধীন, দুঃখময় ও ক্ষণভঙ্গুর, এইরূপ ভাবনাকে অশুভ ভাবনা বলে।

উপেক্ষা—সকল জীবই সমান, কোন প্রাণী অপর প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি বা অধিকতর ঘৃণার আস্পদ নয়; বল দুর্ব্বলতা, দ্বেষ মমতা, ধন দারিদ্র্য, যশ অপযশ, জরা যৌবন, সুন্দর অসুন্দর, সকল গুণ, সকল অবস্থাই সমান—এই সাম্য ভাবনা উপেক্ষা ভাবনা বলিয়া অভিহিত হয়।

ভিক্ষুগণ প্রাতঃসন্ধ্যা বিরলে বসিয়া এই পঞ্চ ভাবনা অভ্যাস করিতেন।

ধ্যান।—

বৌদ্ধমতে ধ্যান পরম পদার্থ। জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে ধ্যান ও সমাধি দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধন একান্ত আবশ্যক। যে সকল বিষয় চিত্তকে সেই মহান্ লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত করে সে সমস্ত দূর করিতে হইবে—"তত্রতত্রাভিনন্দিনী" চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ প্রজাপতির ন্যায় ফুল হইতে ফুলে রমণ করিতে চায় এমন যে চপলা প্রবৃত্তি, তাহা বশীকৃত করিয়া বিষয়াসক্তি হইতে বিরত হইতে হইবে, এইরূপ নির্লিপ্ত ভাবে নির্জনে ধ্যানানন্দ উপভোগ করা ধ্যানের প্রথম সোপান। ধ্যানের এইরূপ উত্তরোত্তর চারিটী সোপান আছে। উচ্চ হইতে উচ্চতর ধাপে উঠিতে হইলে চিত্তকে অধিকতর সংযত করিয়া যে বিষয়টী ভাবিতেছ তাহার সহিত একান্ত তন্ময় হইয়া যাওয়া আবশ্যক। ধর অরূপলোকের ধ্যান করিতেছ— রূপলোকের সমুদায় ভাব, সমুদায় কল্পনা মন হইতে দূর করিতে হইবে, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের

অগোচর অলৌকিক ভাব ও অবস্থায় চিত্তের তন্ময়তা সাধন করিতে হইবে, যেন তুমি এ পৃথিবীর জীব নও, অরূপলোকে বাস করিতেছ। বৌদ্ধমতে কসিন যোগ সাধনা দ্বারা কোন কোন যোগী এই প্রকার অলৌকিক শক্তি-বাহিনী সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ধ্যানবলে ধ্যানের বিষয়ের সহিত যে পরিমাণে তন্ময়ীভাব হইবে সেই পরিমাণে সিদ্ধিলাভ। ধ্যানের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা সেই যাহাতে জীব সুখ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শাশ্বত শান্তিরসে নিমগ্ন হয়েন—যে অবস্থায় ভাব জ্ঞানও নাই, অভাব জ্ঞানও নাই, কেবল স্মরণমাত্র অবশিষ্ট থাকে। চিত্ত শান্তি-সলিলে মগ্ন হয়। এই মহা ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

সমাধি।—

বহির্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মার একাগ্রতা সাধনের নাম সমাধি। পঞ্চভূত অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল একাগ্রচিত্ত হইয়া এই সমস্ত অনিত্য ভাবাদি পুনঃপুনঃ চিন্তা করিবে। করিতে করিতে সেই ভাব মনোমধ্যে নিতান্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। সমাধি ইহার উত্তরীয় অবস্থা। গৌতমবুদ্ধ যে সমগ্র চারি প্রকার ধ্যানের অনুষ্ঠান করেন তাহার দ্বিতীয় ধ্যানটী সমাধিজাত বলিয়া লিখিত আছে। সমাধি দ্বারা ছয় প্রকার অভিজ্ঞা উপার্জন করা যায়; দিব্য দর্শন, দিব্য শ্রবণ, অন্যের মনোভাব পরিজ্ঞাত, পূর্ব্ব জন্ম স্মৃতি রিপুদমন ক্ষমতা, অলৌকিক শক্তি (ঋদ্ধি) অর্জন।

তীর্থদর্শন।—

পূজার অপর অঙ্গ তীর্থ দর্শন, অতি প্রাচীন কাল হইতেই

বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত দেখা যায়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে চারিটী তীর্থ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে—

১। যেখানে বুদ্ধের জন্ম

২। যেখানে তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি

৩। যেখানে তিনি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করেন

৪। যেখানে তাঁহার নির্ব্বাণ

এই সকল স্থান পরিদর্শন মানসে ভিক্ষু ভিক্ষুণী উপাসক উপাসিকা তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন। বুদ্ধদেব বলিয়া গিয়াছেন যিনি এই চতুস্তীর্থ দর্শন করিয়া দেহত্যাগ করেন তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করেন

এই সমস্ত বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র এখন কতক ভগ্ন, কতক ভগ্ন-প্রায়, কতক রূপান্তরিত, কতক বা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কপিলবাস্তু।—

বুদ্ধদেবের জন্মভূমি যে কপিলবাস্তু সে এখন কোথায়? তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাহার ধ্বংস হয়। তিনি নিজে ত রাজ্যত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করিলেন, পরে তাঁহার পুত্র রাহুল ও আত্মীয় স্বজনকে স্বপক্ষে আনিয়া রাজ্যের স্তম্ভসকল শিথিল করিয়া দিলেন—ইহাদের বিয়োগে তাঁহার পিতার যে ভয়ানক কষ্ট হয় তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে; কষ্টের কারণ যথার্থই ছিল। ছিদ্র পাইয়া বাহির হইতে শত্রুদল রাজ্য আক্রমণ করিল। বুদ্ধের নির্ব্বাণের তিন বৎসর পূর্ব্বে কোশলাধিপতি প্রসেনজিতের পুত্র ও উত্তরাধিকারী কপিলবাস্তু ধ্বংস এবং শাক্যবংশ নিপাত করেন। চীন পরিব্রাজকেরা এই

বিখ্যাত নগরীর ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহার চিহ্ন মাত্রও রহিল না। সম্প্রতি বিস্তর অনুসন্ধানের পর প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অশোকের একটি খোদিত স্তম্ভ হইতে কপিলবাস্তুর বাস্তুভূমি নেপাল সমীপে নির্ণয় করিয়াছেন। হুয়েন সাঙের বর্ণনার আধারে ঐ স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়।

বুদ্ধ গয়া।—

এই স্থানে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব পাইয়াছিলেন বলিয়া ইহা বৌদ্ধদের মহাতীর্থ; Jerusalem যেমন খৃষ্টানদের, বৌদ্ধদের পক্ষে ইহাও সেইরূপ। ইহার সঙ্গে বুদ্ধদেবের অশেষ স্মৃতিচিহ্ন জড়িত আছে। অশোক রাজা এইস্থানে এক বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করেন—এই মন্দির মধ্যে মধ্যে ভগ্ন ও নবীকৃত হয়, এইক্ষণে আবার পুন-র্নবীকৃত হইয়া হুয়েন সাঙের বর্ণনানুযায়ী তাহার পূর্ব্বাকার ধারণ করিয়াছে। এইক্ষণে আর সেই বোধিবৃক্ষ নাই যাহার তলে বুদ্ধের বোধনেত্র খুলিয়াছিল। মন্দিরের পিছনে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ এক অশ্বত্থ বৃক্ষ তৃতীয় খৃষ্টাব্দে রোপিত হয় এখন তাহাই আছে। প্রবাদ এই যে মূল বৃক্ষের এক শাখা মহেন্দ্রের ভগিনী সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে লইয়া যান, সেখানে তাহা প্রকাণ্ড অশ্বত্থে পরিণত হইয়াছে। হায়, বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও দশা এইরূপ! জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া পর দেশে তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বুদ্ধ গয়ায় বোধিবৃক্ষ কোথায় কি অবস্থায় ছিল তাহা হুয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়। বৃক্ষের পূর্ব্বভাগে স্বর্ণামলক-চূড় এক বিহার ছিল, তাহার প্রবেশ দ্বারের খোপে একদিকে অবলোকি-তেশ্বর, অন্যদিকে মৈত্রেয়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বৃক্ষের উত্তরে বুদ্ধ

বুদ্ধত্ব পাইবার পর পদব্রজে চলাচল করিতেন। তিনি সাতদিন ধ্যানমগ্ন থাকেন পরে উঠিয়া যেখানে তিনি সাত দিন পায়ে চালি করিয়া বেড়ান; আবার যেখানে তিনি দুই বণিক পুত্র ত্রপুষ ও ভল্লিকের হস্ত হইতে উপোষণান্তে দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন, এই সকল স্থান ও অন্যান্য অনেক বিষয় হুয়েন সাং তাঁহার গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে এপুষ এবং ভল্লিক বুদ্ধের দুই প্রথম গৃহস্থ শিষ্যরূপে তাঁহার 'ধর্ম্মে' দীক্ষিত হন—'সঙ্ঘ' তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বুদ্ধ গয়ায় বুদ্ধের এইরূপ কত কত কীর্ত্তি-চিহ্ন রহিয়াছে তাহার অন্ত নাই।

সারনাথ।—

কাশী সমীপস্থ বৌদ্ধতীর্থ; এই স্থান হইতে বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মচক্র প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। সরনাথ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটী প্রধান স্থান ছিল। বুদ্ধ বর্ত্তমান থাকিতেই সারনাথ বিহার প্রস্তুত হয়। তথায় বৌদ্ধদের অনেক দেবালয় ও দেব-মূর্ত্তি এবং একটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ছিল। এই সারনাথ একে-বারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার চারিদিকে এরূপ প্রভূত ভস্মরাশি বিদ্যমান আছে যে, দেখিয়া বোধ হয় বৌদ্ধদ্বেষী শত্রুপক্ষীয়েরা সমুদায় ভস্মীভূত করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে অশোকের সময়ে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হয়। এখন যে স্তূপ রহিয়াছে তাহা হয়েন সাং দেখিয়াছিলেন। এই স্তূপের অনতিদূরে কনিঙ্ঘাম সাহেব একটী প্রস্তর খণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, কাশীতে উপদেশ ও নির্ব্বাণ, এই চারি ঘটনাসম্বন্ধীয় প্রতিমূর্ত্তি সকল খোদিত আছে।

রাজগৃহ।— যে বিম্বিসারের রাজধানী। বুদ্ধ কপিলবাস্তু হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া এখানে দুইজন ব্রাহ্মণ আলাড় কালাম এবং উদ্রকের নিকট প্রথমে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করেন।—যদিও তাহাদের প্রদর্শিত পথ তাঁহার মনোনীত হয় নাই তথাপি তাহাদের শিক্ষা ও উপদেশ একেবারেই নিরর্থক হইয়াছিল বলা যায় না, সে শিক্ষার ফল ভবিষ্যতে তাঁহার নিজের উপদেশে ফলিত দেখা যায়। রাজগৃহের বেণুবন ও গৃধ্রকূট পর্ব্বত বুদ্ধদেবের প্রিয় আবাসস্থান ছিল। বুদ্ধের জীবনী সংক্রান্ত আরও অনেক ঘটনা এই স্থানে সংঘটিত হয়। সারীপুত্র ও মুদ্গলায়ন গৌতমের দুই প্রধান শিষ্যের অশ্বজিতের সঙ্গে এখানেই প্রথম আলাপ পরিচয়। গুরুর বিরুদ্ধে দেবদত্তের ষড়চক্রের ও এই স্থান। ইহার নিকটেই সপ্তপর্ণী গুহা, যেখানে বৌদ্ধ সভার প্রথম অধিবেশন হয়। বুদ্ধের শেষ বয়সে যখন তিনি জেতবনের বিহার হইতে রাজগৃহের গৃধ্রকূটে ফিরিয়া যান তখন রাজা অজাতশত্রু বৃজি জাতীয় লোকদিগকে আক্রমণের পন্থা দেখিতেছিলেন। ঐ জাতি গঙ্গার উত্তর পাড় মগধের সামনে বাস করিত। অনায়াসে বৃজি জাতির সমুচ্ছেদ সাধন করিতে পারিবেন কি না, তাহা জানিবার জন্য অজাতশত্রু স্বীয় অমাত্য বর্ষকারকে বুদ্ধদেবের নিকট প্রেরণ করেন। গৌতম বলিয়াছিলেন যতদিন বৃজিগণ পরস্পর ঐক্য বন্ধনে বদ্ধ থাকিবে, যতদিন উহারা মিলিত হইয়া কার্য্য করিবে, স্বধর্ম্ম পালনে রত থাকিবে, যতদিন উহাদের মধ্যে কুলস্ত্রী ও কুলকুমারীগণ পূজিত হইবেন, যতদিন উহারা অর্হৎগণের রক্ষা ও পালন

বুদ্ধবৃ, ততদিন বৃজি জাতির স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে না। এ প্রসঙ্গে তাঁহার ভিক্ষু সঙ্ঘ যাহাতে ধর্ম্মের আশ্রয়ে ঐক্যসূত্রে মিলিত হয়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটন না হয় তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন।

পাটলী পুত্র।—

গুরুজী গঙ্গাপার হইবার সময় দেখিলেন—অজাতশত্রু পাটলীপুত্রের ঠিকানায় বৃজিদের আক্রমণ নিরোধ উদ্দেশে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন। সেই সময়ে তিনি পাটলী-পুত্রের ভাবি গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির কথায় সকলকে আশ্বাসিত করিয়া তাহার ভাবি দুর্গতির কারণ ও নির্দ্দেশ করিলেন। "নগরের তিন শত্রু, অগ্নি, জল ও গৃহ-বিচ্ছেদ।" এই ভবিষ্য-দ্বাণীতে প্রীত হইয়া যে দ্বার দিয়া গৌতম গঙ্গাবতরণ করেন নগরাধ্যক্ষ তাহার নাম 'গৌতম-দ্বার' রাখিবার আদেশ করি-লেন। রাজগৃহের পর পাটলীপুত্রই মগধের রাজধানী হইল—অশোকের রাজধানী তাহাই। এই নগরীর আধুনিক নাম পাটনা।

শ্রাবস্তী।—

রাজগৃহে দ্বিতীয় বর্ষা যাপন করিয়া বণিক অনাথপিণ্ডি-কের আমন্ত্রণে বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী গমন করেন। ইহা কাশীর উত্তর পশ্চিম রাপ্তী নদীতীরস্থিত। গৌতমের সময় ইহা কোশল-রাজ প্রসেনজিতের রাজধানী ছিল। শ্রাবস্তীর জেত-বন উদ্যান অনাথপিণ্ডিকের বহুমূল্য দান; যত স্বর্ণ-মুদ্রা সেই ভূমি খণ্ডের উপর বিছাইয়া ঢাকিয়া দেওয়া যায় বণিক তাহা তত মুদ্রায় ক্রয় করিয়া বৌদ্ধ সঙ্ঘে উপহার দেন। জেতবন

বুদ্ধদেবের সাধের আশ্রম ছিল; সেখান হইতে তিনি যে সকল উপদেশ দেন তাহা বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রখ্যাত। জেতবনে যে বিহার নির্ম্মিত হয় হুয়েন সাং তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া যান। ফাহিয়ান বলেন শ্রাবস্তীতে প্রসেনজিৎ বুদ্ধের চন্দন কাষ্ঠের এক বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। ওখানকার এক মন্দির খনন করিতে করিতে বুদ্ধের এক বড় প্রস্তর মূর্ত্তি পাওয়া যায় কিন্তু কাষ্ঠ মূর্ত্তির কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই।

বৈশালী।—

বৈশালীতেও বুদ্ধদেব অনেক উপদেশ দেন। কুশীনগর যাত্রাকালে এখানে অম্বপালীর উদ্যানে তিনি শেষবারের মত বিশ্রাম করেন। বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহের ভস্মাবশেষের উপর লিচ্ছবীরা এই স্থানে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করে।

কৌশাম্বী।—

আলাহাবাদ হইতে ১৫ ক্রোশ দূর। ইহা এক প্রাচীন নগরী, রামায়ণেও ইহার উল্লেখ আছে। ইহা সেই রাজা উদয়নের স্থান যাহার নাম মেঘদূতের এক শ্লোকে কীর্ত্তিত আছে।

'উদয়ন কথা কোবিদ গ্রাম বৃদ্ধান্'

রত্নাবলী নাটকের রঙ্গভূমি ও এই। বুদ্ধ এখানে অনেক সময় আসিয়া উপদেশ দিতেন। কথিত আছে বুদ্ধের এক চন্দন কাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি শ্রাবস্তীতে যেমন, এখানে তেমনি গঠিত হয়। এটি বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে স্থপতি ইহা নির্ম্মাণ করে তাহাকে এয়স্ত্রিংশ স্বর্গে পাঠান' হয়, সেখানে গিয়া সে বুদ্ধদেবের দর্শন পায়, তথায় তিনি তাঁহার মাতা মায়াদেবীকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন।

নালন্দ।—

নালন্দ বিহার বৌদ্ধদের একটী অত্যুৎকৃষ্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়। ইহার আধুনিক স্থান বারাগাঁও, বুদ্ধগয়া হইতে ৪০ মাইল দূর। হুয়েন সাং বলেন বুদ্ধ এখানে ৩ মাস অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মোপদেশ করেন। হুয়েন সাং নিজে এই বিহারে ৫ বৎসর কাল থাকিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিলাদিত্যের রাজত্ব কালে নালন্দ-বিহার পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত ছিল। রাজকোষ হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। হুয়েন সাঙের বর্ণনা এই "ছয়টী ভিন্ন ভিন্ন বিহারে প্রায় ১০,০০০ ভিক্ষু অধ্যয়নে নিযুক্ত— বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অষ্টাদশ শাখা এখানে একত্রিত। এখানকার ছাত্রেরা সকলেই প্রখর-বুদ্ধি, সুপণ্ডিত ও পবিত্র চরিত্র। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মালাপ, দূর দূর হইতে মহা মহা পণ্ডিত তাঁহাদের ধর্ম্মবিষয়ক সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আসিয়া থাকেন। ত্রিপিটক যাহাদের কণ্ঠস্থ নাই তাহারা লজ্জায় মুখ হেঁট করিয়া থাকে। নালন্দ ছাত্রদের পাণ্ডিত্যের এমনি খ্যাতি যে অনেকানেক ভণ্ড তপস্বী তাহাদের উপাধি ধারণ করিয়া পাণ্ডিত্য ভান করিয়া বেড়ান।"

কুশীনগর।—

এই স্থানে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। চীন পরিব্রাজকেরা এখানকার ভগ্নাবস্থা দেখিয়া যান। এই প্রসঙ্গে হুয়েন সাং বলেন বুদ্ধের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া কাশ্যপ কুশীনগর যাত্রা করিতেছেন এমন সময় কতকগুলি ভিক্ষু আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল "তথাগত গেলেন বাঁচা গেল! আমরা কেহ কোন দোষ করিলে এখন কে আমাদের শাসন করিবেন?"

এই কথা শুনিয়া কাশ্যপ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলকে ডাকিয়া বলিলেন "আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। যে সকল ভিক্ষু বুদ্ধের বিধান সমুদয় ভালরূপ জানেন—যাঁরা নিজে সেই ধর্ম্মে অনুরক্ত—যাঁহারা অধীত ও সুবিচারী তাঁহারা সভা করুন, অপ্রবীন নূতন শিষ্যেরা চলিয়া যান"

ইহা শুনিয়া অনেকে চলিয়া গেল—১০০০ লোক অবশিষ্ট রহিলেন—তাঁহাদের মধ্যে আনন্দ একজন। কাশ্যপ আনন্দকে ও গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "তোমাকে সম্পূর্ণ দোষশূন্য বলিতে পারি না। তুমিও এ সভার যোগ্য নও। তুমি বুদ্ধের পার্শ্ব-সহচর প্রিয় শিষ্য ছিলে—তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতে ও ভাল বাসিতে, তুমি এখনো সম্পূর্ণ আসক্তি বিহীন হইতে পার নাই এই আমার ধারণা।"

আনন্দ নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া যোগ সাধন দ্বারা অর্হৎ-সিদ্ধি লাভ করিলেন। পরে যখন তিনি সভাস্থলে ফিরিয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কাশ্যপ তাঁহাকে বলিলেন "তুমি আসক্তি শূন্য হইয়াছ তাহার প্রমাণ দেখাও। তুমি সূক্ষ্ম শরীরে এই রুদ্ধ দ্বার দিয়া সভায় প্রবেশ করিতে পারিলে বুঝা যাইবে।" আনন্দ তখনি দ্বারের ছিদ্র হইতে সূক্ষ্ম শরীরে প্রবেশ করিলেন ও উপস্থিত স্থবিরদিগকে প্রণাম করত সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

এই ত ভারতের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ তীর্থের কথা বলা হইল। ইহা ছাড়া সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চীন, তিব্বত

প্রভৃতি দেশে বুদ্ধের স্মরণ চিহ্ন সকল বিক্ষিপ্ত—এই স্থলে তাহাদের বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই।

প্রায়শ্চিত্ত বিধান।—

খৃষ্টীয় ক্যাথলিকদের মধ্যে গুরু সন্নিধানে আত্মপাপ স্বীকার করিবার যে একটী রীতি আছে, বৌদ্ধ সমাজে তাহার অনুরূপ একটী প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক ভিক্ষুকে প্রতিমাসে দুইবার অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিবসে উপবাস পর্ব্বে প্রতিমোক্ষের বিধানানুসারে সঙ্ঘ সন্নিধানে আত্মপাপ অঙ্গীকার করিয়া প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হইত। দর্শ পূর্ণমাসী বৈদিক বিধির অনুকরণে সম্ভবতঃ বৌদ্ধদের মধ্যে এই পাক্ষিক পর্ব্ব প্রবর্ত্তিত হয়। যেথানে এই পাক্ষিক সভার অধিবেশন হইত সেখানে সেই ভাগের যত ভিক্ষুদল সকলকেই উপস্থিত হইতে হইত। ভিক্ষু সঙ্ঘ সমবেত হইলে পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত বিধানের মন্ত্র পাঠ হইতে সভার কার্য্য আরম্ভ হইত।

"ভিক্ষুদের মধ্যে যিনি যে কোন পাপ করিয়াছেন তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করুন। যদি কোন দোষ না করিয়া থাকেন চুপ করিয়া থাকুন; যিনি মৌন থাকিবেন ধরা যাইবে তিনি নিরপরাধী। যিনি পাপ করিয়া জানিয়া শুনিয়া অস্বীকার করেন তিনি মিথ্যাবাদী। ভগবান বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন মিথ্যাই বিনা-শের মূল। অতএব যদি কোন ভিক্ষু কোন বিষয়ে অপরাধ করিয়া থাকেন ও তাহা হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা করেন তিনি তাহা প্রকাশ্যে অঙ্গীকার করুন; অনুতাপে পাপভার লঘু হইয়া যায়।"

প্রতিমোক্ষ নামক গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্ত বিধান গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। কথিত আছে যে বুদ্ধদেব প্রথম কাশী হইতে রাজ-

গৃহে প্রবাস কালে এই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান বিধিবদ্ধ করেন। ভিক্ষু সঙ্ঘের পাক্ষিক অধিবেশনে এই প্রতিমোক্ষের নিয়ম সকলের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যান হইত। (কোন্ অপরাধের কি দণ্ড, প্রায়শ্চিত্তই বা কিরূপ, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইত। অপরাধ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। * নরহত্যা ব্যভিচার প্রভৃতি কতকগুলি গুরুপাপের দণ্ড সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কার। অপেক্ষাকৃত লঘুতর পাপ যথা, দূষিতভাবে রমণীর অঙ্গ স্পর্শ, কোন ভিক্ষুর প্রতি অন্যায় ব্যবহার তাহার বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। পরে আহার বিহার পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অনিয়ম, মিথ্যা কথা, অতি-লোভ, পরনিন্দা, ভিক্ষুণীর সঙ্গে একাকী ভ্রমণ। এই সমস্ত ছোটখাট দোষ 'ডুক্কত' (দুষ্কৃত) বলিয়া গণ্য, অনুতপ্ত হৃদয়ে অঙ্গীকারেই ইহাদের খণ্ডন। এই সকল ছোটখাট দুষ্কৃতের স্বরূপ ও বিধান দেখিলে জানা যায় ভিক্ষু সঙ্ঘ কি কঠোর ধর্ম্ম শাসনে নিয়ন্ত্রিত ছিল! কোন কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইলে তাহার কি মাপ হইবে, ছাতা দর্পণ ব্যবহার্য্য কি না, দান্তনের মাপ কি, ভিক্ষা পাত্র কিরূপ, বসিবার আসন কতবৎসর চালাইতে হইবে— হাঁচিলে 'দীর্ঘজীবি হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করা বিধেয় কিনা— কি উপায়ে 'আরাম' বিহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, কিরূপে স্নান আহার করিবে—ওঠা বসা ভোজন শয়ন নিদ্রা, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের জন্য বুদ্ধদেব নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন।) বুদ্ধের

---

* অপরাধের শ্রেণী বিভাগ।

পারাজিক, সঙ্ঘাদিশেষ, থুল্লচ্চয়, পাচিত্তীয়, শেখীয়, প্রতিদেশনীয়, দুষ্কৃত, দুর্ভাষিত ইত্যাদি।

উপদেশ কোন্ ভাষায় প্রচারিত হওয়া উচিত এই লইয়া অনেক সময় কথা উঠিত। একবার দুই জন ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবের নিকট প্রস্তাব করিলেন, "প্রভু আপনার উপদেশ চলিত ভাষায় লোকের মুখে মুখে অশুদ্ধ ও নষ্ট হইয়া যায়, আমাদের ইচ্ছা বুদ্ধের উপদেশগুলি সংস্কৃত ছন্দে রচিত হইয়া প্রচারিত হয়।" বুদ্ধ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন, "এরূপ হইলে ধর্ম্মপ্রচারের সাহায্য হইবে না বরং তাহার উল্টা হইবে। লোকেদের অবোধ্য দুরূহ ভাষায় ধর্ম্ম-প্রচারের ব্যাঘাত জন্মিবে। ভিক্ষুগণ! তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ মাতৃ-ভাষায় বুদ্ধ-বচন গ্রহণ কর এই আমার উপদেশ।" (চুল্লবগ্‌গ)

এই সমস্ত নিয়মাবলীর পাঠ ও আবৃত্তি সমাপ্ত হইলে পাঠক নিবেদন করেন "ভগবান বুদ্ধের বিধানানুসারে পাঠাবৃত্তি সমাপ্ত হইল, তোমরা সকলে শান্ত সমাহিত চিত্তে, সদ্ভাবে নির্ব্বিবাদে ইহার মর্ম্ম গ্রহণ কর।"

পঞ্চায়ৎ।—

কিন্তু এই সদুপদেশ সত্ত্বেও সঙ্ঘে অনেক সময় বাদানুবাদ ও মতভেদ উপস্থিত হইত; চুল্লবগ্‌গে এই সমস্ত বিবাদভঞ্জনের অনেক প্রকার নিয়ম পরিকল্পিত দেখা যায়। তাহার মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য পঞ্চায়তের ব্যবস্থা উল্লেখ যোগ্য। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া পঞ্চায়তে সমর্পিত হইলে অধিকাংশ লোকের মতে তাহার নিষ্পত্তি হইত। যে সকল ভিক্ষু পঞ্চায়তে নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক। অপক্ষপাতী, রাগ দ্বেষ ভয় শূন্য, বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুরাই এই পঞ্চায়তে বিচার করিতেন।

মত গ্রহণের তিন প্রকার রীতি ছিল—গুপ্ত, অপ্রকাশ্য, প্রকাশ্য। যথন নিসংশয়ে জানা যায় যে কোন একটী বিষয় সাধারণ মতে ধর্ম্ম নিয়মের অনুবর্ত্তী তথন আর গুপ্তমত গ্রহণের আবশ্যক নাই, প্রকাশ্য ভাবে গ্রহণ করিলেই হইল। তর্ক বা সন্দেহ স্থলে মত-গ্রাহক ভিক্ষু দুই রঙ্গের টিকিট প্রস্তুত করিবেন ও যিনি মত দিতে আসিবেন তাঁহাকে বলিবেন 'এই মতের লোকের জন্য এই টিকিট; অন্য মতের লোকের জন্য এই অন্য টিকিট; যেটা ইচ্ছা গ্রহণ কর। অন্য কাহাকেও দেখাইও না।" বিজ্ঞাপক যদি বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করেন যে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ পক্ষের মত বলবত্তর তাহা হইলে সে মত অগ্রাহ্য করিবেন। আর ধর্ম্মের অনুযায়ী স্থির হইলে সে মত গ্রাহ্য করিবেন। মত গ্রহণের এই গুপ্তরীতি (ব্যালট)। অপ্রকাশ্য রীতি হচ্ছে ভিক্ষুর কানে কানে বলা, "এই টিকিট এই মতের পোষক, এই অন্য টিকিট অন্য মতের পোষক—যেটা ইচ্ছা গ্রহণ কর। তুমি কোন্ মতে মত দিবে আর কাহাকেও বলিও না।" বিজ্ঞাপক যদি বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করেন যে ধর্ম্ম বিরোধী মত বলবত্তর তাহা হইলে সে মত অগ্রাহ্য করিবেন; অধিকাংশের মত ধর্ম্মের অনুযায়ী স্থির জানিলে সে মত গ্রাহ্য করিবেন। অপ্রকাশ্য ভাবে মত গ্রহণের এই নিয়ম। (চুল্লবগ্‌গ)

বর্ষার ৩ মাস ভিক্ষুদের সম্মিলন ও উৎসবের সময় বিহার ও অন্যান্য আশ্রমে তাঁহারা এই উৎসবের মাসত্রয় যাপন করিতেন; তথন ধর্ম্মালাপ, শাস্ত্রালোচনা, আবৃত্তি প্রভৃতির ধূম লাগিয়া যাইত। শ্রাবকেরা দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়া বুদ্ধের জাতক উপাখ্যান শ্রবণের পুণ্যার্জন করিতেন এবং সকলে

সদ্ভাবে মিলিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিতেন। আমার স্মরণ আছে যখন বোম্বায়ে আমার সর্ভিসের প্রথম ভাগে আহ-মদাবাদে কর্ম্ম করিতাম তখন অনেক সময় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐরূপ বর্ষার উৎসবে উপস্থিত হইতাম। উহা জৈনোৎসব, বৌদ্ধদের উৎসব নহে কিন্তু অনেক বিষয়ে এই উভয়ের সাদৃশ্য আছে। আহমদাবাদ ও অঞ্চলের জৈন সম্প্রদায়ের প্রধান স্থান। চাতুর্মাস্য যাপন, ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণ, উপবাস ব্রত ধারণ প্রভৃতি বৌদ্ধ রীতি অনুসারে জৈনদের মধ্যেও বর্ষার উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইত।

বর্ষোৎসবের শেষে এবং প্রব্রজনের আরম্ভে বৌদ্ধদের এক বার্ষিক সভা হইত, তাহার নাম 'প্রবারণ' অর্থাৎ আমন্ত্রণ। এই আমন্ত্রণে ভিক্ষুদল মিলিত হইলে উল্লিখিত প্রকার পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক কথাবার্ত্তা চলিত। যিনি প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থী তিনি ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—

"হে ভিক্ষুগণ! আমার বিরুদ্ধে যদি আপনারা কেহ কিছু দেখিয়া থাকেন, শুনিয়া থাকেন, আমার চরিত্র বিষয়ে কাহারো কোন সন্দেহ থাকে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। যদি সত্য হয় আমি তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।"

"ক্রমশঃ গৃহী লোকের মধ্যে ও এই প্রথা প্রচলিত হয় কিন্তু তাহার অসুবিধা সংঘটন প্রযুক্ত অশোক রাজা পাপের প্রায়-শ্চিত্ত সাধনার্থ একটী মহোৎসব প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে প্রথম আত্মদোষ স্বীকার ও সঙ্গে সঙ্গে দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান উভয়ই প্রচলিত ছিল। ঐ দানোৎসবটি ৫ বৎসর অন্তর সম্পন্ন হইত। খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে প্রয়াগক্ষেত্রে একবার ঐ

উৎসবের অনুষ্ঠান হয়; চীন দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন সাং তাহা দর্শন করিয়া যান। তাহার বর্ণনা এইরূপ আছে :—

"ঐ সুবিস্তৃত উৎসব ক্ষেত্র একটী আনন্দক্ষেত্র ছিল, চারিদিকে সহস্র সহস্র গোলাপ গাছের সুরম্য বৃতি, তাহাতে অপর্য্যাপ্ত মনোহর পুষ্পশ্রেণী অহরহ প্রস্ফুটিত এবং মধ্যস্থলে স্বর্ণ রজত পট্টবস্ত্র ও অপরাপর বহুমূল্য দান দ্রব্যে পরিপূর্ণ সুসজ্জ গৃহশ্রেণী। তাহার সমীপে সারী সারী একশত এরূপ ভোজন-গৃহ ছিল যে তাহার প্রত্যেক গৃহে শত ব্যক্তি ভোজন করিতে পারিত। শিলাদিত্য (হর্ষবর্দ্ধন) তখন ঐ অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অথচ তাঁহার রাজ্যে ব্রাহ্মণ্যের প্রতিপত্তি ও সামান্য নহে। শিলাদিত্যের আহ্বান ক্রমে বিংশতি রাজ্যের রাজারা ব্রাহ্মণ শ্রমণ সৈন্য সামন্ত সহ পঞ্চাশ সহস্র লোক সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করেন। সার্দ্ধ দুই মাস ব্যাপিয়া দান ভোজনাদি সহকারে ঐ উৎসব ব্যাপার সম্পন্ন হয়। এই ধর্ম্ম-মহামণ্ডলীর পশ্চিমে এক বৃহৎ সঙ্ঘারাম ও পূর্ব্বে ৬০ হস্ত উচ্চ এক স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। মধ্য ভাগে বুদ্ধের স্বর্ণ মূর্ত্তি মনুষ্যাকৃতি প্রমাণ স্থাপিত। বুদ্ধ, সবিতা ও শিব এই তিনেরই প্রতিমূর্ত্তি একে একে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ সমস্ত সমাগত ব্যক্তিদিগকে বহুমূল্য সামগ্রী দান করা এবং চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ সুস্বাদ সামগ্রী ভোজন করান' হয়। বুদ্ধের এক ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি এক সুসজ্জিত গজপৃষ্ঠে স্থাপিত, শিলাদিত্য ইন্দ্রবেশে বামপার্শ্বে এবং কামরূপের রাজা দক্ষিণে, ৫০০ রণহস্তী প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। শিলাদিত্য চতুঃপার্শ্বে মুক্তা রজত কাঞ্চন

ও অন্যান্য বহুমূল্য জিনিস ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছেন। বুদ্ধ মূর্ত্তি ধৌত হইলে শিলাদিত্য তাহা নিজ স্কন্ধে উঠাইয়া পশ্চিম স্তম্ভে লইয়া যান ও তদুপরি বহুমূল্য বেশভূষা স্থাপন করেন। ভোজনের পর ব্রাহ্মণ শ্রমণ মিলিয়া একত্রে ধর্ম্ম চর্চ্চা ও বাদানুবাদ হয়। এদিকে ব্রাহ্মণ শ্রমণে বাক্‌যুদ্ধ, অন্যদিকে মহাযানী হীনযানীদের মধ্যে ও ঘোর তর্ক বিতর্ক বাধিয়া যায়। এই উৎসবে রাজা স্বীয় রাজকোষ নিঃশেষিত করিয়া প্রায় সমস্ত ধনই বিতরণ করিতেন। এমন কি, তাঁহার নিজের পরিচ্ছদ, কর্ণকুণ্ডল, রত্নমালা প্রভৃতি বেশভূষা সমুদয় ও দেহ হইতে উন্মোচন করিয়া দিতেন।" * অবশেষে পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দীন বেশে বুদ্ধদেবের মহাভিনিষ্ক্রমণ অভিনয় করিতেন।

হিউয়েন সাং বলেন যে উৎসবের শেষে স্তম্ভে আগুণ লাগিয়া যায়; তাঁহার বিশ্বাস এই যে রাজা শিলাদিত্যের বৌদ্ধধর্ম্মে শ্রদ্ধা দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা ঈর্ষাবশে এই অঘোর কৃত্য ঘটাইয়া দেন এবং রাজহত্যার ও চেষ্টায় ফেরেন—ভাগ্যক্রমে সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

ভিক্ষুণী সঙ্ঘ (বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী)

বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রথম পত্তন কালে তাহা কেবল ভিক্ষুদলে পরিপুষ্ট হয়। প্রথমে স্ত্রীলোকের সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার ছিল না। বুদ্ধদেব যিনি মানব প্রকৃতির দুর্ব্বলতা সম্যক্ অবগত ছিলেন, যিনি সংযম দ্বারা কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি ষড়রিপুর

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ। অক্ষয় কুমার দত্ত।

উপর জয়লাভের উপদেশ প্রদান করিতেন তিনি যে সঙ্ঘ-গণ্ডীর ভিতর রমণীর প্রবেশে বীতরাগ হইবেন তাহাতে বিচিত্র কি ? স্ত্রী জাতিকে সন্ন্যাসী দলে মিশিতে দিলে তাহার অশুভ পরিণাম হইবে ইহা তাঁহার বিলক্ষণ আশঙ্কা ছিল। যখন বুদ্ধদেবের নিকট আনন্দ প্রথমে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তখন বুদ্ধ বলিলেন, "স্ত্রীলোকেরা যদি গৃহত্যাগিনী হইয়া সন্ন্যাসিনী না হয় তাহা হইলে এই ধর্ম্ম সহস্র বৎসর অব্যাহত থাকিবে আর তাহাদের বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দিলে এ ধর্ম্মের পবিত্রতা শীঘ্রই নষ্ট হইবে, অল্পকালের মধ্যে সত্য ধর্ম্ম লোপ হইবে"। বৌদ্ধ সঙ্ঘে স্ত্রী জাতির প্রবেশাধিকার সহজে অর্জিত হয় নাই ; অনেক সাধ্য সাধনার পর বুদ্ধদেব রমণীগণকে ভিক্ষুদলে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন এবং স্বীয় ধাত্রী মহাপ্রজাপতিকে তাঁহার প্রথম স্ত্রী-শিষ্য রূপে বরণ করেন।

স্ত্রী সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবার জন্য আট ঘাট যতই বাঁধিয়া রাখা যায়, ফলে তাহাদের সংঘর্ষ এড়াইবার উপায় নাই। ভিক্ষায় বাহির হইয়া দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন কর অথবা গৃহস্থের গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণে যাও, হে ভিক্ষু! রমণী সমাগম হইতে তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই। তুমি চাও আর না চাও, তাহাদের দয়া মায়া তোমাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে। বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতে যখন অবরোধ প্রথা তেমন কঠোর ভাবে প্রচলিত ছিল না, লোক সমাজে স্ত্রীলোকের ও মেলা মেশা ছিল, যখন জাতীয় উদ্যমে স্ত্রীলোকেরা ও যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না তখনকার ত কথাই নাই। রমণীর সুন্দর ছবি আমরা প্রথম হইতেই বৌদ্ধ সমাজে চিত্রিত দেখিতে পাই।

বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বেই সুজাতার বৃত্তান্ত দেখ। বুদ্ধদেব যখন ৬ বৎসর ধরিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন তখন কে তাঁহাকে অন্নদানে সজীব করিল? সুজাতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমার একটী শিশু সন্তান হইলে বন দেবতার নিকট পূজা দিব। বুদ্ধ তখন উরুবেলার বনে তপস্যা করিতেছিলেন, সুজাতা তাঁহার সম্মুখে ভেট লইয়া আসিলেন। বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "বাছা, কি আনিয়াছ?"

সুজাতা কহিল "ভগবন্ সদ্যঃ প্রসূত শত গাভী দুগ্ধে ৫০টী গাভী পোষণ করিয়াছি, তাহাদের দুগ্ধে ২৫, তাহাদের দুগ্ধে আবার বারটী গাভী পুষ্ট; এই দ্বাদশ গাভীর দুগ্ধ পান করাইয়া আমার পালের মধ্যে ভাল ভাল ৬টী গরু বাছিয়া তাহাদের দুধ দুহিয়া লই—সেই দুগ্ধ সুগন্ধি মসলায় উৎকৃষ্ট তণ্ডুলে পাক করিয়া আনিয়াছি। আমার ব্রত এই যে দেবতার অনুগ্রহে আমার একটী সন্তান জন্মিলে এই অন্নদানে দেবার্চ্চনা করিব—প্রভো! এখন সেই পরমান্ন লইয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি, প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ কর।"

বুদ্ধ সুজাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন "তুমি যেমন তোমার ব্রত পালন করিয়া সুখী হইয়াছ আমি ও যেন সেইরূপ আমার জীবন-ব্রত সাধন করিতে সমর্থ হই।" এই দুগ্ধ পানে তিনি শরীরে বল পাইয়া সেই স্থান-হইতে বোধি বৃক্ষতলে গিয়া ধ্যান মগ্ন হইলেন; সেই ধ্যানে তিনি সত্যালোক দর্শন করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

Light of Asia

EDWIN ARNOLD.

অম্বপালী গণিকা।—

বুদ্ধদেব যখন বৈশালীতে অম্বপালী গণিকার আম্রবনে বিশ্রাম করিতেছিলেন এমন সময় অম্বপালী তাঁর দর্শনার্থ আগমন করিল। তাহার বেশভূষা সামান্য অথচ সুন্দর মোহন মূর্ত্তি! তাহাকে দেখিয়া বুদ্ধের ও ক্ষণভর তাক লাগিয়া গেল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন "স্ত্রীলোকটী কি পরমাসুন্দরী! রাজ পুরুষেরা ও ইহার রূপ লাবণ্যে মোহিত ও বশীকৃত অথচ এ কেমন সুধীর শান্ত, সচরাচার স্ত্রীলোকের ন্যায় যৌবন-মদ-মত্ত চপল স্বভাব নহে। জগতে এরূপ নারী-রত্ন দুর্লভ।" অম্বপালী বুদ্ধের পার্শ্বে আসিয়া বসিল। বুদ্ধদেব তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাহার চিত্তচাঞ্চল্য দূর ও বাসনার মূলোচ্ছেদ করিলেন। তাহার মন বিগলিত হইল, ধর্ম্মে তাহার মতি স্থির হইল। গণিকা বুদ্ধের শরণার্থী হইয়া তাঁহাকে কহিল—"প্রভু কল্য ভ্রাতৃমণ্ডলী সহ আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া আহারাদি করিলে আমি অনুগৃহীত হইব।" বুদ্ধদেব মৌনভাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

এই সময় লিচ্ছবি নাগরিক যুবকেরা রথারোহণ পূর্ব্বক সেই আম্রবনে উপনীত হইল। তাহারা কেহ শুভ্র, কেহ রঙ্গীন বেশে, নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত। বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে তাহাদের দেখাইয়া কহিলেন, দেখ ইহাদের কেমন সাজ সজ্জা, ঠিক যেন দেবতারা ভূতলে ক্রীড়া কাননে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা আসিয়া বুদ্ধকে পুনর্ব্বার ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন কিন্তু তিনি পূর্ব্বেই গণিকার নিকট প্রতিশ্রুত বলিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা চা'ন অম্বপালী

তার আমন্ত্রণ বাক্য প্রত্যাহার করে—তাহাকে হাত করিবার জন্য কত সাধ্য সাধনা, কাকুতি মিনতি করিলেন, কত ধন-লোভ দেখাইলেন কিন্তু কিছুতেই সে সম্মত হইল না। বলিল—তোমরা সমস্ত বৈশালী—নগর উপনগর সর্ব্ব শুদ্ধ আমাকে দান কর, তাহা হইলেও আমি এই নিমন্ত্রণ বারণ করিয়া পাঠাইতে পারিব না।” লিচ্ছবিগণ অম্বপালীকে ধিক্কার দিতে দিতে অধোবদনে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতে বুদ্ধদেব গাত্রোত্থান করত বসনত্রয় পরিধান পূর্ব্বক অম্বপালীর ভবনে সশিষ্য সমাগত হইলেন।

অম্বপালী নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা তাহাদের পরিতোষ সাধন করিল। আহারান্তে ভগবান্ বুদ্ধকে করজোড়ে নিবেদন করিল—“আমার এই উদ্যান গৃহ ভগবান্ বুদ্ধ ও তাঁহার সঙ্ঘে সমর্পণ করিতেছি এই সামান্য উপহার গ্রহণ করিয়া আমার অভিলাষ পুর্ণ করুন।” বুদ্ধদেব গণিকার সেই প্রীতির উপহার গ্রহণ করিলেন ও তাহাকে বহুতর ধর্ম্মোপদেশ-দানে শিষ্যত্বে বরণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিশাখা।—

বৌদ্ধ শাস্ত্রে যে সকল সাধ্বী কুলস্ত্রীর উল্লেখ আছে বিশাখা তাহাদের শীর্ষস্থানীয়। তিনি ধনে পুত্রে সৌভাগ্যবতী—দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। গৃহ্য কর্ম্মে ও অনুষ্ঠানে সর্ব্বত্র তাঁহার প্রধান আসন ছিল—তাঁহার মত অতিথির আতিথ্য সৎকারে বহু পুণ্য উপার্জিত হয় লোকের এই ধারণা। বুদ্ধ যখন তাঁহার শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কোশল রাজধানী শ্রাবস্তি আসিয়া পৌঁছিলেন তখন বিশাখা ভিক্ষুদের অভ্যর্থনা জন্য

প্রচুর আয়োজন করেন। একদিন বিশাখার গৃহে বুদ্ধদেব শিষ্য-মণ্ডলী সহ ভোজন করেন। ভোজনান্তে বিশাখা কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিলেন—"ভগবন্ আমার কয়েকটী নিবেদন আছে শ্রবণ করুন।" বুদ্ধ কহিলেন, বল কিন্তু সকল গুলি গ্রাহ্য হইবে কি না বলিতে পারি না।

বিশাখা কহিলেন,—

"আমার ইচ্ছা আমি যতদিন জীবিত থাকি ভিক্ষুদিগকে বর্ষায় বস্ত্রদান করিব, নবাগত ভ্রাতৃগণকে অন্নদান করিব—পীড়িত ব্যক্তিদিগকে ঔষধ পথ্য প্রদান, তাহাদের অনুচর বর্গকে অন্নদান—ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষান্ন বিতরণ, ভিক্ষুণী-দিগকে বস্ত্রদান, এই সকল সৎপাত্রে দান করি আমার একান্ত ইচ্ছা।"

বুদ্ধ কহিলেন "তোমার কি অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়া বল।"

তখন বিশাখা তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন।

"ভগবন্ বিদেশ হইতে এখানে অনেক ভিক্ষু আসেন তাঁহারা এখানকার পথ ঘাট কিছুই জানেন না। তাহাদের ভিক্ষা সংগ্রহ বহু আয়াস সাধ্য। এই সমস্ত আগন্তুক ভিক্ষু-দিগকে আমি যে অন্নদান করিব তাঁহারা তাহা আহার করিয়া ইচ্ছামত নগর পরিদর্শন করিতে পারিবেন। আমি ইহার-দিগকে অন্নদান করিতে ইচ্ছা করি। কোন পরিব্রাজক শ্রমণ ভ্রমণের সময় যদি অন্নসংস্থানে ব্যস্ত থাকেন তাহা হইলে তিনি হয়ত তাঁহার দলের পিছনে পড়িয়া থাকিবেন, না হয়ত তাঁহার গম্য স্থানে সময় মত পৌঁছিতে পারিবেন না। তিনি যদি আমার অন্নছত্র হইতে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিতে পান তাহা

হইলে এইরূপ কষ্টভোগ হয় না, তিনি ইচ্ছামত ভ্রমণ ও বিশ্রাম করিতে পারেন। পরিব্রাজকদিগকে অন্নদান, এই আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা। প্রভো! আবার দেখুন, অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে অচিরাবতী নদীতে ভিক্ষুণীরা স্নান করিতে নামে আর তাহাদের সঙ্গে অনেক বারাঙ্গনা ও একই সময়ে স্নান করিতে আসে। এই নির্লজ্জ স্ত্রীরা উপহাস করিয়া বলে, "এই বয়সে তোমরা ধর্ম্মসাধনে কেন এত কষ্ট করিতেছ? এই বেলা মনের সাধে হেসে খেলে নেও—শেষ বয়সে যা ধর্ম্ম করিবার করিও—ইহকাল পরকাল দুদিক্ রক্ষা হইবে।" এইরূপ উপহাসে বেচারী ভিক্ষুণীরা বড়ই লজ্জিত ও বিরক্ত হয়। লজ্জাই স্ত্রীলোকের ভূষণ, বিবস্ত্রা হইয়া নির্লজ্জ ভাবে নদীতে স্নান করিতে নামা তাহাদের পক্ষে শোভন নহে। তাহাদের স্নান-বস্ত্র যোগাইতে পারি, এই আমার তৃতীয় ভিক্ষা।"

বুদ্ধ কহিলেন "আচ্ছা, তোমার এই সকল সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হউক আর আশীর্ব্বাদ করি ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণাতুরে পানীয় দান, পরিশ্রান্ত জনে আসন, রোগীকে ঔষধ পথ্য প্রদান—অশন বসন ঔষধ পথ্য যাহার যা চাই তাহা যথেচ্ছা দান করিবার ক্ষমতা তোমার অক্ষয় থাকুক। পরের দুঃখ হরণ ও কুশল বর্দ্ধন—এই সকল পুণ্য কার্য্যে নিরন্তর রত থাকিয়া স্বর্গে তোমার সুকৃতির ফল ভোগ করিতে থাক।"

বিশাখার নিকট বৌদ্ধ সঙ্ঘ অনেক বিষয়ে ঋণী; তিনি নগরের পূর্ব্বদিকস্থিত একটী সুরম্য উদ্যান সঙ্ঘে উৎসর্গ করেন তাহার নাম "পূর্ব্বারাম।"

সুজাতা।—

উপরে এক সতী সাধ্বী সুজাতার কথা বলিয়াছি, এবার আর এক ধরণের স্ত্রী "ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ মূর্ত্তি" রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণা দেখিবেন। ইনি একজন বড় মানুষের ঘরের আদুরে মেয়ে, ইঁহার নামও সুজাতা। বুদ্ধদেব ইঁহার প্রতি কিরূপ বশীকরণ মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন তাহার বৃত্তান্ত এই। তিনি একদিন ভিক্ষা-পর্য্যটনে বণিক অনাথপিণ্ডিকের বাড়ী আসিয়া শুনিতে পাইলেন সেই গৃহে মহা কলরব উপস্থিত। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কিসের গোল, মনে হয় যেন মেছুনীদের মৎস্য চুরী গিয়াছে।" অনাথপিণ্ডিক তাঁহার দুঃখের কাহিনী বুদ্ধের নিকট খুলিয়া কহিলেন; "আমার একটি পুত্রবধূ বড় ঘরের মেয়ে—সে আজ আমার বাড়ী আসিয়াছে। মেয়েটি বড় অবাধ্য, কাহারো কথা শুনে না, স্বামীর কথা মানে না, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর অবমাননা করে—বুদ্ধের পরে ও তার কোন অনুরাগ নাই।" বুদ্ধ সুজাতাকে ডাকিয়া কহিলেন"এস হে সুজাতা, কাছে এস।" সুজাতা নিকটে আসিলে বুদ্ধদেব কহিলেন "সুজাতা, স্ত্রী সাত প্রকার, কেহ ভীমা উগ্রচণ্ডা, কেহ কুটিলা কলহপ্রিয়া, কেহ প্রিয়ম্বদা, কেহ সুশীলা, কেহ সুগৃহিণী, কেহ প্রিয়সখী, কেহ সেবিকা। তুমি কোন্ ধরণের স্ত্রী? সুজাতা তখন তার মান অভিমান ভুলিয়া গিয়া উত্তর করিলেন "প্রভু যে প্রশ্ন করিতেছেন আমি তার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না আমাকে বুঝাইয়া বলুন।" বুদ্ধ—"আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি, প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর।" পরে তিনি সাত প্রকার স্ত্রীর বর্ণনা করিলেন, "অসতী স্ত্রী চপল স্বভাবা, কুল

কলঙ্কিনী, স্বামীকে যিনি ভাল বাসেন না, এই অধমা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তমা সতীলক্ষ্মী পবিত্রতা—পতি যাঁর একমাত্র ধন, যিনি দাসীর ন্যায় পতিসেবা তৎপর ও পতির একান্ত বাধ্য ও আজ্ঞাবহ। জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সাত প্রকার স্ত্রীর মধ্যে তুমি কার মতন ?” তখন সুজাতার চৈতন্য হইল, তিনি কহিলেন, “ভগবন্ আমাকে পতিব্রতা সতী স্ত্রীর মত মনে করুন, আমি অন্য কোন রূপ স্ত্রী হইতে ইচ্ছা করি না।”

এই সকল গল্পের স্রোতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, এখন ফিরিয়া গিয়া আসল কথা পাড়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বৌদ্ধ সঙ্ঘে স্ত্রীজাতির প্রবেশাধিকার অনেক সাধ্য সাধনার ফল। প্রথমে গৌতমী মহাপ্রজাপতি স্ত্রীলোকদিগের জন্য এই অধিকার প্রার্থনা করেন কিন্তু তাঁহার সেই আবেদন অগ্রাহ্য হয়। পরে আনন্দ আবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বুদ্ধদেবের নিকট নিবেদন করিলেন “স্ত্রীলোক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলে কি তাহার ফললাভে সক্ষম হয় না ? তাহারা কি আর্য্য মার্গ অনুসরণ করিয়া অর্হৎ হইবার অধিকারিণী নহে ?” বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন “তাহারা অধিকারিণী, সত্য।” “তবে কেন মহা প্রজাপতিকে সঙ্ঘভুক্ত করা না হয় ? ভগবন্, তিনি আপনার মাতৃবিয়োগে স্বীয় স্তন্য দুগ্ধ দিয়া আপনাকে লালন পালন করিয়াছেন, তিনি প্রভুর পরম ভক্ত, পরম উপকারিণী সেবিকা, তাঁহাকে এ অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা কি উচিত হয় ?” পরে বুদ্ধদেব বৌদ্ধ তপস্বিনীদের জন্য কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন তাহার সারাংশ এই যে

ভিক্ষুণীরা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন না করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভিক্ষু মণ্ডলীর আজ্ঞাবহ থাকিবেন। মনুর যে বিধান" শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে পতির অধীন, বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের অধীন, স্ত্রীলোক কোন কালেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবেন না" ভিক্ষুণীর প্রতি বুদ্ধানুশাসন ইহারই অনুযায়ী। সন্ন্যাসিনী হইয়াও স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই। তাঁহাদের প্রতি যে অষ্টানুশাসন আছে, তাহা এই ঃ—

১। ভিক্ষুদিগকে সম্ভ্রম ও ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে।

২। যে প্রদেশে ভিক্ষু নাই ভিক্ষুণী সেখানে বর্ষাযাপন করিবেন না।

৩। প্রত্যেক পক্ষে ভিক্ষুণী ভিক্ষু-সঙ্ঘের অনুমতি লইয়া উপবাসাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন ও সঙ্ঘের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবেন।

৪। বর্ষার উৎসব উদযাপিত হইলে ভিক্ষু-সঙ্ঘ ও ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ উভয়ের সমক্ষে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য (প্রবারণ) ব্রত পালন করিবেন।

৫। উভয় সঙ্ঘ হইতে 'মানত' শাসন গ্রহণ করিবেন।

৬। দুই বৎসর অধ্যয়নের পর উভয় সঙ্ঘ হইতে উপসম্পদ দীক্ষা লাভ করিবেন।

৭। শ্রমণদের নিন্দা ও তাহাদের প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিবেন না।

৮। ভিক্ষুরা তাঁহাদের দোষ বলিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সৎ পথে রক্ষা করিবেন কিন্তু ভিক্ষুদের প্রকাশ্যে দোষ ধরা ভিক্ষুণীদের সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

মহাপ্রজাপতি এই ধর্ম্মানুশাসন গ্রহণ করিয়া বুদ্ধের প্রথমা শিষ্যা রূপে দীক্ষিত হইলেন। পরে তিনি এক সময়ে ভিক্ষু ভিক্ষুণী যাহাতে গুণ ও কর্ম্মানুসারে সমান মানমর্য্যাদার অধিকারী হয় এই রূপ প্রস্তাব করেন কিন্তু বুদ্ধদেব তাহাতে সম্মত হইলেন না। কালক্রমে ভিক্ষুণীদের উপযোগী স্বতন্ত্র নিয়মাবলী প্রস্তুত হইল। ভিক্ষুণী ভিক্ষুমণ্ডলীর সহচরী হইয়া ফিরিবেন, স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া কুত্রাপি গমনাগমন করিবেন না। বুদ্ধের আদর্শ সন্ন্যাসিনী কিরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন তাহা মহাপ্রজাপতির প্রতি তাঁহার যে উপদেশ তাহাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। তৃষ্ণা পরিহার, অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকা, বৃথা আমোদ প্রমোদ হইতে দূরে থাকিয়া নির্জ্জনে ধ্যান ধারণা ধর্ম্মসাধন করা, আলস্য ত্যাগ করিয়া শ্রমশীলা হওয়া, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সুশীলা, বিনয়ী ও নম্র হওয়া, সকলের সহিত সদ্ভাবে সন্তোষের সহিত জীবন যাপন করা, বৌদ্ধ তপস্বিনী এইরূপ শুদ্ধাচার অবলম্বন পূর্ব্বক স্বকীয় ব্রত পালন করিবেন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা ভিক্ষুদের তুলনায় অনেক কম, তাহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তের বল বৌদ্ধ সঙ্ঘে সেই পরিমাণে অল্প হইবারই কথা। অথচ এদিকে দেখা যায় বৌদ্ধতাপসীগণ জনসমাজে বহু মানের পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, নয়কৌশল, সম্ভ্রান্ত পরিবারে গতিবিধি, তাহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার পরিচয়, মালতী মাধব প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা নিজ বিদ্যা বুদ্ধি পুণ্যবলে শ্রমণাপদে আরূঢ় হইতে পারিতেন; এমন কি, তিনি অর্হৎ হইবারও অধিকারিণী ছিলেন। ক্ষেমা প্রভৃতি

অনেকানেক বৌদ্ধতপস্বিনীদের প্রখর বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যগুণে বৌদ্ধসমাজে বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়।

স্থত্র পিটকে থেরাগাথা ও থেরীগাথা নামক দুইখানি গাথা সংগ্রহ পুস্তক আছে তাহাদের ভাষ্যে রচয়িতা রচয়িত্রীদের নাম ও জীবন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে অনেকানেক স্থবিরা তপস্বিনী গৌতমের জীবদ্দশার থেরীগাথা গুলি রচনা করেন। অনেকগুলি গাথা অতি সুন্দর ও লেখিকার সুবুদ্ধি ও ধর্ম্মশীলতার পরিচয় প্রদান করে। এই সকল তপস্বিনী বৌদ্ধ ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন, ভিক্ষু ভিক্ষুনীগণ সেই উপদেশ শ্রবণ করিতে আসিত ও শুনিয়া মোহিত হইত। থেরীভাষ্যে সোমা নামক একটী তাপসীর কথা আছে, তিনি রাজা বিম্বিসারের সভাপণ্ডিতের কন্যা, দীক্ষালাভের পর ধ্যান ধারণা সাধনা দ্বারা অর্হতপনা লাভ করেন। তিনি শ্রাবস্তীর নিকটস্থ এক উপবনে বৃক্ষতলে ধ্যান মগ্না আছেন এমন সময় 'মার' আসিয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিবার মানসে ভয় দেখাইতে লাগিল—

বহু তপস্যার ফলে যোগী ঋষি লভয়ে যে পদ
তুমি নারী, কেমনে পাইবে তাহা, দুরূহ, দুর্গম।
চিরকাল রাঁধ বাড় তবুও ত পাকিলনা হাত,
টিপিয়া দেখিতে হয় বার বার ফুটেছে কি ভাত!

তখন স্থবিরা উত্তর করিলেন—

নারীজন্ম লভেছি যদিও ভবে ক্ষতি কিবা তাহে!
অচল যাহার চিত্ত, সত্যের শিখর লভিবারে

না মানে কোনই বাধা, আপনায় করিয়া নির্ভর
অর্হৎ যে পথে চলে সেই পথে হয় আগুয়ান।
বিষয় বাসনা তার পুণ্যবলে হয় ছিন্ন-মূল,
অবিদ্যার অন্ধকার ঘুচে যায় সত্যের আলোকে।
জান্ ওরে ভাল ক'রে, আপনারে দেখ্ দুরাশয়,
আমিত চিনেছি তোরে, নাহি আর নাহি কোন ভয়।

বৌদ্ধ গৃহস্থ।—

বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে এ তাহার এক প্রধান দোষ, কেন না ইহা কে না স্বীকার করিবে যে উদাসীন সম্প্রদায় বিস্তৃত হইলে সমাজ রক্ষা সুকঠিন। সকলেই সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইলে মনুষ্যকুল ধ্বংস হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং সন্ন্যাসী দলও বিনষ্ট হইয়া যায়। দেখুন ভিক্ষুদের ধনোপার্জ্জনের পথ বন্ধ—তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন, রক্ষণাবেক্ষণ সকলি গৃহস্থের বদান্যতার উপর নির্ভর। ভিক্ষু গৃহীর অন্নেই প্রতিপালিত, গৃহীর প্রসাদেই তাহার বাস পরিচ্ছদের সংস্থান। গৃহস্থেরা যদি গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়া বাহির হয় তাহা হইলে সংসার যন্ত্রের কল বন্ধ হইয়া যায়, অন্নাভাবে সন্তানাভাবে মনুষ্যসমাজ—বৌদ্ধ সঙ্ঘ—সকলি উচ্ছন্ন হইয়া যায়। বুদ্ধদেব স্বয়ং ইহা সম্যকরূপে অবগত ছিলেন, এই হেতু ভিক্ষু ছাড়া গৃহস্থ শিষ্যও বৌদ্ধ সমাজের অঙ্গীভূত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ সঙ্ঘের সহিত বৌদ্ধ গৃহস্থের তেমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল না। গৃহস্থকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার এক ত্রিশরণ মন্ত্র ভিন্ন আর কোন বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল না। আচার বিচারে বৌদ্ধ গৃহস্থস্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলুন তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি

নাই—বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে অন্নাচ্ছাদনে পোষণ করাই তাহাদের কার্য্য। বৌদ্ধ গৃহস্থের নাম উপাসক উপাসিকা, তাঁহারা এক প্রকার কনিষ্ঠ অধিকারী। বুদ্ধের খাস শিষ্যমণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে গেলে সঙ্ঘভুক্ত হওয়া আবশ্যক—তাঁহারা অনেকে ততদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না; ভিক্ষুদিগকে সংরক্ষণ করাই তাহাদের বুদ্ধত্বের লক্ষণ।

ভিক্ষুদের জন্য বুদ্ধদেব যে সকল নিয়ম বাঁধিয়া দেন তাহার কতকগুলি নিয়ম গৃহস্থদেরও পালনীয়। ধার্ম্মিক সূত্রে গৃহস্থদের কুলধর্ম্ম বলিয়া যে সকল বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে জীবহত্যা, চুরি, মিথ্যা ভাষণ, ব্যভিচার ও সুরাপান এই পঞ্চ নিষেধ সর্ব্ব সাধারণ—ইহা ছাড়া আরো কতক গুলি অনুশাসন আছে যথা—

অকাল ভোজন করিবে না

মাল্য গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি ব্যবহার করিবে না

মাদুর বিছাইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে

এই তিনটি বিধান গৃহস্থের প্রতি ততটা বন্ধনকারী নয়, তথাপি শুদ্ধাচারী গৃহস্থের পালনীয়।

উপবাস—

অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও আর দু দিন—মাসের মধ্যে এই চার দিন উপবাস। তা ছাড়া প্রতিহার পক্ষও রক্ষণীয়।

প্রতিহার পক্ষ কি না বর্ষার ৩ মাস এবং বর্ষার পর-মাস যাহাকে চীবর মাস বলে অর্থাৎ নূতন চীবর ধারণের সময়। চীবর ধারণের অর্দ্ধমাস উপবাস প্রভৃতি ব্রত পালনের প্রশস্ত কাল।

এই সমস্ত নিয়ম ও ব্রত পালন ভিক্ষু ও গৃহস্থের পক্ষে সমান, প্রভেদ এই যে কতকগুলি বিধান যাহা ভিক্ষুদের অবশ্য পালনীয় গৃহস্থের উপর তাহার ততটা বন্ধন নাই আর দুইটি নিষেধ ভিক্ষুদের জন্যই করা হইয়াছে—অর্থাৎ নৃত্য গীত নাট্যাদি দর্শন না করা এবং সোনা রূপা গ্রহণ না করা—এ দুই গৃহস্থ সমাজে খাটে না। তেমনি আবার গৃহীদের প্রতি কতকগুলি বিশেষ বিধান আছে যথা, সাধুজীবিকা অবলম্বন করা, পিতা মাতাকে ভক্তি করা, গুরুজনকে মান্য করা, ভিক্ষুদিগকে অন্ন বস্ত্র দান দ্বারা পোষণ করা ইত্যাদি। শৃগালবাদ সূত্রে গৃহীধর্ম্ম আরো বিস্তারিতরূপে ব্যাখাত হইয়াছে, তাহার সারাংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বুদ্ধদেব রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী বেনুবনে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। ভিক্ষায় বাহির হইবার সময় দেখিলেন শৃগাল নামক জনৈক গৃহস্থ আর্দ্রকেশ আর্দ্রবেশে কৃতাঞ্জলিপুটে উপরে আকাশ নীচে পাতাল, চারিদিক্ নিরীক্ষণ করত নমস্কার করিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে শৃগাল বলিলেন—"ভগবন্, পিতৃকুলের তর্পণ উদ্দেশে এইরূপ করিতেছি।" পরে এই আট দিক্ কি উপায়ে সুরক্ষিত হইতে পারে বুদ্ধদেব সেই বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিলেন।

জল সিঞ্চনে নয় কিন্তু শুভ চিন্তা ও কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বদিক্ সুরক্ষিত হয়। পূর্ব্ব দিকে আলোক সঞ্চার হয়, পূর্ব্বমুখী হইয়া পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিবে। দক্ষিণে ধনাগম, দক্ষিণ মুখে গুরুর প্রতি কর্ত্তব্য চিন্তন করিবে। পশ্চিমে দিবসাবসানের সুরাগ ও শান্তি—পশ্চিম মুখী হইয়া স্ত্রীপুত্রের

মঙ্গল চিন্তা করিবে। উত্তরে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন—উর্দ্ধে ব্রাহ্মণ শ্রমণ সাধু সজ্জন, অধোতে দাস পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ ও মনন করিলে ছয় দিক্ সুরক্ষিত থাকিবে—সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হইবে।"

মনুষ্যের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের নিয়ম এই—

পিতা পুত্র—

পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য

১। পুত্রকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করা

২। ধর্ম্ম শিক্ষা দান

৩। বিদ্যা দান

৪। পুত্রের বিবাহ—সৎপাত্রে কন্যাদান

৫। বিষয়াধিকার প্রদান

পুত্রের কর্ত্তব্য

১। পিতা মাতার ভরণ পোষণ করা

২। কুলধর্ম্ম রক্ষণ

৩। বিষয় রক্ষা

৪। পিতার যোগ্য পুত্র হইবার চেষ্টা

৫। পিতা মাতার স্মৃতি রক্ষা

গুরু শিষ্য

গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য

১। গুরুভক্তি

২। গুরুর সেবা শুশ্রূষা

৩। আজ্ঞা পালন

৪। গুরু দক্ষিণা দান

৫। বিদ্যাভ্যাস

শিষ্যের প্রতি গুরুর কর্ত্তব্য

১। স্নেহ ও শিষ্টাচার

২। ধর্ম্মশিক্ষা ও উপদেশ প্রদান

৩। আপদ বিপদ হইতে সংরক্ষণ

স্বামী স্ত্রী

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য

১। সম্মান প্রদর্শন

২। ভালবাসা

৩। একনিষ্ঠতা

৪। ভরণ পোষণ বেশ ভূষায় তুষ্টি সাধন

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য

১। গৃহ কার্য্যে দক্ষতা

২। অতিথি সেবা

৩। সতীত্ব রক্ষা

৪। মিতব্যয়ী হওয়া

৫। শ্রমশীলতা

বন্ধু বন্ধুর প্রতি

১। উপহার দান

২। মধুরালাপ

৩। কল্যাণ কামনা

৪। আত্মবৎ ব্যবহার

৫। সুখ সম্পত্তি বাঁটিয়া ভোগ করা

সখ্য লক্ষণ

১। বিপদে রক্ষা করা

২। বিষয় রক্ষা

৩। আশ্রয় দান

৪। বিপদ কালেও বন্ধুকে পরিত্যাগ না করা

৫। পরিবার পোষণ

প্রভু ভৃত্য

ভৃত্যের প্রতি প্রভুর কর্ত্তব্য

১। যথাশক্তি তাহার কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দেওয়া

২। অন্ন, বেতন, পারিতোষিক দান

৩। ঔষধ পথ্য প্রদান

৪। ভাল জিনিস পাইলে বাঁটিয়া দেওয়া

৫। কর্ম্ম হইতে মধ্যে মধ্যে অবকাশ দান

প্রভুর প্রতি ভৃত্যের কর্ত্তব্য

১। উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন

২। সকলের শেষে বিশ্রাম করা

৩। সন্তোষ অবলম্বন

৪। কায়মনে প্রভু সেবা করা

৫। সবিনয় সম্ভাষণ

ব্রাহ্মণ শ্রমণের প্রতি গৃহীর কর্ত্তব্য

১। কায়মনোবাক্যে প্রিয়কার্য্য সাধন

২। আতিথ্য

৩। অন্ন বস্ত্র দান

গৃহীর প্রতি ভিক্ষুর কর্ত্তব্য

১। পাপ হইতে নিবৃত্ত করা

২। ধর্ম্মোপদেশ প্রদান

৩। শিষ্টাচার

৪। ধর্ম্ম বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন

৫। মুক্তি পথ প্রদর্শন

এইরূপে পরস্পর কর্ত্তব্য পালন করিলে ছয় দিক্ সুরক্ষিত ও গৃহস্থের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ হয়।

দান সৌজন্য দয়া দাক্ষিণ্য নিঃস্বার্থতা গৃহস্থ জীবনের পরম সম্বল।

শৃগাল বৌদ্ধধর্ম্মে উপাসকরূপে গৃহীত হইলেন।

এই সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান অষ্টাঙ্গিক আর্য্যমার্গের প্রথম সোপান। এই পথে চলিতে চলিতে মুমূক্ষু ব্যক্তি কালক্রমে অর্হৎমণ্ডলীর সহবাসের যোগ্য হইয়া সেই শান্তিধামে উপনীত হয়েন যেথানে রোগ নাই, শোক নাই, মৃত্যু নাই, সকল পাপের ক্ষয়, সর্ব্ব দুঃখের অবসান হয়। সেই নির্ব্বাণ—সে অবস্থা দেবতাদিগের ও স্পৃহনীয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র।

শাক্য সিংহ কোন লিখিত গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই; বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে তাঁহার কথা বার্ত্তা উপদেশ নিয়মাদি শ্রুতি পরম্পরায় শিষ্য মুখে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে, পরে কোন সময়ে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়। বুদ্ধের মরণোত্তর বৌদ্ধদের চারিটি মহাসভার উল্লেখ করা গিয়াছে এই স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কিছু পরেই মহাকাশ্যপের মন্ত্রণায় রাজা অজাতশত্রুর আশ্রয়ে রাজগৃহে সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সভার অধিবেশন হয়। উহার এক শতাব্দী পরে কালাশোক, তৎপরে অশোক রাজা, এবং খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৪৩ শতাব্দে কাশ্মীরের শকজাতীয় রাজা কণিষ্ক যথাক্রমে বৈশালী, পাটলিপুত্র ও জালন্ধরে এক একটী সভা করেন। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় সভায় বুদ্ধের উপদেশ ও কথাবার্ত্তা সঙ্কলিত হইয়া বৌদ্ধশাস্ত্র প্রস্তুত ও অশোকের সভায় সেই শাস্ত্র পুনর্ব্বার সমালোচিত ও স্থিরীকৃত হয়। ঐ শাস্ত্র তিন প্রকার বিনয় পিটক, সূত্র পিটক ও অভিধর্ম্ম পিটক। এই তিনের সমবেত নাম ত্রিপিটক। ইহাতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত ও বিশ্বাস, অনুষ্ঠান প্রণালী, প্রায়শ্চিত্ত বিধান, নীতি, উপাখ্যান, দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি বিনিবেশিত আছে।

পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি সমধিক প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। তথাপি ত্রিপিটক শাস্ত্র ঠিক কোন্ সময়ে পুঁথি ও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয় তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রবাদ এই যে পাটলিপুত্রে যে ত্রিপিটক শাস্ত্র প্রণীত হয় অশোক পুত্র মহেন্দ্র তাহা লইয়া সিংহলে গমন করেন এবং তিনি ঐ সময়ে ত্রিপিটকের পালি ভাষ্যও মগধ হইতে আনাইয়া সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করেন। কেহ কেহ বলেন ত্রিপিটকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কণ্ঠস্থ করিয়া তিনি সিংহল যাত্রা করেন। সে যাহা হউক, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে রাজা বত্ত-গামনীর রাজত্ব কালে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পালি শাস্ত্র সিংহলে প্রথম লিপিবদ্ধ হয় এবং বুদ্ধঘোষের সময় অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দে যে ঐ শাস্ত্রের পালি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল ইহাও এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত। খুব সম্ভব ঐ পাণ্ডু-লিপি মহেন্দ্রর * সময়ে বিদ্যমান ছিল। এখন বিবেচ্য এই তাহার কত পূর্ব্বে উহা প্রস্তুত হয়। এই বিষয়ের আভ্যন্তরীন প্রমাণ এক এই পাওয়া যায় যে প্রচলিত ত্রিপিটকের ভিতরে রাজগৃহ ও বৈশালী সভার উল্লেখ আছে অতএব তাহার উত্তর কালে ত্রিপিটক রচনা হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। আর এক কথা এই যে ত্রিপিটকের মধ্যে পাটলিপুত্র সভার কোন উল্লেখ নাই অতএব তৎপূর্ব্বে ইহার রচনা কাল নির্দ্ধারিত হইতে পারে। ইহা হইতে নিদান এইটুকু স্থির বলা যায় যে বৈশালী এবং পাটলিপুত্র সভার মাঝামাঝি কোন সময়ে ত্রিপিটক

---

* Introduction to Sacred Books of the East Vol. X

শাস্ত্র প্রথম প্রস্তুত হয়। আবার ঐ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে তাহার কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, যেমন বিনয়ের প্রতিমোক্ষ ভাগ এবং বুদ্ধ উপদেশের কিয়দংশ। এই সমস্ত কারণে ত্রিপিটকের কিয়দংশ ধর খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে, কতক বা তাহার ও পূর্ব্বে বিরচিত। দক্ষিণ অঞ্চলের বৌদ্ধেরা ঐ শাস্ত্র সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করেন ও পরে তাহা ব্রহ্মদেশাদির ভাষায় অনুবাদিত হয়। এ ভিন্ন উহা ভোট, চীন, মোগল, কালমুখ প্রভৃতি উত্তর দেশীয় অন্যান্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ শাস্ত্রান্তর্গত গ্রন্থাবলীর তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

বিনয় পিটক (সঙ্ঘ নিয়মাবলী)

১। সুত্ত বিভঙ্গ { পারাজিকা
প্রায়শ্চিত্ত-বিধান

২। খন্ধক { মহাবগ্‌গ, মহাবর্গ
চুল্লবগ্‌গ, ক্ষুদ্রবর্গ

৩। পরিবার পাঠ, পরিশিষ্ট।

সুত্ত পিটক (বুদ্ধের উপদেশ)

১। দীঘ নিকায়, ৩৪ দীর্ঘ সূত্র সংগ্রহ (মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র প্রভৃতি)

২। মধ্যম নিকায়, ১৫২ মধ্যম সূত্র-সংগ্রহ।

৩। সংযুক্ত নিকায়, সংযুক্ত সূত্র-সংগ্রহ।

৪। অঙ্গুত্তর নিকায়, বিবিধ সূত্র-সংগ্রহ।

৫। ক্ষুদ্রক নিকায়, ক্ষুদ্র সূত্র-সংগ্রহ, ইহার মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত ১৫ খানি গ্রন্থ সন্নিবেশিত।

১। ক্ষুদ্রক পাঠ

২। ধম্মপদ

৩। উদান, স্তুতি (৮২ সূত্র)

৪। ইতিবুত্তক, বুদ্ধ কথাবলী

৫। সূত্ত নিপাত, ৭০ সূত্র

৬। বিমান বত্থু, স্বর্গ কথা

৭। পেত বত্থু, প্রেত কথা

৮। থেরাগাথা, স্থবির-গাথা

৯। থেরীগাথা, স্থবিরা-গাথা

১০। জাতক, পূর্ব্বজন্ম কাহিনী

১১। নিদ্দেস, সারীপুত্রের ব্যাখ্যান

১২। পতিসম্বিধামাগ্‌গ, প্রতিসম্বোধমার্গ

১৩। অপদান, অর্হৎ চরিত্র

১৪। বুদ্ধবংশ, গৌতম ও পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ জন বুদ্ধের জীবন বৃত্ত।

১৫। চরিয়া পিটক, বুদ্ধ-চরিত

অভিধম্ম পিটক (দর্শন)

১। ধম্ম সঙ্গ

২। বিভঙ্গ

৩। কথা বত্থু পকরণ

৪। পুগ্‌গল পন্নত্তি, সত্ত্ববোধ

৫। ধাতুকথা, নর নারী চরিত্র

৬। যমক, পরস্পর বিরোধী যুগল কথা সংগ্রহ

৭। পথানপকরণ, কার্য্যকারণ নির্ণয়।

চুল্লবর্গের শেষ দুই খণ্ডে রাজগৃহ ও বৈশালী সভার বিবরণ বর্ণিত আছে এবং কথিত হইয়াছে যে প্রথম সভায় উপালী 'বিনয়' আবৃত্তি করেন, আনন্দ 'ধর্ম্ম' পাঠ করেন। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঐ সময়ে শাস্ত্রের দুই অঙ্গই ছিল, তৎপরে 'ধর্ম্ম' দুই ভাগে বিভক্ত হয়, সূত্র এবং অভিধর্ম্ম। এই অভিধর্ম্ম খণ্ড ক্রমে অপর দুই পিটকের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়ায়।

সূত্র বিভঙ্গ।—

বৌদ্ধ সঙ্ঘে অমাবস্যা পূর্ণিমায় যে দোষ ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধান পঠিত হয়, সেই ব্যবস্থাগুলি ইহার মূল সূত্রে গ্রথিত। ক্রমে ভাষ্যের উপর ভাষ্য ও টীকা সংযুক্ত হইয়া গ্রন্থখানি বাড়িয়া গিয়াছে। এই সমস্ত নিয়মাবলী সূত্র বিভঙ্গের অঙ্গীভূত।

প্রতিমোক্ষ।—

প্রায়শ্চিত্ত-বিধানগুলি স্বতন্ত্র আকারে প্রতিমোক্ষ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ইহা বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ, সঙ্ঘের নিয়মাবলী বুদ্ধ স্বয়ং যাহা প্রবর্ত্তিত করেন তাহা ইহার মধ্যে থাকাই সম্ভব। তথাপি আশ্চর্য্য এই যে বৌদ্ধেরা ইহার শাস্ত্রীয় মর্য্যাদা সূত্র বিভঙ্গের সমান জ্ঞান করেন না।

মহাবগ্‌গ, চুল্লবগ্‌গ } কালক্রমে নানা প্রক্ষিপ্ত অংশে পুষ্টিলাভ করিয়া বর্দ্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে।

পরিবার পাঠ পরবর্ত্তী কালে সঙ্কলিত।

মহা পরিনির্ব্বাণ সূত্র সূত্র-পিটকের দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত।

ইহাতে বুদ্ধ জীবনীর শেষ ৩ মাসের ঘটনাবলী ও মরণ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহাতে বুদ্ধের মুখে পাটলিপুত্রের ভাবি উন্নতি বিষয়ের যে কথাগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে ইহার রচনাকাল পাটলিপুত্র মগধ রাজধানী রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার উত্তরকাল বলিয়া অনুমান হয়, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দী ধরা যাইতে পারে।

ধম্মপদ।—

সুত্ত-পিটকের অন্তর্ভূত ক্ষুদ্রক নিকায়ের পঞ্চদশ গ্রন্থের একটী গ্রন্থ। ইহার নাম হইতেই বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ধর্ম্ম-নীতি বিষয়ক পদাবলী।' ইহাতে যে সকল ধর্ম্ম-প্রবচন ও হিতোপদেশ আছে আমাদের মহাভারত, গীতা, এবং অন্যান্য নীতিশাস্ত্রে তাহার অনুরূপ কথার অপ্রতুল নাই, কতক বিষয়ে অবিকল সাদৃশ্য ও উপলক্ষিত হয়—তথাপি ইহার কোন কোন ভাগে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব উপলব্ধি করা যায় অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহার কতিপয় শ্লোক নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি তাহা হইতেই ইহার স্বরূপ ও মতামত কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

এই থানে প্রথমে দুইটী শ্লোক বলিব তাহা বুদ্ধদেব প্রবুদ্ধ হইবা মাত্র উচ্চারণ করেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখাজাতি পুণপ্পুণং।
গহকারক! দিট্‌ঠোহসি, পুণ গেহং নকাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্ঝগা।

অর্থ—জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপনে আছে এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মান।
পুনঃ পুন দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার—
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর।
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,
সংস্কার বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।

মনেতেই ধর্ম্ম ১, ২

মনেতেই ধর্ম্ম; ধর্ম্ম মনোগামী। যে ব্যক্তি মন্দভাবে আলাপ ও কার্য্য করে, টানা গাড়ী যেমন বলদের পিছনে পিছনে যায় দুঃখ সেইরূপ তার অনুগামী হয়।

মনেতেই ধর্ম্ম; ধর্ম্ম মনোগামী। যিনি ভাল ভাবে আলাপও কার্য্য করেন, ছায়ার ন্যায় সুখ তাঁর অনুগামী হয়।

যে যা করে, সে তা হয়; উল্টে না কদাপি,
সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী।

(পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম)

পাপ পুণ্য ১৭,১৮

পাপকারী ইহলোক পরলোক উভয়ত্র দুঃখ ভোগ করে। ইহলোকে পাপাচরণ করিয়া সন্তাপ, পরলোকে দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া আরো যন্ত্রণা।

পুণ্যবান্ ইহলোক পরলোক উভয়ত্র সুখ ভোগ করেন। ইহলোকে পুণ্য কর্ম্ম করিয়া আনন্দিত, পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর আনন্দ উপভোগ করেন।

পাপ করি পাপ কীর্ত্তি দহে পাপানলে
পুণ্য করি পুণ্য কীর্ত্তি বাড়ে পুণ্য ফলে।

পুণ্য আচরণে আত্মা হয় পুণ্যময়,
পাপ আচরণে হয় পাপের আলয়॥ ঐ

১২১। পাপ আসিবে না মনে করিয়া পাপ বর্জনে অবজ্ঞা করিবেক না; জল বিন্দুপাতে অল্পে অল্পে জল কুম্ভ পূর্ণ হয়, অল্পে অল্পে সঞ্চয় করিয়া মূর্খ পাপে পূর্ণ হয়।

ক্ষরিলে ইন্দ্রিয় কোনো বুদ্ধি ও ক্ষরিতে সুরু করে,
কলসের ছিদ্র দিয়া জল যথা ক্রমশঃ নিঃসরে।

১২২। পুণ্য আসিবে না মনে করিয়া পুণ্যার্জনে অবজ্ঞা করিবেক না। জল বিন্দু পাতে অল্পে অল্পে জল কুম্ভ পূর্ণ হয়, ধীর ব্যক্তি অল্পে অল্পে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পূণ্যে পূর্ণ হয়েন।

ক্ষুদ্রকীট পুত্তিকা বিরচে যথা প্রকাণ্ড আলয়
অল্পে অল্পে তেমনি ধরম ধন করিবে সঞ্চয়। ঐ

১৬৫। মনুষ্য আপনিই পাপ করে, আপনিই তার ফল ভোগ করে। আপনি পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত হয়, আপনিই শুদ্ধি লাভ করে। পাপ পুণ্য আমার নিজেরই জিনিস, আপনি ভিন্ন আর কেহ আমাকে পরিত্রাণ করিতে সক্ষম নহে।

একাই জনমে নর, একা হয় মৃত;
একাই সুকৃত ভুঞ্জে, একাই দুষ্কৃত।

২১৯-২২০

চির-প্রবাসী দূর হইতে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হইলে আত্মীয় স্বজন বন্ধু তাহাকে স্বাগত বলিয়া অভ্যর্থনা করে, সেইরূপ পুণ্যবান্ ব্যক্তি পুণ্য কর্ম্ম করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে পর তাঁহার পুণ্য তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় প্রতিগ্রহণ করেন।

চিরপ্পবাসিং পুরিসং দূরতো সোত্থমাগতং
ঞাতি মিত্তা সুহজ্জা চ অভিনন্দন্তি আগতং
তথেব কৃত পুঞ্ঞম্পি অস্মা লোকা পরং গতং
পুঞ্ঞানি পর্তিগণ্হন্তি পিয়ং ঞাতীব আগতং।

(পালি)

অহিংসা ১৩০,১৩১

সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবিত সকলেরই প্রিয়। তুমি ও আপনাকে তাহাদের উপমাস্থলে আনিয়া কাহাকে ও বধ বা হিংসা করিবে না।

যিনি আত্ম সুখ কামনায় অন্য সুখকামী জীবের হিংসা করেন তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া সুখ প্রাপ্ত হন না।

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বেসং জীবিতং পিয়ং
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে
সুখ কামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি
অত্তনো সুখ মেসানো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং।

(পালি)

প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানাং অপি তে তথা
আত্মোপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুৰ্ব্বন্তি সাধবঃ

(হিতোপদেশ)

রিপুদমন ৩,৪,৫, ২২২, ২২৩

"ও আমাকে মারিয়াছে, ও আমায় গালি দিয়াছে, আমার চুরী করিয়াছে" এই সকল চিন্তা মনে স্থান না দিলে বৈরী আপনাপনি প্রশমিত হয়; কেননা হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা জিত হয় না, প্রেম দ্বারা জিত হয়।

ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করিবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে, কৃপণকে দান দ্বারা, অসৎকে সত্য দ্বারা জয় করিবে।

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে
জিনে কদরিয়ং দানেন, সচ্চেন অলিকবাদিনং (পালি)

অক্রোধে জিনিবে ক্রোধ
অসাধুতা সাধু আচরণে
অসত্য জিনিবে সত্যে
কদর্য্যে করিবে বশ—ধনে।

সেই সারথী যে ক্রোধকে আপনার বশে রাখিতে পারে, অপর ব্যক্তি কেবল রাশ-রজ্জু-ধারী।

বুদ্ধিহীন যেই জন, মন যার সতত অস্থির,
তাহার ইন্দ্রিয়গণ দুষ্ট অশ্ব যেন সারথীর।
যেই জন সুবুদ্ধি, কর্ত্তব্যে যার নাহিক আলস্য।
তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথীর বশীভূত অশ্ব।

আত্ম সংযম ৮০, ১০৩

কূপখন্তা জলের গতি নিয়ন্ত্রিত করে, ইষুকার মনের মত বাণ গড়িয়া লয়, সুতার কাষ্ঠ বাঁকা সোজা ইচ্ছামত গড়ে, জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাকে আপনি নিয়মিত করেন।

উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা, উসুকারা নময়ন্তি তেজনং,
দারুং নমযন্তি তচ্ছকা, অত্তানং দমযন্তি পণ্ডিতা।

যিনি যুদ্ধে সহস্র লোকের উপর জয়লাভ করেন তিনি জয়ী

নহেন, যিনি আপনাকে আপনি জয় করেন তিনিই যথার্থ বিজয়ী।

সংসার ১৭০, ১৭১।–

সংসার জলবিম্ব প্রায় দেখিবে, মরীচিকা সমান জ্ঞান করিবে; যিনি সংসারকে এইরূপে দেখেন মৃত্যুরাজ তাঁহার কাছে ঘেঁসিতে পারে না।

যথা বুব্বুলকং পস্‌সে যথা পস্‌সে মরীচিকং
এবং লোকং অবেক্‌খন্তং মচ্চুরাজা ন পস্‌সতি (পালি)

এই চাকচিক্যময় সংসার যেন রাজার রথ, বাহির হইতে দেখিবার জিনিস। মূঢ় ইহার প্রতি আসক্ত, জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাকে স্পর্শ করেন না।

মৃত্যু ২৮৬, ২৮৭ ২৮৮ ২৮৯।—

"এই খানে শীত গ্রীষ্ম কাটাইব, এখানে বর্ষা যাপন করিব" মূঢ় ব্যক্তি এই ভাবনায় অস্থির--মৃত্যুর অন্তরায় স্মরণ করে না। সুপ্ত গ্রামের উপর বন্যার ন্যায় মৃত্যু আসিয়া পুত্র কলত্র শুদ্ধ তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়—তাহার মন বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। পিতা পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না, ইহা জানিয়া জ্ঞানী ও সাধুপুরুষ শীঘ্রই নির্ব্বাণ পথের কণ্টক মোচন করিবেন।

পরলোকে সহায় হইয়া কেহ নাহি দিবে দেখা,
পিতামাতা পুত্রদার, জ্ঞাতি বন্ধু; ধর্ম্ম রবে একা।
কাষ্ঠ লোষ্ট্র সমান ভূতলে ত্যজি মৃত কলেবর
বন্ধুগণ যায় চলি, ধর্ম্ম হয় পথের দোসর।

জরা মৃত্যু ১৪৩, ১৪৮।—

এত হাসি এত আমোদ প্রমোদ কিসের জন্য? সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা অবিশ্রান্ত রহিয়াছে। তোমরা অন্ধকারে বাস করিয়া কেন না আলো অন্বেষণ কর?

এই দেহ ব্যাধিতে শীর্ণ, জরাজীর্ণ হইয়া ভগ্ন হইয়া যায়, মৃত্যু আসিয়া জীবনকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

আত্মদোষ পরছিদ্র ২৫২

পরের দোষ সহজেই দৃষ্টি পড়ে, আপনার দোষ দেখিয়াও দেখি না। প্রতিবেশীর দোষগুলি ভূসির ন্যায় বাহিরে ফেলিয়া দি—নিজের দোষ যত্নে ঢাকিয়া রাখি যেমন জুয়া খেলায় জুয়ারী পাশার অঠিক দান ঢাকিয়া রাখে।

কথা ও কাজ ৫১, ৫২।—

কথা মধুর কাজ বিপরীত, নির্গন্ধ ফুলের ন্যায় দেখিতে রংচঙে অথচ গন্ধ নাই।

ভাল কথা ভাল কাজ সুগন্ধ সুবর্ণ পুষ্পের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

সুখ ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯।—

আমরা সুখে থাকিব, আমাদের যে ঘৃণা করে আমরা তাহাকে ঘৃণা করিব না। আমাদের যারা দ্বেষ্টা আমরা তাহাদের মধ্যে দ্বেষশূন্য হইয়া বাস করিব। আতুরের মধ্যে অনাতুর হইয়া থাকিব, লোভীর মধ্যে নির্লোভী হইয়া বাস করিব। আমাদের আপনার কিছুই নাই অথচ প্রীতিভোজী দেবতাদের ন্যায় আমরা সদানন্দ।

স্থবির কে ? ২৬০, ২৬১।

যাঁহার শুক্লকেশ তিনি বৃদ্ধ নহেন ; বয়সে বিজ্ঞ হয় না বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে। সত্য প্রেম ক্ষমা দয়া যাঁর, যিনি জ্ঞানবান্ ও শুদ্ধচিত্ত, তিনিই স্থবির।

শুক্লকেশ যাহার সে নহে বৃদ্ধ ;
দেবতা সকলে
তাহারেই জানে বৃদ্ধ
যৌবনেই বিদ্যা যার ফলে।

মূনি কে ? ২৬৮, ২৬৯।—

মূর্খ যে সে মৌন হইলেই মুনি হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি নিক্তির ওজনে সদসৎ বিবেচনা করিয়া যাহা শ্রেয় তাহা গ্রহণ করেন, যাহা অসৎ তাহা পরিত্যাগ করেন।—তিনিই মুনি। যিনি সংসারের ভাল মন্দ দুই দিক্ বিচার পূর্ব্বক দেখেন তিনিই মুনী।

মৌনে মুনী না হয়
না হয় মুনি জটাজুট ভারে
আপনাকে পছানে যে বিলক্ষণ
মুনি বলি তারে।

শ্রেয় আর প্রেয় ফিরে মনুষ্য মাঝারে
ধীর ব্যক্তি উভয়ের প্রভেদ বিচারে।
শ্রেয় যে গ্রহণ করে বিপত্তি এড়ায়
প্রেয় যে বরণ করে সর্ব্বস্ব হারায়।

তৃষ্ণা ২৭১, ২৭২ ।—

ব্রত অনুষ্ঠানে, শাস্ত্র অধ্যয়নে, ধ্যান বা বিবিক্ত শয়নে, সংসারীর দুষ্প্রাপ্য মোক্ষ লাভ হয় না। হে ভিক্ষু! তৃষ্ণা নিবৃত্তি না হইলে এই সমস্ত সাধনায় আশ্বাসযুক্ত হইও না।

কামনা যে ত্যজে তার সব ধন মিলে,
সুখের প্রবাহ বহে লোভ তেয়াগিলে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম

ভিক্ষু কে ? ৯, ১০, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০ ।—

যে ব্যক্তি কশায় (পাপ) হইতে বিমুক্ত না হইয়া কাষায় (গেরুয়া বসন) পরিধান করিতে চান, যিনি মিতাচারী ও সত্যবান্ নহেন তিনি কাষায়ের যোগ্য নহেন। যিনি 'কশায়' হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ, মিতাচারী ও সত্যপরায়ণ তিনিই কাষায় বসনের উপযুক্ত।

যিনি হস্ত পদ বাক্য বশে রাখেন, যিনি সংযত ও জিতেন্দ্রিয় যিনি আপনাতে আপনি আনন্দময়, যিনি সন্তুষ্টচিত্তে বিজনে বাস করেন তিনিই ভিক্ষু।

হে ভিক্ষু! নৌকার বোঝাই ফেলিয়া দিয়া ইহাকে হালকা কর, হালকা হইলে দ্রুত চলিবে। রাগ দ্বেষ দূরে ফেলিয়া নির্ব্বাণ পথের যাত্রী হও।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের বন্ধন ছেদন কর; যিনি এই পঞ্চ শিকল ভাঙ্গিয়াছেন তিনিই 'ওঘোত্তীর্ণ' ভিক্ষু।

৩৩০ মূর্খের সহবাস অপেক্ষা একাকী বিজনে বাস ভাল। পাপাচরণ করিও না, অরণ্যে যেমন হস্তী চরিয়া বেড়ায় তুমিও সেইরূপ একা একা মনের সুখে ফিরিয়া বেড়াও।

২৭৬ মুক্তি সাধনে তোমার আপনার চেষ্টা চাই তথাগত উপদেষ্টা মাত্র। নির্ব্বাণ পথে সাবধান হইয়া চল নহিলে মারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই।

৩৩৭-৩৩৮ বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিলেই নষ্ট হয় না, তাহার মূল যতক্ষণ অক্ষত থাকে ততক্ষণ সে মরে না, আবার বাড়িয়া ওঠে, তৃষ্ণার বিষয় বিনষ্ট হইলেও দুঃখ পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসে। মারের হস্ত হইতে যদি পরিত্রাণ চাও, তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটন কর।

একটা গাছ কাটিলে কি হইল? সমুদয় বন কাটিয়া ফেলা চাই। হে ভিক্ষু! সমস্ত বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নির্ভীক ও নির্ম্মুক্ত হও।

যে ব্যক্তি সদাচারী শান্ত সমাহিত হইয়া বুদ্ধের আদেশ পালন করেন তিনি বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া শান্তি ও নির্ব্বাণানন্দ উপভোগ করেন।

উলঙ্গ হইয়া ভ্রমণ, জটা ধারণ, ভস্ম লেপন, ভূমি-শয়ন, এ সকলি নিষ্ফল যতক্ষণ অন্তরে বাসনানল প্রদীপ্ত রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণ কে? ৩৯১, ৩৯৬, ৩৯৯, ৪০১, ৪২২

জটাজূট ধারণ করিলে ব্রাহ্মণ হয় না, ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণ হয় না, যাঁহাতে ন্যায় সত্য অধিষ্ঠান করে তিনিই ব্রাহ্মণ।

রে মূর্খ! জটাধারণে কি ফল? অজীন বসন পরিয়া কি লাভ? ভিতরে লোভ ভরপূর, বাহিরের চাকচিক্যে কি হইবে?

যিনি লোভী ও অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ জন্মিয়াই তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। যিনি নির্ধন অথচ বিষয় সুখে নির্লিপ্ত তিনিই ব্রাহ্মণ।

তিনিই ব্রাহ্মণ যিনি সকল শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া নির্ভয় হইয়াছেন—যিনি মুক্ত ও স্বাধীন।

যিনি বিনাদোষেও দণ্ড তিরস্কার অবমাননা অকাতরে সহ্য করেন, ক্ষমা যাঁর বল, তিতিক্ষা যাঁর সেনা, তিনিই ব্রাহ্মণ।

যিনি পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায়, সূচি অগ্রে সরিশার বীজের ন্যায় সংসারের সুখ দুঃখে নির্লিপ্ত থাকেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

৩৯১। মনোবাক্ কর্ম্মে যিনি দুষ্কৃত শূন্য, এই তিনেতেই যিনি সংবৃত ও শুদ্ধাচারী তিনিই ব্রাহ্মণ

মনোবাক্যে কর্ম্মে যাঁরা
না করেন পাপ-আঁচরণ
তাঁহারাই তপস্বী, তপস্যা নহে
দেহের শোষণ——ব্রাহ্মধর্ম্ম

জন্মিয়া যিনি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি না—সে ত ধনবান্, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে ভো ভো বলিয়া বেড়ায় (ভো-বাদী); কিন্তু যিনি আসক্তি হীন অকিঞ্চন তিনিই ব্রাহ্মণ।

রাগ দ্বেষ মদমাৎসর্য্য সূচি অগ্রে সরিশার বীজের ন্যায় যাঁহা হইতে পাতিত হইয়াছে তিনিই ব্রাহ্মণ।

যস্‌স রাগো চ দোসো চ মানো মক্‌খো চ পাতিতো
সাসপো রিব আরগ্‌গে তমহ ব্রূমি ব্রাহ্মণং

যিনি সংসারের মোহময় দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যিনি ধ্যানশীল অকপট শুদ্ধ-ভাষী অনাসক্ত সন্তুষ্ট চিত্ত তিনিই ব্রাহ্মণ।

আদিত্য দিবসে দীপ্তি পান, চন্দ্রমা রাত্রে প্রকাশ পান,

ক্ষত্রিয়ের তপস্যা কবচ ধারণ, ব্রাহ্মণের তপস্যা ধ্যান, বুদ্ধ অহো-রাত্রি স্বকীয় তেজে প্রকাশিত।

ব্রাহ্মণ কি না বাহিত পাপ, শমচর্য্যা হইতে শ্রমণ, যিনি মালিন্য পরিবর্জন করেন তিনি পরিব্রাজক।

যিনি আপনার পূর্ব্ব নিবাস জানেন, স্বর্গ নরক দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখিতে পান, যাঁর জন্মবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, সত্ত্বগুণের আধার যে মুনী তিনিই ব্রাহ্মণ।

নির্ব্বাণ—

নত্থি রাগসমো অগ্গি নত্থি দোস সমো কলি
নত্থি কথন্ধাদিসা দুকৃথা নত্থি সন্তিপরং সুখং
জিঘচ্ছা পরমা রোগা সঙ্খার পরমা দুখা
এতং ঞত্বা যথা ভূতং নির্ব্বাণং পরমং সুখং
আরোগ্য পরমা লাভা সন্তুট্টি পরমং ধনং
বিস্সাস পরমা ঞাতী নির্ব্বাণং পরমং সুখং

রাগ সমান অগ্নি নাই, হিংসার ন্যায় পাপ নাই,
শরীরের ন্যায় দুঃখ নাই, শান্তির ন্যায় সুখ নাই।
হিংসা পরম ব্যাধি, সংস্কার পরম দুঃখ, নির্ব্বাণ
পরম সুখ, যিনি এই জানেন তিনি সত্য জানেন।

আরোগ্য পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন,
বিশ্বাস পরমাত্মীয়, নির্ব্বাণই পরম সুখ।
সন্তোষ সুখের মূল ইথে নাহি ভুল
অসন্তোষই যত কিছু অসুখের মূল।

অন্ত কভু নাহি জানে দুরন্ত পিয়াস,
সন্তোষ কেবলি এক সুখের নিবাস।
ক্ষমাই পরম শান্তি, ধর্ম্মই কল্যাণ মূর্ত্তিমান,
বিদ্যাই পরম তৃপ্তি, অহিংসাই সুখের নিদান।

শরৎ কুমুদের ন্যায় আপন হাতে স্নেহ মমতা ছিঁড়িয়া ফেল, শান্তি মার্গ অনুসরণ কর; সুগত (বুদ্ধ) নির্ব্বাণ রূপ সুগতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

যিনি দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখনাশ, দুঃখান্তকারী অষ্টাঙ্গ মার্গ, এই চতুরার্য্য সত্য সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হন, তিনি ক্ষেম পদ, পরম শরণ লাভ করেন। এই শরণ লাভ করিয়া জীব সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হয়েন।

এই সকল শাস্ত্র ভিন্ন অনেকানেক ভাষ্য, টীকা, গাথা, ইতিবৃত্ত ব্যাকরণাদি পালি ও সিংহলী ভাষায় বিরচিত হইয়াছে। ভাষ্যকারের মধ্যে বুদ্ধ ঘোষের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইনি বৌদ্ধদের সায়নাচার্য্য। বুদ্ধগয়ায় ব্রাহ্মণকুলে ইঁহার জন্ম—রেবত নামক এক মহাস্থবিরের উপদেশে ইনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইঁহার ঘন ঘোর কণ্ঠরব বুদ্ধের অনুরূপ কল্পনায় 'বুদ্ধঘোষ ইঁহার নামকরণ হয়। এই বৌদ্ধাচার্য্য চূড়ামণি পঞ্চম খৃষ্টাব্দে সিংহলে গমন করত রাজা মহানামের রাজত্ব কালে অনুরাধাপুরে বাস করেন (খৃঃ ৪১০—৪৩২) ও তথায় ত্রিপিটকের মহাভাষ্য (অর্থকথা) রচনা করেন। তাঁহার প্রণীত 'বিশুদ্ধি মার্গ', ধর্ম্মপদ-ভাষ্য, ও বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক অন্যান্য অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

মিলিন্দ প্রশ্ন।—

যবনরাজ মিলিন্দ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেন, ধর্ম্ম বিষয়ে ইঁহাদের পরস্পর কথোপকথন। খৃষ্টাব্দের দ্বিশতাব্দী পূর্ব্বে এই গ্রীক রাজের রাজত্বকাল। বুদ্ধঘোষের গ্রন্থে মিলিন্দ প্রশ্নের উল্লেখ আছে অতএব ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে গণনীয়। খৃষ্টাব্দের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থ রচনার কাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

দ্বীপবংশ এবং মহাবংশ।—

সিংহলের দুই প্রখ্যাত পালি গ্রন্থ। এই গ্রন্থদ্বয় খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দে বিরচিত ও ইহাদের মধ্যে সিংহলের ধারাবাহিক ইতিহাস এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিবৃত্ত আদ্যোপান্ত লিখিত আছে।

দাক্ষিণাত্যের হীনযান বৌদ্ধ শাস্ত্র উত্তর দেশীয় মহাযানীদের সর্ব্বাংশে গ্রাহ্য নহে। তাঁহারা ত্রিপিটক মান্য করেন বটে কিন্তু তাহার উপরে নিজস্ব অনেক ধর্ম্ম ও দর্শনতত্ত্ব যোগ করিয়া দেন, সে সমস্ত অধিকাংশ সংস্কৃতে রচিত। চীন ও জাপান দেশীয় বৌদ্ধদের মধ্যে যে গ্রন্থত্রয় সমধিক আদরণীয় তাহা

সুখাবতী ব্যূহ—দুইভাগ

অমিতায়ুর্ধ্যান সূত্র

দুই ব্যূহের একটী 'সুখাবতী' স্বর্গবর্ণনা, অন্যটি অমিতাভের স্বর্গ বর্ণনা, স্বয়ং বুদ্ধ তাঁহার শেষ বয়সে এই গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অমিতায়ুর্ধ্যান সূত্রে রাজা অজাতশত্রুর জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহার প্রতি উপদেশ আছে।

বজ্রচ্ছেদিকা নামক মায়াবাদ গ্রন্থখানি জাপানে বহু আদরের বস্তু, বুদ্ধের মুখ হইতে ইহার ধর্ম্মোপদেশ উদ্গীরিত। "সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক" প্রভৃতি অপরাপর সংস্কৃত গ্রন্থ উত্তর শাখার অন্তর্গত।

ললিত বিস্তর। –

ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা ছাড়া বুদ্ধ-জীবনী সংক্রান্ত এই গ্রন্থখানি উল্লেখ যোগ্য। ইহা সংস্কৃত গদ্য পদ্য বিরচিত, পদ্য ভাগ প্রাচীনতর বোধ হয়; আর ইহার মধ্যে কতকগুলি অধিকতর প্রাচীন পালি গাথা সন্নিবেশিত। এই গ্রন্থ তিব্বতী ও চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ফরাসী পণ্ডিত ফুকো (Foucaux) এই তিব্বতী অনুবাদের ফরাসী অনুবাদ করেন। তাঁহার মতে তিব্বতী অনুবাদের কাল ষষ্ঠ শতাব্দী। চীনদেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে এই গ্রন্থ ৭৬ খৃষ্টাব্দে চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। তাহা হইলে খৃষ্টাব্দ প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই ঐ গ্রন্থ প্রচারিত ছিল বলিতে হয়। ললিত বিস্তরে বুদ্ধের জন্ম হইতে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ পর্য্যন্ত জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। গ্রন্থখানি পণ্ডিত প্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক কলিকাতায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

এতদ্ভিন্ন তিব্বতী শাস্ত্র, সংখ্যা ভার ও বিস্তৃতি হিসাবে, এমনি প্রকাণ্ড ব্যাপার যে অন্যান্য দেশের সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র অতিক্রম করিয়া উঠে। কিন্তু উহাদের কোনটা মৌলিক গ্রন্থ নহে, পালি ও চীন ভাষা হইতে অনুবাদিত।

পালি ভাষা।—

ভারতবর্ষীয় ভাষাবলী সামান্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) আর্য্য ভাষা; (২) দ্রাবিড়, (৩) অপর ভাষা। যে প্রকার ভাষায় ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্র সমুদায় বিরচিত হয়, সেই যে বৈদিক সংস্কৃত ও যাহা কিছু কিছু রূপান্তর হইয়া উত্তর কালে সাহিত্য কাব্যের ভাষা, রামায়ণ মহাভারত মনু-সংহিতা কালিদাসের ভাষা—লৌকিক সংস্কৃত হইয়া দাঁড়ায়, সেই সুপ্রাচীন আর্য্যভাষা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া পালি ও প্রাকৃত ভাষা সমুদায় উৎপন্ন হয়; সেই সমস্ত পুনরায় ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া অধুনাতন হিন্দী বাঙ্গলা মারাটী, গুজরাতী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ ভাষায় পরিণত হইয়াছে, একথা প্রধান প্রধান ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এবং এতদ্দেশীয় আচার্য্যেরাও প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সমস্ত চলিত দেশভাষার প্রসূতি প্রাচীন প্রাকৃত, ইহার ব্যাকরণ কাব্য সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ সকল আমাদের হস্তগত হইয়াছে; এই প্রাচীন প্রাকৃত এখন আমাদের নিকটে সংস্কৃতের ন্যায় পণ্ডিতদের পাঠ্য ভাষা, মৃতভাষা হইয়া পড়িয়াছে। পালি এই প্রাচীন প্রাকৃতের শাখা বিশেষ। গৌতমের অভ্যুদয় কালে পালি এবং মাগধী সম্ভবতঃ একই ভাষা ছিল। কাত্যায়নী যিনি পালি ভাষার প্রথম ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন তিনি প্রকারান্তরে তাহাই বলিয়াছেন। এই মাগধী পরিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দি, বাঙ্গলা, বেহারী ও অন্যান্য উপভাষার রূপ ধারণ করিয়াছে কিন্তু পালির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। গৌতমের সময় তাঁহার ভ্রমণক্ষেত্রে সম্ভবতঃ এই ভাষা অথবা ইহার

অনুরূপ কোন ভাষা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রের মূল গ্রন্থাবলী এই ভাষায় বিরচিত। অশোকের অনুশাসন গুলি যে ভাষায় প্রচারিত তাহার মধ্যে পরস্পর কিছু কিছু বিভিন্নতা সত্বেও মোটা মুট সে ভাষা পালি বলা যাইতে পারে। এই পালিভাষা ব্যাকরণ নিয়মে ও সুবিস্তীর্ণ বৌদ্ধ শাস্ত্রে বদ্ধ হইয়া চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িল ও মৃতভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। একদিকে সংস্কৃত, অপর দিকে আধুনিক প্রাকৃত, পালি এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী। বৈদিক সংস্কৃত ছাড়িয়া দিলে ইহা ভারতের প্রাচীন ভাষার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। সম্প্রতি এই মহানগরীতে পালি শিক্ষার উপযোগী একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার মহাবোধি সমাজ হইতে প্রস্তাব হইতেছে, সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাত্রেরই প্রণিধান যোগ্য। কি ভাষা-তত্ত্ব, কি তত্ত্ব-বিদ্যা, কি আদি বৌদ্ধধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, কি বুদ্ধের জীবনবৃত্ত ও উপদেশ, কি তৎকাল-বর্ত্তী ভারতের ইতিবৃত্ত ও সামাজিক অবস্থা ইহাদের যে কোন বিষয় বলুন তার সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পালি ভাষা শিক্ষা ও আয়ত্ত করা অতীব প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার মূল প্রস্রবন যখন মাগধী তখন পালি আয়ত্ত করা যে আমাদের পক্ষে সহজ সাধ্য তাহা বলা বাহুল্য।

সংস্কৃতের অপভ্রংশে যে সকল প্রাকৃত উৎপন্ন হয় তাহা আর্য্যাবর্ত্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে।

প্রচলিত আর্য্য দেশ-ভাষা গুলি নিম্নলিখিত রূপে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে।

১। পশ্চিম শাখা

(ক) উত্তর পশ্চিম শ্রেণী

		লোক সংখ্যা
সিন্ধী		২৫,৯০,০০০
কাশ্মীরী		৪০,৯০,০০০
	(খ) মধ্য-পশ্চিম শ্রেণী	
পঞ্জাবী		১,৭৭,২০,০০০
গুজরাটী		১,১০,৬০,০০০
রাজপুতানী		১,৩১,৫০,০০০
হিন্দি		৩, ৫৮,২০০০০
	(গ) উত্তর শ্রেণী	
পাহাড়ী		১১,৫০,০০০
নেপালী		৩০,২০,০০০
	প্রাচ্য শাখা	
	(চ) মধ্য প্রাচ্য শ্রেণী	
বৈশ্বারী		২,০০,০০,০০০
বিহারী	” ”	৩,০০,০০,০০০
	(ছ) দক্ষিণ শ্রেণী	
মারাঠী	” ”	১,৮৯,৩০,০০০
	(জ) প্রাচ্য শ্রেণী	
বাঙ্গলা	” ”	৪,১৩,৪০,০০০
আসামী	” ”	১৪,৪০,০০০
উড়িয়া	” ”	৯ ,১০,০০০
		২০,৯৩,২০,০০০

এই সকল উপভাষার মূল যে প্রাকৃত তাহাও দেশ ভেদে বহুরূপী হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব খণ্ডে (দক্ষিণ বেহারে) পালি ও মাগধী ; পশ্চিমে অর্থাৎ গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থানে সৌরসেনী। এই দুই প্রদেশের মধ্যভাগে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত তাহা ঐ উভয় ভাষার সম্মিশ্রণে 'অৰ্দ্ধ মাগধী' নামে অভিহিত। এই আর্য্য ভাষা গুলির বহির্ভূত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত যে ভাষা তাহা 'অপভ্রংশ' বলিয়া পরিচিত। প্রাকৃতের এই চতুরঙ্গ হইতে আধুনিক গ্রাম্য ভাষা সমুদায় বিনিঃসৃত। অন্যান্য প্রাকৃতের সঙ্গে পালি ভাষার কিরূপ সম্বন্ধ তাহা নিম্নলিখিত লাতিকা দৃষ্টে অনায়াসে বোধ গম্য হইবে।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যভাষা লতিকা।
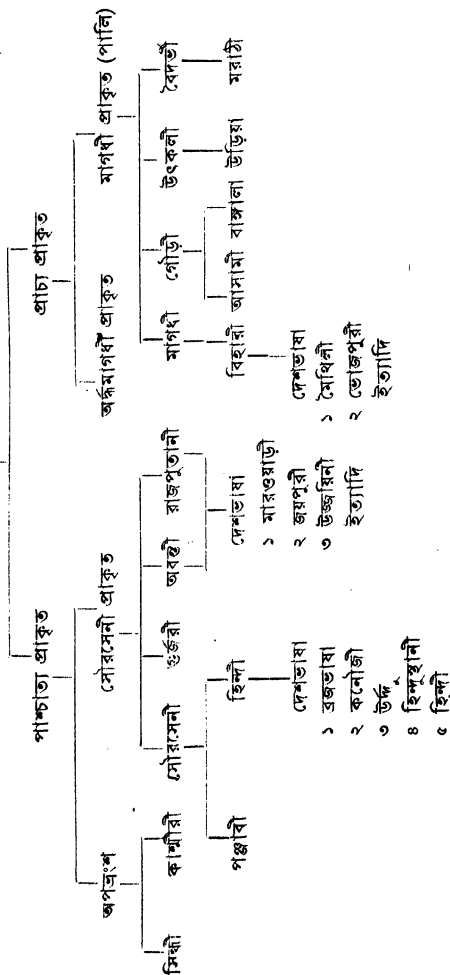
* এই লতিকা Calcutta Review পত্রের Oct. 1895 সংখ্যায় প্রকাশিত Grierson's Indian Vernaculars প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর ও বিকৃতি।

মহাযান ও হীনযান।—

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান দুই শাখা হীনযান ও মহাযান, ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই দুই শাখার সৃষ্টি হয় নাই। রাজা কণিষ্কের সময় হইতে এই প্রভেদের সূত্রপাত হয়। তিনি সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে পালি যেমন শাস্ত্রীয় ভাষারূপে গৃহীত হইল তিনি সেরূপ না করিয়া সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র রচনার আদেশ করিলেন এবং সেই আদেশানুসারে তাহার জালন্ধর সভায় বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষ্যত্রয়, ১। সূত্র পিটকের উপদেশ, ২। বিনয়-বিভাষা-শাস্ত্র, ৩। অভিধর্ম্ম-বিভাষা-শাস্ত্র, সংস্কৃতেই বিরচিত হয়। কণিষ্কের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্র মহাযান নামে অভিহিত এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ মত হীনযান বলিয়া পরিগণিত। দক্ষিণের বৌদ্ধরা এই নামে আপনাদের পরিচয় দিতে প্রস্তুত কি না বলিতে পারি না—বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মপাল এ বিষয়ের খাঁটী খবর বলিতে পারেন। সে যাহা হউক, 'মহাযান' 'হীনযান'

এই নাম-করণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে মহাযানীরা হীনযানকে নিকৃষ্ট পন্থা বিবেচনা করেন ও তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে মনুষ্যের সদ্গতি-সাধন পক্ষে মহাযানই উত্তম সাধন। মহাযান মত যে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে প্রচারিত হয় তাহা বলা যায় না, ঐ প্রদেশেও হীনযান মতাবলম্বী লোক দেখিতে পাওয়া যায়; আবার দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধেরাও অনেকে কণিষ্কের প্রভাবে মহাযান মত গ্রহণ করেন। তবে এই কয়েকটী ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে সামান্যতঃ বলা যাইতে পারে যে সিংহল শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে হীনযান মত প্রচলিত; চীন, জাপান, নেপাল, তিব্বতীয় উত্তর-বাসীগণ মহাযান মতাবলম্বী। অশ্বঘোষ, বসুমিত্র, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা মহাযান মতের প্রধান পোষক ছিলেন। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, আমার মতে নামকরণ উল্টা হইয়াছে। বুদ্ধোপদিষ্ট মূল ধর্ম্মের আভাস যদি কোথাও থাকে তাহা পালি ধর্ম্মশাস্ত্রে থাকাই সম্ভব, আর হীনযান মত যদি সেই শাস্ত্র-সম্মত হয় তাহা হইলে ঐ মতটীই আদিম ধর্ম্মের অনুযায়ী হওয়া সম্ভব। উহারই নাম "মহাযান" হওয়া সঙ্গত বোধ হয়।

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম।—

বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পদে পদে প্রতিভাত হয়; বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষায় মহাযান শাস্ত্র রচনা ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ উভয় ধর্ম্মের সম্মিশ্রণ ও একীকরণ আরো ঘনীভূত হইয়া আসে। বৈদিক

দেবতা অগ্নি ইন্দ্রাদি বৌদ্ধ দেব-রাজ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্র অনেক সময় মর্ত্ত্যলোকে নামিয়া আসিয়া সাধু পুরুষদের ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করেন। পৌরাণিক ত্রিমূর্ত্তি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এই তিন দেবতা ও বৌদ্ধদের মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। মহাব্রহ্মার জন্য বৌদ্ধ দেবমণ্ডলীর মধ্যে প্রথম হইতেই আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। ব্রহ্মা সহাম্পতি বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় তাঁহার পরম হিতকারী বন্ধুরূপে সময়ে সময়ে আবির্ভূত হয়েন। বুদ্ধের মৃত্যুকালে প্রথমেই যে বিলাপধ্বনি সমুত্থিত হয় সে ব্রহ্মারই আকাশবাণী। উত্তরকালে বিষ্ণুও বৌদ্ধ দেবাসন গ্রহণ করেন। পদ্মপানি অবলোকিতেশ্বর এক প্রকার বিষ্ণু-অবতার। অধ্যাপক মোনিয়র উইলিয়ম্‌স্‌ বলেন তিনি সিংহলের বিখ্যাত নগরী ক্যাণ্ডিতে মহাবিষ্ণুর মন্দির দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বিষ্ণুদেবের এক রূপার প্রতিমা আছে। ঐ সকল স্থানে কিন্তু বিষ্ণুর অন্য অবতার কৃষ্ণের কোন নাম গন্ধ নাই। শিব তাঁহার পত্নীসহ বৌদ্ধরাজ্যে অবাধে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। শিব মহাযোগী, মহাকাল, ভৈরব ভীমরূপে এবং তাঁহার পত্নী পার্ব্বতী, দুর্গারূপে উত্তর দেশীয় বৌদ্ধদের মধ্যে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। নেপালে শিবের মন্দির এবং বুদ্ধের মন্দির পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে—এক দেবতার প্রীত্যর্থ রীতিমত পশুবলি চলে, অন্য দেবতা না জানি তাহা কি ভাবে দৃষ্টি করেন। দেবীগণের মধ্যে তারাদেবী প্রধানা, হুয়েন সাং মগধে তাঁহার মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করেন। নেপালে পঞ্চশক্তির উপাসনা প্রচলিত—বজ্রধাত্রী, লোচনা, মামকী, পাণ্ডরা, তারাদেবী এই পঞ্চদেবী। দেব-

দেবীর সঙ্গে সঙ্গে ভূত, প্রেত, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ, যক্ষ, কিন্নর গন্ধর্ব্ব, গরুড়, কুম্ভাণ্ড প্রভৃতি জীবেরাও বৌদ্ধধর্ম্মে মিশিয়া গিয়াছে।

মার।—

বৌদ্ধদের যদি কোন নিজস্ব দেবতা থাকে তাহা 'মার'। যদিও 'মার' শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিতে গেলে মৃত্যুর সঙ্গে তাহার বিশেষ যোগ, কিন্তু মৃত্যুরাজ যমের সহিত তাহার তেমন সাদৃশ্য নাই। মারকে বৌদ্ধ সয়তান অথবা পারসীদের অমঙ্গল দেবতা অহ্রিমান বলা যাইতে পারে। কতকটা শনি বা কলির প্রতিরূপ। ইঁহার এক নাম কামদেব। ইনি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করিয়া কামাদি রিপু সকল উত্তেজিত করেন। বুদ্ধত্ব পাইবার পূর্ব্বে গৌতম যখন বোধিবৃক্ষতলে যোগাসনে আসীন ছিলেন তখন 'মার' স্বীয় পুত্রকন্যা দলবল লইয়া কত ভয়, কতপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার ধ্যান-ভঙ্গে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বুদ্ধদেব যোগাসনে অটল রহিলেন, অপ্সরাগণের সহস্র মায়া পরাহত হইল। আবার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পরেও 'মার' বুদ্ধকে অশেষ কুমন্ত্রণা দিয়া ধর্ম্ম প্রচারের শুভ সংকল্প হইতে ফিরাইবার কত চেষ্টা পায়, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মধুর স্বরে ফুস্‌লাইতে থাকে "ভগবন্, আপনি অনেক সাধ্য সাধনায় এই দিব্যজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা লোকের মধ্যে প্রচারের কি ফল? সাংসারী যারা তাহারা সকলেই বিষয় মোহে মুগ্ধ, কেহই আপনার কথায় কর্ণপাত করিবে না, তাহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে

পারিবে না। আপনি বিজনে আপন মনে একা একা নির্ব্বাণানন্দ উপভোগ করুন।” বুদ্ধদেবের চিত্ত বিচলিত দেখিয়া ব্রহ্মা সহাম্পতি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিলেন ও বুদ্ধের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া নিবেদন করিলেনঃ—

দেখগো মগধ রাজ্য হ'ল ছার খার
দুরাচার, অনাচার, অধর্ম্মের স্রোতে।
প্রভু হে তারহ ভবে, খোল স্বর্গ-দ্বার,
শুনাও তোমার ধর্ম্ম, বিনাশি সংশয়,
দেখাও হে পুণ্য পথ, পবিত্র, সরল।
অম্বর-চুম্বিত গিরি লঙ্ঘিয়া যে জন
দাঁড়ায় শিখরে, দৃষ্টি প্রসারে সুদূর—
সত্যের শিখর দেশে উঠিয়াছ তুমি,
কৃপাদৃষ্টি কর প্রভু, মানবের পরে।
রোগ শোক জরা মৃত্যু গ্রাসে চরাচর।
চল তবে ধর্ম্মবীর! জয়-হস্ত তুলি
বিচর মরত মাঝে, জাগায়ে ভারতে
প্রচারো দুন্দুভি-নাদে সত্যের মহিমা,
সুর নর সবাকার পরিত্রাণ তরে।

বুদ্ধদেব ব্রহ্মার বাক্যে উৎসহিত হইয়া ধর্ম্ম প্রচারে বাহির হইলেন। 'মার' আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।

'মারে'র প্রলোভন মন্ত্রতন্ত্র এড়াইতে হইলে কচ্ছপের ন্যায় সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। বুদ্ধদেব গল্পচ্ছলে এই বিষয়ের উপদেশ দিতেন। “একটী কচ্ছপ সন্ধ্যার সময় পানার্থে নদীতীরে গমন করে। সেই একই সময়ে একটা শৃগাল তাহার আহার

অন্বেষণে যায়। শৃগালকে দেখিয়া কচ্ছপ আপন খোলার ভিতরে লুক্কায়িত থাকিয়া নির্ভয়ে জলে সন্তরণ করিতে লাগিল। কখন্ সে তাহার কোষের মধ্য হইতে গ্রীবা বাহির করিবে, শৃগাল তাহা প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু কচ্ছপ কিছুতেই তাহার কোটরের বাহিরে মুখ বাড়ায় না, শৃগাল অনেকক্ষণ বসিয়া অবশেষে শীকার ছাড়িয়া চলিয়া গেল। হে ভিক্ষুগণ! 'মার' এইরূপ তোমাদের ছিদ্রান্বষণে ফিরিতেছে—তোমাদের চক্ষুদ্বার, কর্ণদ্বার, নাসিকা জিহ্বা দেহ-মনোদ্বার কখন্ কোন্ দরজা খোলা পায় সেই অবসর খুঁজিতেছে, সন্ধি পাইলেই প্রবেশ করিবে। অতএব সাবধান! ইন্দ্রিয়দ্বারের উপর নিয়ত প্রহরী নিযুক্ত রাখ, তাহা হইলে পাপাত্মা 'মার' বিফল-প্রযত্ন হইয়া তোমাদের ছাড়িয়া দূরে যাইবে, শৃগাল যেমন কচ্ছপ হইতে দূরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।"

বুদ্ধতত্ত্ব।

আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের নিরীশ্বর কঠোর ধর্ম্মনীতি বৌদ্ধ সমাজে অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। সে ধর্ম্ম যে যে দেশে প্রবেশ করিয়াছে তাহা সেই সেই দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম ও রীতি নীতি আচার ব্যবহারের সহিত সম্মিশ্রণে নব নব রূপ ধারণ করিয়াছে। সেই আদি ধর্ম্ম কাল সহকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া কোথায় কোন্‌মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, নেপালে শৈব শাক্ত তান্ত্রিক ধর্ম্মে মিশিয়া একরূপ, তিব্বতে যাদু ভূত প্রেতে বিশ্বাস মিশ্রিত অন্যরূপ, এক ঐতিহাসিক বুদ্ধ হইতে অগণ্য কাল্পনিক বুদ্ধের সৃষ্টি প্রণালীই বা কিরূপ—সে এক

অপূর্ব্ব কথা। তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে গেলে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয় আর ঐ গ্রন্থের বিষয় সংগ্রহ ও সামান্য পরিশ্রম ও গবেষণার কার্য্য নহে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যেমন স্বয়ং নেপালে অবস্থিতি করিয়া তথাকার পুরাতন পুঁথি অন্বেষণ ও বৌদ্ধধর্ম্মের রহস্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহার মত শ্রম, অধ্যবসায় ও স্থানীয় গবেষণা ভিন্ন ওরূপ কার্য্যে ফললাভ করা অসম্ভব। সে যাহা হউক, এই স্থলে বুদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্থূল স্থূল গুটিকতক কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বুদ্ধ-কাহিনী সম্বন্ধে একটি কৌতুকজনক বিষয় বলিবার আছে তাহা বলিয়া রাখি। সে এই যে খ্রীষ্টীয় সেণ্ট মণ্ডলীর মধ্যেও বুদ্ধদেবের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সেণ্ট জোসাফৎ।

বৃত্তান্তটা এই যে জোয়ন্নস নামে একজন গ্রীক গ্রন্থকার 'বালাম ও জোসাফৎ' বলিয়া গ্রীক ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সে উপাখ্যানটী বুদ্ধ চরিতের অবিকল চিত্র। রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানেরা ঐ জোসাফৎকে আপনাদের সেণ্টরূপে আত্মসাৎ করিয়া লন; এমন কি, ২৭এ নবেম্বর তাঁহার মৃত্যুর দিন বলিয়া পালিত হইয়া থাকে। তাঁহার এই উপাখ্যান নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া এক সময়ে ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা মধ্যেও মহাসমাদরে পরিগৃহীত হয়। পরে জানা গেল এই জোসাফৎ বোধিসত্ত্বের নামান্তর, ইনি আর কেহ নন স্বয়ং বুদ্ধদেব। উল্লিখিত গ্রীক গ্রন্থকারের পিতা কালিফ আলমানসুরের

একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন, সুতরাং তিনি অষ্টম খৃষ্টাব্দের লোক। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, আমি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের মুখে এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি। পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন যে জাতক-ভাষ্য বা ললিত বিস্তর হইতে উহার অনেক স্থল রচিত হওয়া সম্ভব। "অতএব অবনিমণ্ডলে বুদ্ধের মহিমা যেমন ব্যক্তভাবে, সেইরূপ অব্যক্ত ভাবেও পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়।"

বুদ্ধতত্ত্ব—হীনযান মত।—

হীনযান ও মহাযান এই দুই শাখার মধ্যে বুদ্ধতত্ত্ব বিষয়ে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। বিষয়টীর স্পষ্টীকরণ জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের গোড়ার কথা হইতে আরম্ভ করা আবশ্যক।

বৌদ্ধধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস আলোচনা করিবার সময় বলা হইয়াছে যে ঐ ধর্ম্মে ভজন পূজনের কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম চা'ন সাধন। বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ এই যে আত্ম,-প্রভাব দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া অন্তঃকরণকে কাম, ক্রোধ, দ্বেষহিংসা মদমাৎসর্য্য হইতে বিনির্মুক্ত কর তাহা হইলেই স্বর্গাৎ স্বর্গে আরোহন করত যাত্রার চরম সীমা যে নির্ব্বাণ সেখানে গিয়া পৌঁছিতে পারিবে। নির্ব্বাণে উঠিবার চারি ধাপ ও পথের বিঘ্নকারী দশ 'সংযোজন', বন্ধন বা শৃঙ্খল * আছে। এক এক ধাপে

---

* । দশ সংযোজন (শৃঙ্খল)

১। সক্কায় দৃষ্টি, অহমিকা

২। বিচিকিৎসা, সংশয়

৩। শীলব্রত, কর্ম্ম কাণ্ডে আস্থা

উঠিতে উঠিতে এই শৃঙ্খলগুলি কিয়ৎ পরিমাণে খসিয়া যায়। যিনি প্রথম ধাপে উঠিয়াছেন তিনি 'সোতাপন্নো' (স্রোত-আপন্ন), মনুষ্যের নীচে পশ্বাদি যোনিতে তাঁহার জন্ম হয় না। দ্বিতীয় ধাপে কতকগুলি শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যায়, যিনি সেই ধাপে চড়িয়াছেন তিনি আরো উন্নত তথাপি সংসার বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই; তাঁহাকে আর একবার ফিরিতে হইবে, তিনি সকৃৎ আগামী। তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিলে কাম ক্রোধ বিচিকিৎসা প্রভৃতি পঞ্চ বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ হয় তখন সাধক 'অনাগামী' পদ লাভ করেন, তাঁহার এই মর্ত্ত্যলোকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। এই হ'চ্ছে তৃতীয় ধাপ। যিনি চতুর্থ সোপানে আরোহণ করেন তাঁহার সমুদায় বন্ধন ছিন্ন হয়, জন্মান্তর-স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধিলাভ হয়, তখন তিনি জীবন্মুক্ত (অর্হৎ)।

প্রত্যেক বুদ্ধ। —

অর্হতেরা হাজার হোক্ অপূর্ণ জীব। আধ্যাত্মিক জগতে ইঁহাদের নূতন পাখা উঠিয়াছে, ইঁহারা সবে মাত্র উড়িতে

৪। কাম

৫। প্রতিঘ, ক্রোধ

৬। রূপরাগ, বিষয় কামনা

৭। অরূপরাগ, স্বর্গ-কামনা

৮। মান, অভিমান মদ মাৎসর্য্য

৯। ঔদ্ধত্য

১০। অবিদ্যা

শিখিয়াছেন। ইঁহাদের লক্ষ্যস্থান, গম্যস্থান এখনো বহু দূর। বুদ্ধ ও ইঁহাদের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। যে মহাত্মারা ইঁহাদের অপেক্ষাও জ্ঞানধর্ম্মে উচ্চতর পদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম প্রত্যেক বুদ্ধ, অর্থাৎ তাঁহারা নিজ নিজ সাধনা ও পুণ্যগুণে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছেন, অথচ লোকমাঝে সেই জ্ঞান বিতরণে অক্ষম। তাঁহারা প্রত্যেকে আপনার মহিমাতেই আপনি বিরাজ করেন। মহাবুদ্ধের সহিত প্রত্যেক বুদ্ধের তুলনা হয় না। মহাবুদ্ধের আবির্ভাব কালে পৃথিবীতে তাঁহাদের আবির্ভাব হয় না আর তাঁহারা তথাগত, সিদ্ধার্থ, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বুদ্ধ-উপাধি ধারণের যোগ্য নহেন।

বোধিসত্ত্ব।—

প্রত্যেক বুদ্ধের উপরের শ্রেণীতে বোধিসত্ত্বকে স্থাপন করা যাইতে পারে। তিনি অব্যক্ত বুদ্ধ। বোধিসত্ত্বের ভিতরে ভিতরে বুদ্ধত্বের বীজ নিহিত আছে কালক্রমে সে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বুদ্ধত্বে পরিণত হয়। বুদ্ধেরা পূর্ব্বজন্মে বোধিসত্ত্ব ছিলেন ও ভবিষ্যতে যে বুদ্ধ সত্যধর্ম্ম পুনঃ স্থাপন করিতে উদয় হইবেন তিনি এইক্ষণে বোধিসত্ত্ব রূপে বিরাজমান।

বুদ্ধদেব।—

এই সপ্ততল গৃহের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় স্বয়ং বুদ্ধদেব আসীন। ইনিই সঙ্ঘ-স্থাপয়িতা সম্যক্ সম্বুদ্ধ সাক্ষাৎ ভগবান। ইনি এবং ইহার সমতুল্য আর আর বুদ্ধই নষ্ট ধর্ম্ম উদ্ধারের নিমিত্ত,

লোক পরিত্রাণের নিমিত্ত, সুরনরের কল্যান উদ্দেশে যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েন।

হীনযান মতে গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে সর্ব্ব শুদ্ধ চতুর্বিংশতি বুদ্ধ উদয় হইয়াছেন। বর্ত্তমান কল্পে তার মধ্যে চার জন— গৌতম শেষবুদ্ধ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ এই তিন বুদ্ধ তাঁহার অগ্রবর্ত্তী। করুণা ও মৈত্রীগুণের আধার যে মৈত্রেয় তিনি ভবিষ্যতে বুদ্ধরূপে উদয় হইবেন, এখনো তার কাল বিলম্ব আছে। ৫০০০ বৎসর পরে যখন লোকেরা নীতিভ্রষ্ট হইবে, গৌতমের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন সেই বিশ্ববিজয়ী মহাবীর জগৎ উদ্ধারের নিমিত্ত অভ্যুদিত হইবেন,। তাঁহার সে দিগ্বিজয় সৈন্য সামন্ত অস্ত্রবলে নয়, ধর্ম্ম ও প্রেম বলে। মৈত্রেয়ী এইক্ষণে বোধিসত্ত্বরূপে তুষিত স্বর্গে বাস করিতেছেন। সূত্র পিটকের অন্তর্গত 'বুদ্ধ-বংশে' গৌতম ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ বুদ্ধের জীবন বৃত্ত বর্ণিত আছে এবং জাতক-ভাষ্যে তাঁহারদের প্রত্যেকের আরও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। হীনযান শাস্ত্র এই খানেই থামিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের একবিংশতি বুদ্ধ, বর্ত্তমান ভদ্র কল্পের চারি বুদ্ধ, এবং বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ী ভাবিবুদ্ধ, এই কয়েকটী বুদ্ধ ও একটী মাত্র বোধিসত্ত্ব লইয়াই হীনযানীরা সন্তুষ্ট। অর্হৎ তাঁহাদের আদর্শ-সাধু, সাধুত্বের আরো উচ্চতর স্তরে উঠিতে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা নাই।

বুদ্ধতত্ত্ব। মহাযান মত—

মহাযানগ্রন্থে বৌদ্ধদের বুদ্ধ-কল্পনার আরো বিস্তৃত বিচিত্র গতি। হীনযানের সহিত ইঁহাদের বীজমন্ত্রে অনৈক্য নাই। ইঁহারাও

বলেন মনুষ্য জ্ঞানধর্ম্মে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া, ভিক্ষু হইতে অর্হৎ, অর্হৎ হইতে বোধিসত্ত্ব হইতে পারেন কিন্তু যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জল দাঁড়ায় কোথায়? দু একটী বোধিসত্ত্ব গড়িয়া কেনই ব' ্িয়র থাকিবে? অনেকানেক ভক্ত সিদ্ধি লাভ করিয়া অর্হৎ হইয়াছেন—অনেকানেক অর্হৎ বোধিসত্ত্ব পদে উন্নত হইয়াছেন তাঁহারা কি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র নহেন? এই মতের অব্যর্থ পরিণাম নর-দেবতা পূজা এব' ্এই পূজায় মহাযানীরা সিদ্ধ হস্ত। এই রূপে অসংখ্য অসংখ্য বো।ধসত্ত্ব মহাযানীদের আরাধ্য দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বুদ্ধের প্রথম দুই শিষ্য সারীপুত্র মুদ্গল্যায়ন; কাশ্যপ আনন্দ উপালী প্রভৃতি সঙ্ঘের পিতামহগণ; গৌতম ও রাহুল; মহাযানীদের প্রধান আচার্য্য নাগার্জ্জুন, আ।চার্য্য অশ্বঘোষ—এইরূপ কত কত সাধু সজ্জনকে তাঁহারা বোধিসত্ত্ব পদে তুলিয়া পূজা করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু তা নয়, এ দিকে যেমন মানুষী বোধিসত্ত্ব তেমনি আবার গুণাত্মক, ধ্যানাত্মক নানা ধরণের কাল্পনিক বোধিসত্ত্ব নির্ম্মিত হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ আর মৈত্রেয়ী বুদ্ধের আবির্ভাব, এই দুয়ের মধ্যকালে মনুষ্যের ত আরাধ্য দেবতা চাই—বৌদ্ধ-সঙ্ঘের রক্ষাকর্ত্তা আবশ্যক—বোধিসত্ত্বেরা এই অভাব পূর্ণ করিতেছেন। আর এক লাভ এই যে বোধিসত্ত্ব পদলাভের আকাঙ্ক্ষায় মনুষ্যের মনে ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকতর উৎসাহ সঞ্চার হইতেছে। বোধিসত্ত্বের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। ইহাঁরা তুষিত স্বর্গে দিব্য আরামে কাল-হরণ করিতেছেন। পরিনির্ব্বাণে নিবিয়া যাওয়া অপেক্ষা ইহাঁদের স্বর্গকামনা বোধ হয় যেন বলবত্তর, সুতরাং ইহাঁরা নির্ব্বাণ পথ খুঁজিয়া বেড়াইবার কষ্ট ভোগ অপেক্ষা যেমন

সুখে আছেন তেমনি থাকিতেই ভাল বাসেন।

বোধিসত্ত্বের বেলায় মহাযানীরা যেমন কল্পনার লাগাম ছাড়িয়া দিয়াছেন, বুদ্ধ বিষয়েও সেইরূপ। হীনযানীরা বুদ্ধ সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২৫ জন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন কিন্তু তাহা কেন? তোমরা স্বীকার করিতেছ লোক পরিত্রাণার্থ যুগে যুগে বুদ্ধোদয় হইয়া থাকে। তবে ২৫ কেন, কত কত লোকে, কত যুগে, কত শত বুদ্ধের অভ্যুদয় হইয়াছে কে বলিতে পারে? কেন না,

"কালোহয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী"

কালের নাহিক সীমা, বিপুলা ধরণী।

মহাযান মতানুসারে সমুদায়ে কত বুদ্ধ, স্থির করা কঠিন। হজসন সাহেব ললিত বিস্তর ও অপরাপর গ্রন্থ হইতে ১৪৩ জন তথাগতের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন।

শুধু বুদ্ধ-সংখ্যা নয় ক্রমে বুদ্ধ স্বরূপের ও অশেষ পরিবর্ত্তণ ঘটিয়াছে। পরিবর্ত্তণের প্রণালী আমার যাহা সঙ্গত মনে হয়, তাহা এই—

বুদ্ধদেব আপনাতে কখনই ঐশীশক্তি আরোপ করেন নাই; এমন কি, শিষ্যদিগের মধ্যে তাঁহাকে ঈশ্বরবিষয়ক কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিরুত্তর থাকাই শ্রেয় বোধে মৌনাবলম্বন করিয়া নিস্তব্ধ থাকিতেন। তিনি তাঁহার ধর্ম্ম এবং তাঁহার সঙ্ঘ মৃত্যুর সময় এই দুইকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ রাখিয়া গেলেন। কিন্তু পৃথিবী হইতে যেমনি তিনি অপসৃত হইলেন, তাহার কিয়ৎ পরে বৌদ্ধেরা তাঁহাকেই ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিল—মনুষ্য-বুদ্ধকে দেবতা-বুদ্ধ গড়িয়া তুলিল। তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনা, পূর্ব্বজন্মকাহিনী, স্বর্গ হইতে অবতরণ, গর্ব্ভে বাস,

জন্ম, শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনের লীলা খেলা, মহাভি-নিষ্ক্রমণ, তপশ্চর্য্যা, মারের সহিত সংগ্রাম, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, ধর্ম্ম প্রচার, নির্ব্বাণ, ইহার প্রত্যেক ঘটনা ইন্দ্রজালে সংগঠিত হইল। এই গেল প্রথমাবস্থা। পরে ভাবি বুদ্ধ যে মৈত্রেয় তাঁহার পূজাও প্রবর্ত্তিত হইল। বুদ্ধদেব ত পরিনির্ব্বাণ গত হইয়াছেন, যাইবার সময় তিনি মৈত্রেয়কেই আপন উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া যান। মৈত্রেয় এখন জাগ্রত জীবন্ত দেবতা, তাঁহার প্রসাদ-লাভ ভক্তের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। তিনি করুণার সাগর, সৌন্দর্য্যের সার, প্রিয়দর্শী, মধুরভাষী, তাঁহার তুষিত স্বর্গে গিয়া ভক্তেরা তাঁহার স্বরূপ দর্শন, মধুর বাণী শ্রবণ, তাঁহার সহবাস-জনিত আনন্দ সম্ভোগ, এই জন্য লালায়িত; উত্তর দক্ষিণ উভয় সম্প্রদায়ী বৌদ্ধেরাই তাঁহাকে মানিয়া চলিতেছে। অনেকানেক সিংহল বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধ ও মৈত্রেয়ের মূর্ত্তি পাশাপাশি অবস্থাপিত। হুয়েন সাং ও তাঁহার পূর্ব্বাপর অন্যান্য ভক্তেরা মৃত্যুশয্যায় মৈত্রেয়ের তুষিত স্বর্গলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন।

অতঃপর আমরা আর এক চিত্র দেখিতে পাই,—এক হইতে তিনে গিয়া পড়ি, মৈত্রেয় ছাড়া তিন বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব দেখি। তাঁহাদের নাম

১। মঞ্জুশ্রী অথবা বাগীশ্বর

২। পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর

৩। বজ্রপাণি কিনা শক্তিরূপী মহেশ্বর

এই জ্ঞান শক্তি মঙ্গলের আধার বৌদ্ধ ত্রিমূর্ত্তি কালেতে কল্পিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের আদি যুগে ইহাঁদের নাম শুনা যায় না, ললিত বিস্তর প্রভৃতি উত্তরশাখায় প্রাচীন গ্রন্থেও ইহাঁদের নাম

নাই, যদিও সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক ও আর কতকগুলি গ্রন্থে ইহাঁদের কথা পাওয়া যায়, আর ফাহিয়ানের তীর্থযাত্রার সময় এই ত্রিদেবতার অর্চ্চনা কোন কোন বৌদ্ধক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল, তাহাও দেখা যায়। তিনের অঙ্কে কি এক মোহিনীশক্তি আছে তাহার আদর সর্ব্বত্রই; বিশেষতঃ আমাদের দেশে ত্রয়ীবিদ্যা, ত্রিগুণ, ত্রিবর্গ, ত্রিলোক ত্রিকাল ত্রিমূর্ত্তি অনেক জিনিসেই ত্রিত্ব আসিয়া পড়ে; এমন কি, পরব্রহ্ম যিনি তিনি ও সৎ-চিৎ-আনন্দ ত্রিগুণাত্মক। বৌদ্ধদের মধ্যেও এই তিনের গৌরব রক্ষিত হইয়াছে। প্রথম, বুদ্ধ ধর্ম্ম সংঙ্ঘ ত্রিরত্ন—পরে মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর, বজ্রপাণি ত্রিদেব। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে এই তিন দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরই রূপান্তর। মঞ্জুশ্রী হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম; বাগীশ্বর বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই ত গেল ব্রহ্মা-সরস্বতী। অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বিষ্ণু, তাঁহাতে বিষ্ণুর পালনীশক্তি আরোপিত। বজ্রপাণি বজ্রধর ইন্দ্র অথবা শূলপাণি মহেশ্বর, সর্ব্বশক্তির মূলাধার। বোধিসত্ত্ব-শ্রেণীর মধ্যে অবলোকিতে-শ্বরের বিশেষ মাহাত্ম্য। তিনি করুণার্ণব, লোকপাল, সকলের শরণ্য সন্তজনীয় দেবতা রূপে বর্ণিত। ফাহিয়ান, হুয়েন সাং-দের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বৌদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার পূজার বহুল প্রচার লক্ষিত হয়। তাঁহারা নিজেও যে ঐ দেবতার পরমভক্ত ছিলেন তাহারও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। ফাহিয়ান বলেন সমুদ্রে একবার ঝড় উঠিয়া তাঁহার জাহাজ ডুবিবার উপক্রম হইয়াছিল তখন তিনি অবলোকিতেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া রক্ষা পাইলেন। চীন ও জাপানে অবলোকিতেশ্বরের করুণাময়ী নারীপ্রকৃতি ক্বান্-ইন্ এবং ক্বান্নন্ নামে অর্চ্চিত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

ইহার উত্তর কালে এক প্রকার ধ্যানীবুদ্ধের সৃষ্টি হইল. ধ্যানীবুদ্ধ মনুষ্য বুদ্ধের অশরীরি প্রতিকৃতি, তাঁহারা অরূপ-লোকে বাস করেন। পঞ্চ অরূপ-লোকের অধিষ্ঠাতা পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকে ধ্যানপ্রভাবে আত্ম-স্বরূপ হইতে এক একটী বোধিসত্ত্ব উৎসৃষ্ট করেন আবার প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব পর্য্যায়ক্রমে রূপলোক সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এইক্ষণে চতুর্থ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অধিকার যাইতেছে। আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই।

এই বহুদেবতার পূজায় পরিতৃপ্ত না হইয়া বৌদ্ধেরা ক্রমে এক আদিদেবে গিয়া পৌঁছিলেন, ইনি নিত্য, নিরাকার, ন্যায় ও করুণার আধার, জ্ঞানময় আদিবুদ্ধ—ইনিই পরব্রহ্ম। নেপালী বৌদ্ধদের মধ্যে দশম শতাব্দে এই আদি বুদ্ধের প্রতিষ্ঠা হয়। আদি বুদ্ধ ইচ্ছানুসারে আত্মস্বরূপ হইতে অন্য পাঁচটী ধ্যানীবুদ্ধ উৎপন্ন করেন। তাঁহারা আবার পাঁচটী বোধিসত্ত্বের জন্মদাতা। এই পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ, পঞ্চ বোধিসত্ত্ব এবং গৌতম, মৈত্রেয় প্রভৃতি পঞ্চ মানুষী বুদ্ধ সম্বলিত এক অপূর্ব্ব ত্রি-পঞ্চক হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ধ্যানীবুদ্ধ	বোধিসত্ত্ব	মানুষীবুদ্ধ
১ বিরোচন	১ সামন্তভদ্র	১ ক্রকুচ্ছন্দ
২ অক্ষোভ	২ বজ্রপাণি	২ কনকমুনি
৩ রত্নসম্ভব	৩ রত্নপাণি	৩ কাশ্যপ
৪ অমিতাভ	৪ অবলোকিতেশ্বর	৪ গৌতম
৫ অমোঘ সিদ্ধি	৫ বিশ্বপাণি	৫ মৈত্রেয়

দেখিবেন ইঁহাদের মধ্যে প্রকৃত ঐতিহাসিক বুদ্ধ একমাত্র গৌতম আর সকলেই মন-গড়া কাল্পনিক বুদ্ধ। এই প্রত্যেক পঞ্চকের চতুর্থ দেবতাই বাছিয়া লইবার যোগ্য। বাছিয়া বাছিয়া যে তিন দেবতা বৌদ্ধদের বিশেষ পূজার্হ হইয়াছেন তাঁহারা হচ্ছেন ১। আমিতাভ, ২। অবলোকিতেশ্বর, ৩। গৌতম। গোড়ায় অপরিমিত জ্যোতিঃ অমিতাভ, মধ্যে তাঁহার অধ্যাত্ম সুত, শেষে তাঁহার ছায়াময়ী প্রকৃতি। ধ্যানী বুদ্ধের মধ্যে কি জানি কি নিমিত্ত মঞ্জুশ্রী স্থান পান নাই। আপাততঃ ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে বৌদ্ধজগতের কোন কোন ভাগে অমিতাভই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। মহাযান শাস্ত্র তাঁহার 'সুখাবতী' স্বর্গ বর্ণনায় পরিপূর্ণ। সে স্বর্গ মহম্মদী স্বর্গের ন্যায় ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের স্থান নয়, তাহা ধ্যানস্থ মুনি ঋষির আশ্রম তুল্য। সেখানে 'হুরী' অপ্সরা তাহাদের মায়াজাল বিস্তার করে না, সেই অরূপ-লোকে জ্যোতির্ম্ময় ধ্যানী বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব-মণ্ডলে পরিবৃত হইয়া ধ্যানানন্দ উপভোগ করিতেছেন।

সহজ সত্য ছাড়িয়া কল্পনায় ঈশ্বর গড়িতে গেলে মনুষ্য-কল্পনা যে কোথায় গিয়া দাঁড়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করা যায়।

তান্ত্রিক মত প্রচার।—

মহাযান মতের উৎপত্তি ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর খণ্ডে ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধধর্ম্মের সম্মিশ্রণ আরম্ভ হয় এই যে বলা হইল, নেপাল তাহার মুখ্য দৃষ্টান্ত স্থল। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে সে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে তান্ত্রিক ক্রিয়া কাণ্ড প্রবেশ

লাভ করিয়াছে। হিন্দুদিগের যে ধর্ম্ম প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক নেপালী বৌদ্ধেরা সেই তান্ত্রিক পদ্ধতি নিজ ধর্ম্ম মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইঁহারা শিব শক্তি গনেশ, কুমার ভৈরব হনুমান, রুদ্র মহারুদ্র, মহাকাল মহাকালী, অজিতা অপরিজিতা, উমা জয়া চণ্ডী, খড়্গহস্তা, ত্রিদশেশ্বরী, ইন্দ্রী কপালিনী কম্বোজিনী, ঘোরী ঘোর-রূপ মহারূপা, মালিনী কপালমালা, খট্টাঙ্গা পরশুহস্তা, বজ্রহস্তা, মাতৃকা যোগিনী পঞ্চ-ডাকিনী, যক্ষ গন্ধর্ব্ব গৃহদেবতা, ভুত পিশাচ দৈত্য প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত দেবদেবীগণকে স্ব-সম্প্রদায়ে স্থান দান করিয়াছেন। কেবল তন্ত্রোক্ত দেবাদি গ্রহণ করিয়া নিরস্ত হন নাই, তন্ত্র শাস্ত্রের মন্ত্রাদি এবং সাঙ্কেতিক আঁক জোঁক ও গ্রহণ করিয়াছেন। ক্রিয়া স্থলে তন্ত্রোক্ত যন্ত্রমণ্ডল অঙ্কিত করিবার রীতি আছে। হিন্দু ক্রিয়াতে হিন্দুদেবতারই মণ্ডল করা হয়। বৌদ্ধ ক্রিয়াতে বুদ্ধ মণ্ডলও অঙ্কিত হইয়া থাকে। নেপালী বৌদ্ধেরা শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে অষ্টমী ব্রত নামে একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। প্রথমে বুদ্ধ বোধিসত্ব, দিকপাল প্রভৃতির পূজার পর উল্লিখিত দেবদেবীর আহ্বান ও অর্চ্চনা হইয়া থাকে। (ভারতবর্ষীয় সম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত।)

নেপালে এই তান্ত্রিকমতের আদিগুরু পেশওয়ার নিবাসী অসঙ্গ নামক একজন সন্ন্যাসী। ইনি ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া "যোগাচার ভূমি শাস্ত্র" ও যোগ-দর্শন সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ লিখিয়া উক্ত দর্শনের বহুল প্রচার করেন। হুয়েন সাং তাঁহার মঠের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া যান। তিনি শৈব দেবদেবী, ভূত, পিশাচ, বৌদ্ধ ধর্ম্মে মিলাইয়া সেই পার্ব্বত্য অধিবাসীদের উপাদেয় এক অপূর্ব্ব খিঁচুড়ী প্রস্তুত করেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রভাবে নেপালীদের মধ্যে

বুদ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত শৈব ও শাক্ত দেবদেবীর অর্চ্চনা আরম্ভ হয় এবং তাঁহারা বুদ্ধদেবের সরল নীতি মার্গ ছাড়িয়া অলৌকিক সিদ্ধি লাভ মানসে, ধারণী মণ্ডল প্রভৃতি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান অবলম্বন করেন। তাঁহাদের মঠ মন্দিরে এই সকল তান্ত্রিক দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম।—

নেপাল ভোট সিকিম ঐ সকল প্রদেশের বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন পৌরাণিক তান্ত্রিক সংস্পর্শে রূপান্তরিত হইয়াছে, তিব্বতের ধর্ম্মও অন্যান্য কারণে অশেষ কুসংস্কার জালে আচ্ছন্ন হইয়াছে। জপ-মালায় মন্ত্র উচ্চারণ তাঁহারা ধর্ম্মসাধনের এক প্রধান অঙ্গ বিবেচনা করেন; শব্দ সংখ্যার উপর পুণ্যের ফলাফল নির্ভর করে, যত বার আবৃত্তি ততই বেশী পুণ্য। আরাধনার সময় যেমন সমস্বরে শ্লোকাবৃত্তির নিয়ম আছে, তেমনি আবার ভিন্ন ভিন্ন বচন অনেকে মিলিয়া একত্রে পাঠ করিয়া থাকেন—অল্প সময়ের মধ্যে যত অধিক শব্দ উচ্চারিত হয় ততই ভাল। এই সকল বৌদ্ধের প্রার্থনা মন্ত্র হচ্ছে—

* ওঁ মণি পদ্মে হুঁ।

এ প্রার্থনা অঙ্কিত চক্রধ্বজাদি যেখানে যাও চারিদিকে ছড়াছড়ি। "পদ্মে মণি" এই দুই শব্দের যে কি নিগূঢ় অর্থ

---

* হৃৎপদ্মে ধর্ম্মের মণি! কেহ বলেন, পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রার্থনা মন্ত্র রচিত।

এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ ধর্ম্মপাল মহাশয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিবেন।

তাঁহারাই জানেন এবং তাঁহাদের বিশ্বাস যে এই প্রার্থনায় দেবতার প্রসন্নতা লাভ ও মহাপুণ্য উপার্জ্জন হয়। এই উদ্দেশে তাঁহারা অগণ্য অগণ্য প্রার্থনা-চক্র নগরে নগরে গ্রামে পথে ঘাটে যেখানে সেখানে স্থাপন করেন, পথযাত্রীরা তাহা এক একবার ঘূরাইয়া প্রার্থনার ফললাভ করেন। কল ফিরাইয়া প্রার্থনা করা, তিব্বতীরা এই এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই চক্র ঘোরানো লইয়া অনেক সময়ে দুই প্রতিযোগী ভক্তদলের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়া যায়। জনকতক ফরাসী খৃষ্ট মিসনরি এই বিষয়ের এক মজার গল্প করেন। একদিন তাঁহারা এক মঠের নিকটস্থ একটী প্রার্থনা চক্রের কাছ দিয়া চলিয়া যাইতে-ছেন, এমন সময় দেখিলেন দুই জন লামার মধ্যে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত। ব্যাপারখানা এই যে তাঁহাদের একজন চাকা ঘূরাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া যাইতেছেন, মুখ ফিরাইয়া দেখেন আর একজন লামা সে চাকা থামাইয়া নিজের খাতায় পুণ্যের আঁক পাড়িবার অভিপ্রায়ে চাকা ঘূরাইয়া দিতেছে, দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পিছু ফিরিয়া তার চাকা বন্ধ করিয়া পুনর্ব্বার আপনি ফিরাইয়া দেয়। এ বলে আমি ঘুরাইব, আমার চাকায় তুমি কেন হাত দেও? ও বলে আমি ঘুরাইব তুমি কেন হাত দেও? ক্রমে উভয়তঃ গালাগালি, গালাগালি হইতে মারামারি। অবশেষে একজন বৃদ্ধ লামা বিবাদ স্থলে আসিয়া উভয় পুণ্যেচ্ছুর কল্যাণার্থ স্বহস্তে চাকা ঘূরাইয়া উহাদের কলহ মিটাইয়া দেয়। Buddhism—Monier Willlams.

প্রার্থনা-চক্র ভিন্ন ঐ সকল প্রদেশে প্রার্থনার নিশান উড়িতে দেখা যায়—বোধ করি দার্জিলিং পাহাড়ে ঐ দৃশ্য অনেকে দেখিয়া

থাকিবেন; নিশান বাতাসে উড়িয়া যেমন আকাশাভিমুখে যায় ভক্তজন অমনি মন্ত্রোচ্চারণের পুণ্য উপার্জ্জন করেন।

লামাধর্ম্ম।—

তিব্বতী বৌদ্ধদের আচার অনুষ্ঠান মতও বিশ্বাস, মূল ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন বিষয়েই মিল নাই; উহাদের পৌরোহিত্য-প্রধান জনসমাজও স্বতন্ত্রভাবে গঠিত। তিব্বতী ভিক্ষুর নাম লামা, জনপদের প্রায় পঞ্চমাংশ এই লামা শ্রেণীভুক্ত। লামাদের মধ্যে দুই জন প্রধান লামা, দালাই লামা এবং পঞ্চন লামা; একটীর রাজধানী লহাসা, অন্য লামার মঠ ভারতের প্রান্তসীমার অদূরবর্ত্তী তাসি-লূনপো নামক নগরে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান লামারা বুদ্ধাবতার বলিয়া পূজিত। লোকের বিশ্বাস এই যে ইহাঁদের কাহারও মৃত্যু হইলে, তাঁহার প্রেতাত্মা কোন একটী শিশু অথবা ছোট বালকে প্রবেশ করে, এই বালকটীকে চিনিয়া বাহির করাই এক সমস্যা। কখন কখন মৃতলামা মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া যান কোন্ কুলে তিনি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিবেন; কখন বা দুই লামার মধ্যে যিনি জীবিত তিনি মৃত লামার উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া দেন, কখন বা দৈবজ্ঞের পরামর্শ, শাস্ত্রের বিধান ও অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা মঠাধিকারী লামা নিরূপিত হয়। এই নির্ব্বাচনে চীনরাজেরও মতামত গৃহীত হইয়া থাকে। নবাবতার আবিষ্কৃত হইলে লামামণ্ডলীর কাছে আনিয়া তাঁহার পরীক্ষা হয়; তিনি মৃত লামার গ্রন্থ বস্ত্রাদি চিনিয়া বলেন, ও তাঁহার পূর্ব্বজীবন ঘটনা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলীর উত্তর দেন। পরীক্ষোত্তীর্ণ মহালামা মহাধুমধামে নিজ মঠে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

দালাই লামা আদি বুদ্ধের প্রতিনিধি; তাঁহাকে বৌদ্ধ

'পোপ' বলা অসঙ্গত হয় না। অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পর পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে (১৪১৯ এ) তিব্বতে দালাই লামার আধিপত্য স্থাপিত হয়। এই লামা বিদেশীদের চক্ষে আকাশ কুসুমের ন্যায় দুর্লভ দর্শন। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন যে কয়েক বৎসর হইল (১৮৮২) আমাদের খ্যাতনামা পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস এই লামার সাক্ষাৎকার লাভ করেন; এ ঘটনাটি আমাদের সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ শরৎ বাবুর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে। মোনিয়র উইলিয়মসের 'বৌদ্ধধর্ম্ম' গ্রন্থে ৩৩১ পৃষ্ঠায় তাহার সারভাগ সন্নিবেশিত হইয়াছে। লামার প্রাসাদ-মঠ লহাসার উত্তরপশ্চিম পোতালায় অবস্থাপিত। ইহা এক প্রকাণ্ড উচ্চ চৌতালা গৃহ, দশ সহস্র ভিক্ষুর বাসোপযোগী কক্ষরাজিতে সুসজ্জিত; ইহার শিখরদেশ স্বর্ণ চূড়ায় বিভূষিত। সিঁড়ির পর সিঁড়ি উঠিয়া পরিব্রাজক মহাশয় লামা মঞ্চে আরোহণ করিলেন, সেই লোহিত প্রাসাদের উচ্চ শিখর হইতে লহাসা নগরী ও তাহার আশপাশের শোভা সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহার নয়ন মন মুগ্ধ হইল। মহালামা ৮ বৎসরের বালক, বক্র চক্ষু ছাড়া মুখশ্রী আর্য্যাকৃতি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, রঙ্গীণ রেশম মণ্ডিত সিংহাসনে দুই সিংহমূর্ত্তি মাঝে উপবিষ্ট। দেহোপরি গৈরিক বসন, মাথায় পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের নিদর্শন স্বরূপ পঞ্চকোণ পীতবর্ণ টোপর। প্রাচীরের গায়ে বুদ্ধ বোধিসত্ত্বের চিত্রাবলী, জাফ্রাণ রঞ্জিত আরক্ত শান্তিজল সিঞ্চন, ধূপধুনা দীপালোক আনুষ্ঠানিক ঘটার সীমা নাই। দর্শকমণ্ডলীর জন্য নীচে নয় পংক্তিতে সারিসারি পশমের আসন বিছানো, সকলে শান্ত সংযত ভাবে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিলেন। শরৎ বাবুর আসন তৃতীয় পংক্তিতে।

পরে আশীর্ব্বাদের সময় আসিলে দর্শকবৃন্দ মাথা হেঁট করিয়া সিংহাসনের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িল। শরৎ বাবু বলিতেছেন “যখন আমার পালা আসিল মহাপ্রভু আমাকেও আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন আমি তাঁহার দেবমূর্ত্তি দর্শন করিবার সুযোগ পাইলাম।” এই বিবরণে পোপের পদাঙ্গুলি চুম্বনের ন্যায় কোন অনুষ্ঠানের আভাস নাই। এই অনুষ্ঠানের এক প্রধান অঙ্গ—চা-পান। লামারা সকলেই এক এক চায়ের পেয়ালা আপন বস্ত্র মধ্যে গচ্ছিত রাখেন। প্রথমে একজন পরিচারক মহালামার স্বর্ণ পাত্রে চা ঢালিয়া পাত্র পূর্ণ করিয়া দিল, পরে দর্শকগণের পাত্র পূর্ণ হইলে তাঁহারা তিনবার পাত্র নিঃশেষ করিয়া নিঃশব্দে পান করিলেন, পরে শূন্য পেয়ালা বক্ষের পকেটজাত করিলেন। তৎপরে একটী তণ্ডুলপূর্ণ স্বর্ণথাল মহালামার সম্মুখে আনীত হইল, তিনি তাহা স্পর্শ করিয়া দিলে, সেই মহাপ্রসাদ দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইল। পরিশেষে বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘ, এই ত্রিরত্নের নামে আশির্ব্বাদ উচ্চারণের পর দরবার ভঙ্গ হইল। সভাস্থলে একজন লামা যিনি শরৎ বাবুর পাশে বসিয়াছিলেন তিনি তাঁহার কানে কানে কহিলেন, “তুমি পূর্ব্বজন্মে না জানি কি পাপ করিয়া এমন দেশে জন্মিয়াছ যেখানে জীবন্ত বুদ্ধ নাই!

তিব্বতের দালাই লামার অধিকার ধর্ম্মরাজ্যেই আবদ্ধ অথবা এই সঙ্গে তাঁহার কোন রাজকীয় ক্ষমতা সম্মিশ্রিত, এই বিষয় লইয়া এইক্ষণে অনেকস্থানে অনেক কথা শুনা যাইতেছে। সম্প্রতি রুষ সম্রাটের নিকট তাঁহার যে দৌত্য গিয়াছে তাহাই এই সমস্ত তর্ক বিতর্কের মূল এবং তাহা হইতে

আমাদের রাজপুরুষদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। মেষ ভল্লুকে মিত্রতা-বন্ধনের চেষ্টা দেখিলে লোকের মনে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। "ঊনবিংশ শতাব্দী" সংবাদ পত্রে একজন ইংরাজ লেখক দালাই লামাকে বশ করিবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলেন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কৃষ্ণা জিলায় যে বুদ্ধ দন্তাদি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা উপহার দেওয়া বেস একটী লামা বশীকরণ মন্ত্র। আমাদের বিবেচনায় আর কোন উপায় চিন্তা করা আবশ্যক, যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে কোন ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে সং খাপা নামক একজন ধর্ম্ম সংস্কারক উঠিয়া গাল্‌ডানে এক প্রকাণ্ড মঠ নির্ম্মান করেন। এই লামার মৃত্যুর পর ইঁহার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে এক দীপাবলির উৎসব প্রবর্ত্তিত হয়। ইনিও বুদ্ধাবতার বলিয়া পূজিত এবং বৌদ্ধ মন্দিরে ইঁহার প্রতিমূর্ত্তি দালাই ও পঞ্চন লামা-প্রতিমূর্ত্তির মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত। এ ভিন্ন আরো কয়েক জন লামা-গ্রগণ্য মহালামা আছেন, যথা মোঙ্গোলিয়ার কুরুণ, তাতারের কুকু, পেকিনের মহালামা, ভোটের ধর্ম্মরাজ, যাঁহার উপাধিচ্ছটা আবৃত্তি করিতে কণ্ঠ-রোধ হয়—"বুদ্ধশ্রেষ্ঠ, দেবাবতার, শাস্ত্রজ্ঞানে অনুপম, বিদ্যায় সরস্বতী সম, পাপ-হরণ, দানব-মর্দ্দন, নীতি-নিপুণ, সর্ব্বধর্ম্মশিরোমণি রাজাধিরাজ ধর্ম্মরাজ!"* নামাবলির গৌরবে গৌতম বুদ্ধকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন।

স্বর্গ নরক।—

বৌদ্ধশাস্ত্রে স্বর্গ নরক কল্পনা এইরূপ।—

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ড চক্রবালে পরিপূরিত। প্রত্যেক চক্রবালে ছয় প্রকার জীবের বাসযোগ্য ৩০ টী সত্বলোক স্তরে স্তরে বিনির্ম্মিত, তাহাদের মধ্যভাগে সুমেরু পর্ব্বত। পাতালে ১৩৬ নরক বিভিন্ন জাতীয় পাতকী কুলের জন্য নির্ম্মিত, তাহাদের মধ্যে বুদ্ধ দ্বেষ্টাদের জন্য 'অবীচি' নরক সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। নরকবাস সুদীর্ঘ কাল হইলেও অনন্ত নরক ভোগের বিধান নাই। নরকের উপরিভাগে কামলোক চার প্রকার ১। পশু-লাক; ২। প্রেত-লোক, ৩। অশুর-লোক, ৪। নর-লোক। তদুপরি ছয় দেব লোক। প্রথম, চার মহারাজা (দিক্‌পালের) স্বর্গ—

পূর্ব্বদিকে, গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র।
দক্ষিণে, কুম্ভাণ্ডরাজ বিরূধক ।
পশ্চিমে, নাগাধিরাজ বিরূপাক্ষ।
উত্তরে ধনপতি কুবের।

দ্বিতীয়, ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ, ইন্দ্রের অমরাপুরী, যেখানে ইন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতাদের সনে রাজত্ব করেন। বুদ্ধ জননী মায়া-দেবীর মৃত্যুর পর বুদ্ধ তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে এই স্বর্গে আরোহণ করেন। তাহা ছাড়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বুদ্ধ নিজেই ইন্দ্র ছিলেন।

তৃতীয়, যমলোক

চতুর্থ, তুষিত স্বর্গ, বোধিসত্ত্ব-ধাম, মৈত্রেয় যার অধিপতি।

পঞ্চম, নির্ম্মাণ রতি স্বর্গ, সৃষ্টি কুশল দেবতাদের বাসগৃহ।

ষষ্ঠ, পর নির্ম্মিত বাসবর্ত্তী স্বর্গ, এখানে যাঁহারা বাস করেন সৃজন কার্য্যে তাঁহাদের নিজেদের ক্ষমতা নাই, তাঁহারা অপর

দেবগণের সৃষ্টি-ভণ্ডুলে বিলক্ষণ পটু—বৌদ্ধ সয়তান "মার" এই লোকে বাস করেন। এই ছয় দেব লোকের তালিকা।—

ক

১। চতুর্মহারাজ স্বর্গ

২। ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ

৩। যম স্বর্গ

৪। তুষিত স্বর্গ

৫। নির্ম্মাণ রতি দেবগণের স্বর্গ

৬। পর নির্ম্মিত বাসবর্ত্তী স্বর্গ

এই ছয় দেবলোকের উপরিভাগে ১৬টী রূপলোক ধ্যানসিদ্ধ পুরুষদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ; যথা—

খ

প্রথম ধ্যান—ব্রহ্মলোক

৭। ব্রহ্ম-পরিসজ্জা

৮। ব্রহ্ম-পুরোহিত

৯। মহাব্রহ্মা

দ্বিতীয় ধ্যান—আভাময় লোক

১০। পরিত্তাভা

১১। অপ্রমাণাভা

১২। আভাস্বরা

তৃতীয় ধ্যান—শুভলোক

১৩। পরিত্ত শুভ

১৪। অপ্রমাণ শুভ

১৫। শুভ কৃৎস্ন

চতুর্থ ধ্যান—(মহাযোগী স্বর্গ)

১৬। বৃহৎ ফল

১৭। অসংজ্ঞাসত্ব

১৮। অবৃহ

১৯। অতপা

২০। সুদর্শী

২১। সুদর্শন

২২। অকনিষ্ঠ

এই ১৬ রূপ লোকের শিখরদেশে চারিটি অরূপ-লোক, অশরীরি ধ্যানী বুদ্ধদের আবাস-স্থান

অরূপ লোক

২৩। আকাশ আয়তন

২৪। বিজ্ঞান আয়তন

২৫। আকিঞ্চন্য আয়তন

২৬। নৈব সংজ্ঞা অসংজ্ঞায়তন

অভিধর্ম্ম মতে অরূপ লোকের সংখ্যা পাঁচ। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ এক এক জন করিয়া পঞ্চ অরূপ লোকের অধীশ্বর। অতএব বৌদ্ধ স্বর্গ নরক সংক্ষেপে এই। বৌদ্ধ মতে জীব ছয় প্রকার—

১ দেবতা, ২ মানব, ৩ অশুর, ৪ পশু, ৫ প্রেত, ৬ নারকী। এই সমস্ত জীবের জন্য ৪ কামলোক, ৬ দেবলোক, ১৬ রূপলোক ৪ অরূপ লোক, এবং ১৩৬ নরক অনন্ত আকাশে সুমেরু পর্ব্বতের উপর নীচে অবস্থাপিত।

বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভেদ। দার্শনিক শাখা।—

যেমন আচার অনুষ্ঠানে সেইরূপ দার্শনিক তত্ত্ব-বিচারে ও

বৌদ্ধধর্ম্ম।

বৌদ্ধ জগতে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। অল্প কাল মধ্যেই বৌদ্ধেরা অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে, যথা মহাসাঙ্ঘিক, স্থবির, এক ব্যবহারিক, চৈত্যবাদ; সর্ব্বাস্তিবাদ, বাৎস্যপুত্রীয়, কাশ্যপীয়, এইরূপ নানা মুনির নানা মত প্রচারিত হয়। হুয়েন সাং এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে এবং সিংহল গ্রন্থাবলীতে এই অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ইহাদের কোনটী মহাযান, কোনটী হীনযান শাখাশ্রিত। গ্রন্থে এই যে সম্প্রদায়সমূহের নাম দেখা যায় ইহাদের কোন শাখা আধুনিক বৌদ্ধসমাজে বিশেষ পরিচিত বলিয়া বোধ হয় না। বৌদ্ধদের মধ্যে এইরূপ মতান্তর ঘটিয়া ক্রমে চারিটি দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে এই চারি মতের নামোল্লেখ আছে, যথা, মাধ্যমিক, যোগাচার, বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক। মাধ্যমিক দর্শন এক প্রকার বৌদ্ধ মায়াবাদ বলিলেই হয়। ইহার মতে সকল পদার্থ ই মায়া, নির্ব্বাণ ও মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। যোগাচার দর্শনের মতে বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য পদার্থ আর সকলি মিথ্যা, এই মতের অপর নাম বিজ্ঞানবাদ। বিজ্ঞান দুই প্রকার, প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং আলয় বিজ্ঞান। প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ার নাম প্রকৃতি বিজ্ঞান। ঐ জ্ঞানধারা বা জ্ঞানসমষ্টির নাম আলয় বিজ্ঞান। জ্ঞান-সমূহ নানা প্রকার। কালিক জ্ঞান, দৈশিক জ্ঞান, বস্তু প্রতি-বিকল্প জ্ঞান, এই সমস্ত জ্ঞানের যোগাযোগে নিখিল পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে! ঐ ধারাবাহিক জ্ঞানই 'অহং' বা আত্মা। যেমন অসংখ্য জলকণার সমষ্টি ভিন্ন নদী নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, সেইরূপ জ্ঞান সমষ্টিই আত্মা, 'অহং' পদবাচ্য কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই; তেমনি আবার জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থও

নাই। একমাত্র জ্ঞানই সত্য, ঘটপট প্রভৃতি জ্ঞেয় পদার্থমাত্রেই জ্ঞানের আকার বিশেষ। মাধ্যমিক ও যোগাচার এই দুই মত, একটী বেদান্ত, অন্যটী যোগশাস্ত্রের কতকটা অনুরূপ। অপর দুই সম্প্রদায়ী অস্তিবাদী অর্থাৎ তাঁহারা আত্মা ও বহির্জগৎ উভয়েরই অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে ইহাদের পরস্পর কিছু মতভেদ দৃষ্ট হয়। বৈভাষিকেরা কহেন, বাহ্যবস্তু সমুদায় কেবল প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। সৌত্রান্তিক মতে বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে, অনুমান সিদ্ধ। আমাদের মনে বহির্জগতের প্রতিরূপ উৎপন্ন হয়। সেই প্রতিরূপ হইতেই বিষয় জ্ঞান জন্মে। জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিরূপ যাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনোদর্পণে প্রতিফলিত হইতেছে, সেই মানসচিত্র হইতে আমরা বহির্ব্বিষয়ের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লই। উভয় মতেই, যে সময়ে বস্তু প্রত্যক্ষ হয় সেই সময়েই তাহার অস্তিত্ব থাকে, প্রত্যক্ষ না হইলেই বিদ্যুল্লতার ন্যায় ধ্বংস হইয়া যায়। অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ আমার একটা মনের ভাব মাত্র, তাহা আমি ভাবিলেই আছে—না ভাবিলে নাই। ভাব জগতের মূলে সত্য জগৎ নাই। এই নিমিত্ত হিন্দু পণ্ডিতেরা এই মতের নাম 'সর্ব্ববৈনাশিক' দিয়াছেন। বৈভাষিকের আবার চতুঃশাখা—সর্ব্বাস্তিবাদ, মহাসাঙ্ঘিক, সম্মতীয়, স্থবির। ফাহিয়ান বলেন, প্রথমোক্ত দুই শাখার নিয়মাবলী তিনি পাটনার মঠ হইতে সংগ্রহ করিয়া চীনভাষায় অনুবাদ করেন।

ইৎ সিং যিনি সর্ব্বশেষে এদেশে তীর্থ ভ্রমণে আসেন, তিনি 'সর্ব্বাস্তিবাদী' ছিলেন; তাঁহার সময়ে উত্তরে এই মত এবং দক্ষিণে 'স্থবির' মতের প্রচার ছিল। হীনযান ও মহাযান সম্বন্ধে

ইৎ সিং বলিয়াছেন—"এ দুইই বিশুদ্ধ মত, উভয়ই সত্য, ইহারা উভয়েই ভিন্ন মার্গ দিয়া সেই একই নির্ব্বাণে পৌঁছাইয়া দেয়।"

মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বৌদ্ধ দর্শন প্রস্তাবে তাহার চারি তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—

১ম। জগতের প্রত্যেক পদার্থই ক্ষণিক

২য়। সকলই দুঃখময়

৩য়। সমুদয়ই স্বলক্ষণ—নিজ নিজ লক্ষণাক্রান্ত

৪র্থ। সকলই শূন্য

যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ফলে দাঁড়ায় এই যে বৌদ্ধ দর্শন শূন্যবাদে পর্য্যবসিত। তাহার মতে সকলই শূন্য, মূলে সত্য বস্তু কিছুই নাই।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কিরূপ পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হইয়াছে তাহার কতক আভাস পাইয়া থাকিবেন। যাহা বলা হইল তাহা ছাড়া কত দেশের কত উৎসব, পাগোডা বিহার ধর্ম্মমন্দিরে বিচিত্র পূজার্চ্চনা, বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ও প্রতিমা পূজা, কত কত বুদ্ধাবতার, বোধি সত্ত্ব—বুদ্ধের অস্থি দন্তের সমাধি ক্ষেত্র কতদিকে কত স্তূপ চৈত্য, কত 'মার' ভূত প্রেত দেব দেবীর কল্পনা, কত প্রকার স্বর্গ নরক কল্পনা, কত প্রকার মত ও সম্প্রদায়—সে সমস্ত আর কত বলিব? ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, আশানুরূপ ফল লাভ ও হয় না। সার কথা এই যে আদিম বৌদ্ধধর্ম্ম যাহা পালি বৌদ্ধ শাস্ত্র মন্থন করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় আর প্রচলিত ধর্ম্ম, বিশেষত তাহার উত্তর শাখা—ইহাদের মধ্যে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা এরূপ গুরুতর যে একটী চিত্র দেখিয়া অপরটীকে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার ও ধ্বংস।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শাক্য সিংহ বুদ্ধত্ব পাইবার পর বারাণসীতে গিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত পঞ্চ ভিক্ষুকে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক শিষ্য করিয়া লইলেন; তখন হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি যে যে উপায়ে শিষ্য মণ্ডলী সংগ্রহ করিলেন, তাঁহার শিষ্য সংখ্যা কিরূপে ক্রমান্বয়ে পরিবর্দ্ধিত হইল তাহার বিবরণ মহাবগ্‌গে প্রকাশিত। পঞ্চ ভিক্ষুর দীক্ষার পর যশ নামক কাশীর জনৈক ধনী শেঠিয়া তাঁহার পিতা মাতা পত্নীসহ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। পাঁচ মাসের মধ্যে ষাট জন শিষ্য হইল; বুদ্ধ তাহার দিগকে প্রচার কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিয়া নিজে উরুবেলার বনে গিয়া রহিলেন; তথায় কাশ্যপ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ ও তাঁহার দুই ভ্রাতা, এই তিন শিষ্য পাইলেন। ঐ অঞ্চলে কাশ্যপের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, অনেকগুলি যুবক তাঁহার নিকটে বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন। বুদ্ধদেব কাশ্যপের আশ্রমের নিকট থাকিয়া উপদেশ দিতেন ও ভিক্ষান্ন সংগ্রহে তাঁহার

দ্বারে গমন করিতেন। একদিন গিয়া দেখেন, এক অজাগর সর্প কাশ্যপের হোম-কক্ষে ফণা ধরিয়া বসিয়া আছে। বুদ্ধ সাপকে মন্ত্রে বশ করিয়া আপনার ভিক্ষার ঝুলিতে পূরিয়া রাখিলেন। এইরূপ আরো কতকগুলি অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া কাশ্যপ দল বলে গৌতমের শিষ্যরূপে দীক্ষিত হইলেন। উরুবেলায় শিষ্য সংখ্যা সর্ব্বসমেত ১০০০ হইল।

এই শিষ্যমণ্ডলী সঙ্গে বুদ্ধ একদিন গয়ার নিকট গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে উপবিষ্ট আছেন, রাজগৃহের অধিত্যকা তাঁহার সম্মুখে বিস্তৃত—এমন সময় সামনের এক পাহাড়ে ঘোর দাবানল তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল। এই অনলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধদেব এইরূপে উপদেশ দিলেন—তাহা "অগ্নি শর্ম্মার উপদেশ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাই।

"হে ভিক্ষুকগণ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কি হুতাশন জ্বলিয়া উঠিয়াছে! দেখ, আদিত্য আদীপ্ত; চক্ষু জ্বলিতেছে, সমুদায় দৃশ্যমান জগতে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই সকল ইন্ধন পাইয়া পঞ্চেন্দ্রিয় জ্বলিয়া উঠিতেছে। বাসনাগ্নি, রাগাগ্নি, লোভাগ্নি, মোহাগ্নি জ্বলিতেছে—জন্ম মৃত্যু রোগ শোক নৈরাশ্য দুর্ম্মনস্য সেই অনলে প্রসূত। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, দেহ মন চিন্তা সকলই এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড। ইন্দ্রিয় সকল কাম্য বস্তুর উপভোগে উত্তেজিত—বাসনানল নিরন্তর প্রজ্বলিত রহিয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ! এই অনিবার্য্য জ্বালা প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সংযত হন; পঞ্চেন্দ্রিয় দেহ মন সকলেরই প্রতি তাঁর বৈরাগ্য জন্মে। এই বিষম জ্বালা কিসে প্রশমিত হয় এই সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা হইতে কি উপায়ে উদ্ধার পাওয়া যায় তিনি তাহার উপায়

চিন্তা করেন এবং অবশেষে সংযমও ব্রহ্মচর্য্য সাধনা দ্বারা সেই নির্ব্বাণ রাজ্যে উপনীত হন যেখানে বাসনা ছিন্ন মূল; যেখানে তিনি জন্ম ভয় জরা মৃত্যু জ্বালা যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইয়া শাশ্বত আনন্দ উপভোগ করেন।"

তৎপরে তিনি উরুবেলা হইতে সেনীয় বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহে আসিয়া সুপতীর্থের নিকট যষ্টিবন নামক আরাম-কাননে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা বুদ্ধের আগমন সংবাদ-পাইয়া স্বীয় অনুচরবর্গসহ বুদ্ধদর্শনে সমাগত হইলেন, তখন অগ্নিহোত্রী কাশ্যপকে দেখিয়া ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্ময়ে অবাক্। বুদ্ধদেব তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া রাজা, ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও অন্যান্য উপস্থিত গৃহপতিগণের সমক্ষে কাশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কাশ্যপ, তুমি তাপসজনের মধ্যে খ্যাতনামা অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, বল কেন তুমি জপ তপ যাগ যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া এই নবীন পন্থা অবলম্বন করিয়াছ? তোমার অগ্নিগৃহ শূন্য পড়িয়া রহিবার কারণ কি? হে উরুবেলার ব্রাহ্মণ, তুমি এমন কি সত্য উপার্জ্জন করিয়াছ যাহার জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত? স্বর্গ মর্ত্ত্যে এমন কি আছে, যার জন্য তুমি লালায়িত?"

কাশ্যপ উত্তর করিলেন।

"আমি বেশ বুঝিয়াছি হোম যাগ যজ্ঞ নিতান্ত নিষ্ফল, কেন না সে সমস্ত অনুষ্ঠান বাহ্য-আড়ম্বর মাত্র, তাহাতে এমন কিছুই নাই যদ্দারা বিষয়-লালসা প্রশমিত হয়, মোহপাশ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। আমি জানিয়াছি সংসারের সকলি অলীক, ক্ষণিক, ঘৃণিত, শূন্য। আমি সেই মোক্ষাবস্থার সন্ধান পাইয়াছি,

যে অবস্থায় জন্ম-বন্ধন ছিন্ন হয়, লোভ মোহ দ্বেষ হিংসা বিনষ্ট হইয়া যায়, বিষয়-তৃষ্ণা স্বর্গকামনা নিরস্ত হয়। আমি সেই পরম সম্পদ লাভ করিয়াছি, যাহার ক্ষয় নাই, পরিবর্ত্তন নাই, এই হেতু হোম বলি যাগ যজ্ঞে আর আমার প্রবৃত্তি নাই।" এই বলিয়া তিনি বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত হইয়া কহিলেন—"ভগবান বুদ্ধই আমার গুরু, আমি ইহাঁর শিষ্য—ভগবান বুদ্ধই আমার গুরু।" তখন উপস্থিত জনগণ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন ও নির্ম্মল শুভ্র বসনে যেমন সহজে রং ধরে তাহাদের মন ও সত্য ধারণের জন্য প্রস্তুত হইল। বুদ্ধ তাহাদিগকে সদুপদেশ দিয়া সংসারের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন এবং অনেকে সেই উপদেশ গ্রহণ করিয়া গৃহী শিষ্যরূপে দীক্ষিত হইলেন। তাহার মধ্যে রাজা বিম্বিসারও একজন।

পরে রাজা বিম্বিসার বুদ্ধদেবের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন "প্রভো আমি যখন যুবরাজ ছিলাম, তখন আমার মনের সাধ এই পাঁচটী ছিল—প্রথম রাজ্যাভিষেকের অভিলাষ, দ্বিতীয় আমার রাজ্যে বুদ্ধদেবের চরণধূলি পড়ে এই ইচ্ছা; পরে তাঁহার দর্শন, উপদেশ শ্রবণ এবং তাঁর উপদেশের মর্ম্মগ্রহণ—প্রভো, আমার এই পাঁচটী মনোরথই পূর্ণ হইয়াছে, আমি এখন আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি। এইক্ষণে আমার মিনতি এই যে প্রভু ভিক্ষুমণ্ডলী লইয়া কল্য রাজবাটীতে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন।" বুদ্ধদেব মৌনভাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। পরদিন মধ্যাহ্ন পূর্ব্বে বুদ্ধদেব শিষ্যবর্গ সহ প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রাজা স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন পরিবেশন পূর্ব্বক তাঁহাদের যথোচিত আতিথ্য সৎকার করিলেন এবং ভোজ-

নান্তে বৌদ্ধ সঙ্ঘে বেণুবন উৎসর্গ করিয়া গুরুজীর মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন। (মহাবগ্‌গ)

এই আশ্রমে বুদ্ধদেব দুই মাস অতিবাহিত করেন।

ঐ সময়ে রাজগৃহে সারীপুত্র ও মুদ্‌গলায়ন, এই দুই ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইঁহারা পরিব্রাজক সঞ্জয়ের শিষ্য ছিলেন ও পরম বন্ধুভাবে গুরুর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিতেন। তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা এই যে আমাদের মধ্যে যিনি প্রথমে মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইবেন তিনি বন্ধুকে তাহা খুলিয়া বলিবেন। একদিন সারী-পুত্র বুদ্ধ শিষ্য অশ্বজিৎকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন তিনি রাজগৃহে ভিক্ষা পাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার সুন্দর মুখশ্রী এবং প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ানন্দ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই, তোমার মুখশ্রী কি সুন্দর! তাহাতে কি উজ্জ্বল বিমল কান্তি দীপ্তি পাইতেছে! কাহার মন্ত্রে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ? কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন"?

অশ্বজিৎ কহিলেন "শাক্য বংশীয় গৌতম মুনি আমার গুরু, তাঁহারই উপদেশে আমি দীক্ষিত"!

সারীপুত্র—"তোমার গুরুর নিকট কি শিক্ষা পাইয়াছ?"

অশ্বজিৎ—"আমি অল্প দিন হইল এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি বিশেষ কিছু জানি না, আমি সবটা আপনাকে খুলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আপনি আমার গুরুজির নিকটে গেলে যাহা জানিতে ইচ্ছা করেন তিন সকলি বলিয়া দেবেন—আপনার সর্ব্ব সংশয় দূর করিবেন। বুদ্ধদেব কার্য্য কারণ শৃঙ্খল সমস্তই অবগত আছেন,

হেতু-প্রভব ধর্ম্ম সকলের হেতু এবং তাহাদের নিরোধ, তাহাদের আদি অন্ত সকলি জানেন ও সেইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। *

সারীপুত্র এই গুটি কত কথার মধ্যে সত্যের কতক জ্ঞান উপলব্ধি করিলেন, দেখিলেন বিশ্বচরাচর সকলি নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর—যাহার জন্ম তাহার মৃত্যু, যাহার আদি তাহার অন্ত অবশ্যম্ভাবি। এই নিয়ত ঘূর্ণায়মান ভবচক্র হইতে কিসে মুক্তি লাভ হয় তাহা ভাবিতে লাগিলেন; এবং কি সত্য জানিলে এই ভব-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাওয়া যায় তাহা জানিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

সারীপুত্র মুদ্গলায়নের নিকটে গিয়া স্বীয় মনোভাব ও সংশয় সকল ব্যক্ত করিলেন। উভয়েই বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণের জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের গুরু সঞ্জয়ের অধীনে আর

---

* শ্লোকটী এই।—

যে ধম্মা হেতু প্পভবা
যেসাং হেতুন্ তথাগতঃ।
অহ যেসঞ্চ যো নিরোধো
এবম্বাদী মহা সমনো (পালি)।

যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা হেতুস্তেষাং তথাগতঃ।
হ্যবদৎ তেষাং চ নিরোধ—এবম্বাদী মহাশ্রমণঃ (সংস্কৃত)।

অর্থ—দুঃখময় এ ভবের উৎপত্তি কোথায়
শ্রমণ জানেন তার তথ্য সমুদায়।
কেমনে হয় বা সেই দুঃখের নিরোধ
তথাগত যথাযথ করি দেন বোধ।

তাঁহারা থাকিতে চাহিলেন না, সঞ্জয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বুদ্ধের আশ্রমে উপনীত হইলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদের আসিতে দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, "এই যে দুজন ব্রাহ্মণ দেখছ ইঁহারা আমার শিষ্যদের মধ্যে কৃতী ও অগ্রগণ্য হইবেন।" এই বলিয়া তিনি স্বহস্তে তাঁহাদের দীক্ষা দান করিলেন।

এই নবীন শিষ্যদের প্রতি গুরুদেবের বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ দৃষ্টে পূর্ব্ব শিষ্যেরা কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন; পরিশেষে তিনি তাঁহাদের সকলকে একত্র করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম-বীজের † ব্যাখান ও সদুপদেশ দানে বিদ্বেষানল প্রশমিত করেন।

কথিত আছে এই রাজগৃহে অবস্থিতি কালে প্রতিমোক্ষের প্রধান প্রধান সূত্রগুলি বিরচিত ও বৌদ্ধ সঙ্ঘের পত্তন হয়—সেই প্রথম সভার নাম "শ্রাবক সন্নিপাত।"

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া লোকেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। কেহ বলিল গৌতম আমাদের গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইতে আসিয়াছেন;

---

† দীঘ নিকায়ের মহাপদান সুত্তে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মবীজ দেওয়া হইয়াছে তাহা এই—

সর্ব্বপাপস্স অকরণং
কুসলস্স উপসম্পদা
সচিত্ত পরিয়োদপণং
এতং বুদ্ধানুসাসনং

অর্থ—অকরণ পাপ-আচরণ,
নিয়ত কুশল-উপার্জন,
চিত্তের সম্যক্ শোধন,
এই বুদ্ধানুশাসন।

কেহ বলিল, গৌতম আমাদের স্ত্রীদের বিধবা করিবার জন্য আসিয়াছেন ; তিনি আমাদের পরিবার সমাজ সকলি উলট পালট করিয়া দিতেছেন ; সকলেই গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী হইতে চলিল। হাজার জটাধারী সন্ন্যাসীকে তিনি শিষ্য করিয়াছেন, সঞ্জয়ের আড়াই শো শিষ্য গুরুকে ছাড়িয়া গৌতমের পদানত ; মগধ ভাঙ্গিয়া যুবকেরা দলে দলে তাঁহার পদতলে আসিয়া লুণ্ঠিত। নাগরিকেরা গৌতমের শিষ্যদের এইরূপে বিদ্রূপ আরম্ভ করিল।

রাজগৃহে আইলেন গুরু মহাশয়,
আসিয়া পর্ব্বত চূড়ে বাঁধেন আলয়।
সঞ্জয়ের শিষ্য সবে ছিল যারা বুদ্ধি-বৃহস্পতি
কোথায় কে গেল চলে, আর ভাই না জানি কি দুর্গতি!

ইহার উত্তরে গৌতম-শিষ্যেরা বলিতেন—

ধর্ম্মবীর বুদ্ধ যিনি সত্য তাঁর একমাত্র বল।
তাঁহার কি দোষ ভাই, মহিমা এ সত্যেরি কেবল।

এইরূপ শাক্য পক্ষীয় ও প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলিত, তা ভিন্ন আর কোন গুরুতর দ্বন্দ বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। বুদ্ধ এই বাগ্‌বিতণ্ডার ব্যাপার শুনিয়া কহিলেন, ভয় নাই এ বিবাদ অধিক দিন স্থায়ী হইবে না, এক সপ্তাহের মধ্যেই সব গোল মিটিয়া যাইবে। ফলে তাহাই হইল। (মহাবগ্‌গ)

বুদ্ধের যে কি আকর্ষণী শক্তি ছিল, তিনি নগরে গ্রামে বনে উপবনে যেখানে যাইতেন তাঁহার দর্শনার্থে, তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে ঝাঁকে ঝাঁকে লোকেরা আসিয়া উপস্থিত হইত। অবন্তী প্রদেশে সোন নামক এক ভক্তের কথা শুনা যায়, ঐ দূর দেশে গৌতমের নাম তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছে,

ও তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল। একবার বিরলে বসিয়া তিনি ভাবিলেন, "আমি ভগবান বুদ্ধের নাম শুনিয়াছি কিন্তু তাঁহাকে কখন চাক্ষুষ দেখি নাই। আমার গুরুর আদেশ পাইলে আমি একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসিব।" গুরুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন, "যাও, গিয়া ভগবানের শ্রীচরণ দর্শন' কর। তিনি আনন্দের উৎস, মধুরভাষী, সংযমী, জিতেন্দ্রিয়, তাঁহার দর্শনে বহু পুণ্য উপার্জ্জন হইবে।" কিন্তু সোনের দীক্ষা বিধি অনুষ্ঠানের জন্য ১০ জন ভিক্ষু উপস্থিত থাকা আবশ্যক—তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া অনেক কষ্টে এই দশজন ভিক্ষু সংগ্রহ পূর্ব্বক সোন শ্রাবস্তী যাত্রা করিলেন এবং জেতবনে গিয়া বুদ্ধদেবের সন্নিধানে উপনীত হইলেন।

এই সকল ভক্ত বুদ্ধের আশ্রমে আকৃষ্ট হইত, ইহা অপেক্ষাও উচ্চ দলের লোক তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত। বুদ্ধ যখন কোন প্রখ্যাত নগরে বা কোন রাজার রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন তখন রাজা, নাগরিক বড় বড় লোকেরা কেহ রথে, কেহ গজপৃষ্ঠে, তাঁহার উপদেশ শ্রবণার্থ সমাগত হইতেন। 'সন্ন্যাস ধর্ম্ম' নামক বৌদ্ধগ্রন্থের ভূমিকায় আমরা এইরূপ একটী চিত্র দেখিতে পাই। এইরূপ লিখিত আছে যে একরাত্রে মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁহার প্রাসাদের ছাদে সচিব সহ উপবিষ্ট হইয়া শরতের জ্যোৎস্না উপভোগ করিতেছিলেন। আহা! সে জ্যোৎস্না কি সুন্দর, কি মনোহর! এই মধুর যামিনীতে সহসা রাজার মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হইল। তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন,

ব্রাহ্মণ শ্রমণের মধ্যে এমন সদ্‌গুরু কে আছে যিনি আমার মনের স্পৃহা পূর্ণ করিতে পারেন। মন্ত্রীরা কেহ একজনের নাম, কেহ অপরের নাম করিলেন। পরে রাজবৈদ্য জীবককে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন "ভগবান বুদ্ধ শিষ্য সমভি-ব্যাহারে আমার আম্রবনে বিশ্রাম করিতেছেন, তিনশত ভিক্ষু তাঁহার সহচর। ত্রিজগতে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত—তিনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, সুরনর-গুরু, মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব। তাঁহার দর্শনে চলুন, তাঁহার উপদেশ শ্রবণে মহারাজ প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই।" রাজা তখনি হস্তী সজ্জা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়া রাণীদের সঙ্গে সেই মধুময় জ্যোৎস্না রাত্রে রাজগৃহদ্বার দিয়া জীবকের আম্রবনে উপনীত হইলেন এবং তথায় বুদ্ধের নিকট সন্ন্যাস-ধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণানন্তর গৃহী শিষ্যরূপে গৃহীত হইলেন।

এই সমস্ত বর্ণনা হইতে আমরা বুদ্ধ দেবের জীবন চিত্র কতকটা মনে আনিতে পারি। তিনি কোন নগরের সন্নিকট হইলে রাজা প্রজা ছোট বড় সকলেই তাঁহার দর্শন আশে ঝুঁকিয়া পড়িত। কুশীনগরের মল্লেরা, বৈশালীর লিচ্ছবি যুবক-গণ তাঁহার দর্শনার্থে সমাগত, তার সঙ্গে অম্বপালী গণিকা ও ফেলা যায় না। উপদেশ সমাপ্ত হইলে বুদ্ধের ভক্তমণ্ডলী পরদিন তাঁহাকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিত। মধ্যাহ্নে আহার প্রস্তুত হইলে গৃহস্বামী বলিয়া পাঠাইতেন যে ভোজন প্রস্তুত তখন বুদ্ধ তাঁহার বসনত্রয় পরিধান পূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র হস্তে গম্যস্থানে উপস্থিত হইতেন। তথায় সুস্বাদ অন্নব্যঞ্জন যাহা কিছু প্রস্তুত হইত গৃহকর্ত্রীই পরিবেশন করিতেন। আহারান্তে

শ্রাবকবর্গ দলবলে বুদ্ধ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইতেন ও তাঁহার উপদেশামৃত পান করিয়া আনন্দ মনে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন।

যদি ও ধরিয়া নেওয়া যায় যে বুদ্ধদেব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর আস্থাশূন্য ছিলেন, প্রত্যুত, ব্রাহ্মণ শূদ্র আর্য্য ম্লেচ্ছ নির্ব্বিশেষে ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে সর্ব্বজাতির সমান অধিকার ঘোষণা করিতেন, তথাপি কার্য্যতঃ দেখা যায় যে বুদ্ধের প্রথম শিষ্যমণ্ডলী প্রায় সকলেই উচ্চ কুলোদ্ভব। বুদ্ধ তিনি নিজে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্য ও উচ্চ কুলজাত। তাঁহার নবোপার্জ্জিত শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে যে সকল নাম দেখা যায় তাহা—

সারীপুত্র, মুগদল পুত্র, কাশ্যপ ব্রাহ্মণ সন্তান।

আনন্দ, দেবদত্ত বুদ্ধের আত্মীয়, রাহুল তাঁহার পুত্র।

অনিরুদ্ধ রাজা শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্র।

যশ বণিক সন্তান, তাঁহার কুলমর্য্যাদা কম মনে হয় না। দুই একজন নীচবর্ণও দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, যেমন উপালী কিন্তু উপালী নিতান্ত সামান্য লোক নহেন, তিনি রাজনাপিত।

সারী পুত্র ও মুগদলায়ন দুই ব্রাহ্মণ শিষ্য বুদ্ধের প্রথম শিষ্যদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহারা বুদ্ধদেবের প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত ভক্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সারীপুত্র তাঁর সঙ্ঘের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ভূষণ স্বরূপ গণ্য ছিলেন। আনন্দ তাঁহার প্রিয়শিষ্য আমরণ গুরু সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বুদ্ধের শেষ বয়সের ঘটনাবলী আনন্দের সহিত জড়িত ও তাঁহার অন্তিমকালের শেষ উপদেশ আনন্দকে সম্বোধন করিয়াই প্রদত্ত হয়। উপালী ও বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রণেতা বলিয়া বৌদ্ধ সমাজে খ্যাতি

লাভ করেন। বুদ্ধের শ্যালক দেবদত্তের সহিত আপনারা কতক পরিচিত আছেন। তিনি স্বীয় গুরুর বিরুদ্ধে যে সমস্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পূর্ব্বেই কিছু কিছু বলা হইয়াছে।

অতঃপর বুদ্ধের অনেক গৃহস্থ শিষ্য ও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা গৃহ সম্পত্তি পরিবারে পরিবৃত থাকিয়া ও বৌদ্ধ সঙ্ঘে দানাদি অনুষ্ঠানে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ভিক্ষুদলের পার্শ্বে এই সমস্ত ধর্ম্মশীল গৃহস্থেরা দণ্ডায়মান ছিলেন। ভিক্ষুদের নিকট হইতে তাঁহারা উপদেশ গ্রহণ করিতেন ও তাহার বিনিময়ে অন্ন বস্ত্র দান, ভূমি-দান দ্বারা ভিক্ষু সমাজ পোষণ করিতেন। এই সকল ভক্তের মধ্যে মগধাধিপতি বিম্বিসার ও কোশলেশ্বর প্রসেনজিৎ (পশেনদী) পরিগণিত হইতে পারেন। বিম্বিসারের রাজবৈদ্য জীবক—তিনি শুধু রাজ পরিবারের বৈদ্য ছিলেন তাহা নহে কিন্তু বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সঙ্ঘের চিকিৎসা ভার ও তাঁহার হস্তে সমর্পিত ছিল। তাহা ছাড়া অনাথপিণ্ডিক বণিক যাঁহার অনুগ্রহে বৌদ্ধ সঙ্ঘ বুদ্ধ দেবের প্রিয় শান্তি-নিকেতন জেতবন উপার্জন করেন; বুদ্ধদেব প্রচারে পরিভ্রমণ কালে এই সমস্ত গৃহস্থ শিষ্য সংগ্রহ করিতেন। ভিক্ষাদান, ভূমিদান, গৃহ ও উদ্যানে সভার আয়োজন, এইরূপে তাঁহারা ভিক্ষু দলের আতিথ্য সংকারে নিযুক্ত থাকিয়া বিবিধ উপায়ে ধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করিতেন।

ধর্ম্ম প্রচার।—

ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম যে সমস্ত কুসংস্কার জালে আচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহা ফেলিয়া দিয়া, সেই ধর্ম্মের যে সত্য সুন্দর মধুর ভাব তাহা রক্ষা করিয়া, বাহ্যাড়ম্বর বাদ দিয়া ধর্ম্মের সহজ সত্য সকল

আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করিয়া, সমুদায় ভারতবাসীকে মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ করিয়া বুদ্ধদেব সরল সহজ ভাষায় জাতিকুল নির্ব্বিশেষে আপামর সাধারণ জনপদের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার কর্ষণক্ষেত্র প্রয়াগের পূর্ব্ব, গৌড়ের পশ্চিম, হিমালয়ের দক্ষিণ ও গন্দোয়ানার উত্তর এই চতুঃ-সীমার মধ্যবর্ত্তীস্থল—অযোধ্যা, মিথিলা, বারাণসী, মগধ এই সমস্ত রাজ্য। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার হস্তের বীজ লইয়া দেশ দেশান্তরে ছড়াইবার জন্য বাহির হইলেন।

হিন্দুধর্ম্ম প্রচার-সুলভ বিশ্বজনীন ধর্ম্ম নহে। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ না করিলে হিন্দু হওয়া যায় না—এমন কি, হিন্দু সমাজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কঠোর নিয়মে আটে ঘাটে এমনি বদ্ধ যে, যে ব্যক্তি যে বর্ণে জন্মিয়াছে সে কোন উপায়েই তাহার বাহিরে যাইতে পারে না এবং স্ববর্ণের গণ্ডীর ভিতর অন্যকে গ্রহণ করিতেও অপারক। তাহা ছাড়া, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা ও উপদেশ উচ্চ বর্ণেই আবদ্ধ। সে শিক্ষা সর্ব্ব জাতির সাধারণ সম্পত্তি নহে, উচ্চ বর্ণের এক চেটিয়া—শূদ্রাদি হীনবর্ণ তাহা হইতে বঞ্চিত। বৌদ্ধধর্ম্ম ইহার ঠিক বিপরীত। বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে যেমন স্বধর্ম্ম পালনের উপদেশ দিতেন সেইরূপ দেশ বিদেশে বিভিন্ন জনপদের মধ্যে সেই ধর্ম্ম প্রচারেও উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার উপদেশানুসারে ভিক্ষুদল দেশ দেশান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম বীজ বপনে প্রাণপণে সচেষ্ট হইলেন।

অশোকের পিতামহ চন্দ্র গুপ্ত অথবা তাঁহার পিতা বিম্বিসার বৌদ্ধ ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন কি না তাহার কোন প্রমাণ

পাওয়া যায় না। চন্দ্রগুপ্ত চানক্যের ষড়যন্ত্রে মগধ সিংহাসন অধিকার করেন, অতএব তাঁহার উপর ব্রাহ্মণ্যের শাসন বলবত্তর থাকাই সম্ভব। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান নায়ক ও অবলম্বন অশোক রাজা।

অশোক রাজা।

বৈশালী মহাসঙ্ঘের ১১৮ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব্বে ২৫৯ অব্দে অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার উৎসাহ প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। তিনি এত চৈত্য, এত স্তূপ ও অন্য অন্য এত প্রকার কীর্ত্তি-নিকেতন প্রস্তুত করেন তাহার চিহ্ন সকল দুই সহস্র বৎসরান্তেও কালের হস্তে বিলুপ্ত হয় নাই। মগধ রাজ্যে অন্যূন ৬৪০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রতিপালিত হইত এবং উহাদের বাসোপযোগী বিহারে বিহারে ঐ প্রদেশ এমনি ভরিয়া যায় যে বিহার নামেই উহার নামকরণ হইল—ঐ নাম এখনো পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। রোম-সাম্রাজ্যে কনষ্টান্টাইন রাজার খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত যে সম্পর্ক, মগধ রাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে সেই রূপ। তিনি সমগ্র ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হয়েন; শুধু স্বরাজ্যে নয়, ভারতের বহির্ভাগেও ধর্ম্মযাজকগণ প্রেরণ করেন। বলগা হইতে জাপান, সাইবিরিয়া মোঙ্গলিয়া হইতে সিংহল শ্যাম পর্য্যন্ত যেখানে যেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার সেখানেই অশোকের নাম প্রকীর্ত্তিত। অশোক রাজার ধর্ম্মানুশাসন গুলি * কতক

---

* যে অষ্ট শিলালেখ্য প্রসিদ্ধ তাহা—

১। সাহাবাজ-গড়—পেসোয়ারের উত্তর পূর্ব্ব ২০ ক্রোশ দূর উসফজাই বিভাগে।

গিরিপৃষ্ঠে বা গিরি গুহায় খোদিত, কতকবা শিলা স্তম্ভোপরি মুদ্রিত। অনুশাসন স্তম্ভ সকল দিল্লী, আলাহাবাদ ও অন্যান্য স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় এবং শিলা লিপি সকল পেশোয়ার গির্ণার (কাঠেওয়া[illegible] মধ্য হিন্দুস্থান, মান্দ্রাজ এবং উড়িষ্যায়

২। খালসি—[illegible] হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া চলিতে আরম্ভ করি[illegible] নদীর পশ্চিমকূলে।

৩। গির্ণার—ব[illegible] জুনাগড়ের নিকট সোমনাথের ২০ ক্রোশ উত্তরে।

৪। ধৌলী—উড়িষ্যা—কটকের ১০ ক্রোশ দক্ষিণে এবং পুরীর ১০ ক্রোশ উত্তরে।

৫। জোগদ—গাঞ্জাম বিভাগ (মান্দ্রাজ)

৬। বিরাট (জয়পুর রাজ্য) দুইটি লেখ, একটি এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে স্থাপিত।

৭। রূপনাথ (কায়মূর পর্ব্বত তলে)

৮। সহসরাম—বক্সার বা ডুমরাও হইতে প্রায় ২৫ ক্রোশ দক্ষিণে।

স্তম্ভ।—

১। ২। দিল্লী (ফিরোজসা লাট) দুইটি দেখা যায় ফিরোজ সা বাদসা সিবালিক এবং মিরট হইতে স্থানান্তরিত করিয়া দিল্লীতে রাখিয়া দেন।

৩। আলাহাবাদ—প্রয়াগের দুর্গ মধ্যে।

৪। লৌরিয়া—বেটিয়ার নিকটস্থ লৌরিয়া গ্রামে।

৫। লৌরিয়া—পাটনার উত্তর পশ্চিম ৭৭ মাইল।

আবিষ্কৃত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্দ্দশ শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটি লিপিতে পঞ্চগ্রীক রাজার * সহিত সন্ধি স্থাপনের উল্লেখ আছে, প্রিয়দর্শীর রাজত্বের ১৩শ বর্ষে এই লিপি উৎকীর্ণ হয়। এই সমস্ত অনুশাসন হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দে সীরিয়া, মিশর, গ্রীস, ম্যাসিডন প্রভৃতি দূর দূরান্তর প্রদেশেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের উদ্যোগ চলিয়াছিল। ত্রয়োদশ আদেশ পত্রে প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—

"গ্রীকরাজ আণ্টিয়োকসের (antiochus) রাজ্যে এবং তুরময় (Ptolemy), আণ্টিকিনি, (Antigonus), মক (Magus), এবং আলেকস্থুর (Alexander) এই চারিজন রাজার রাজ্যে এবং অন্যান্য স্থানে দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শীর ধর্ম্মের অনুজ্ঞা সকল যেখানে প্রচারিত হইতেছে, সেই খানেই লোকদিগেকে ধর্ম্মভুক্ত করিতেছে। দেশ বিজয় বহুপ্রকারে হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মের জয় সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দপ্রদ—এই প্রকার বিজয়ই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।"

---

* পঞ্চ গ্রীক্‌রাজ—

1. Antiochus of Syria.
2. Ptolemy of Egypt, father of Ptolemy Philadelphus.
3. Antigonus of Lycia &c.
4. Magus of Cyrene.
5. Alexander of Epirus, Maternal Uncle to Alexander the Great.

অশোকের অনুশাসন গুলি স্নেহ বাৎসল্য, দয়া দাক্ষিণ্য, ভক্তি অহিংসাদি সাধারণ ধর্ম্মনীতির উপর দিয়াই গিয়াছে—তাহার একটী ভিন্ন অপর কোন লেখে প্রিয়দর্শী আপনাকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দেন নাই; প্রত্যুত, একস্থানে ধর্ম্মবিষয়ক অপার ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন যে 'প্রিয়দর্শীর ইচ্ছা যে অবৌদ্ধ পাষণ্ডেরাও তাঁহার রাজ্যে নির্ব্বিঘ্নে বাস করুক কেননা তাহারাও ভাবশুদ্ধি এবং ধর্ম্মের শান্তি কামনা করে।' কেবল একটী অনুশাসনে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রসঙ্গ দেখা যায় সেটি মগধ সঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া লিখিত—তাহাতে আছে—

"রাজা প্রিয়দর্শী সঙ্ঘের কুশল কামনা করিতেছেন। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের উপর আমার কি প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা, মহাশয়েরা অবগত আছেন। বুদ্ধ যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা সকলই সদুপ-দেশ—তাঁহার আজ্ঞানুরূপ চলিলে সত্য ধর্ম্ম বহুকাল সুরক্ষিত থাকিবে।" পরে তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাতটি ধর্ম্মতত্ত্ব পালি-শাস্ত্র হইতে প্রকটন করিয়াছেন—

১। বিনয় সমুৎকর্ষ (প্রতিমোক্ষ হইতে)
২। আর্য্যবশ (সঙ্গীতি সূত্র হইতে)
৩। অনাগত ভয় (অঙ্গুত্তর)
৪। মুনি গাথা
৫। মৌনী সূত্র
৬। উপতিস্স-পসিণ, উপতিষ্য = সারীপুত্র প্রশ্ন (বিনয়)
৭। রাহুল বাদ, রাহুলের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ।

"এই সকল কথা শ্রমণ শ্রমণা ও বৌদ্ধ গৃহস্থগণ প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ ও মনন করিবেন এই অভিপ্রায়ে আমি এই অনুশাসন প্রচার করিতেছি।" ('বিরাট' অনুশাসন)

ধর্ম্ম মহামাত্র—প্রতিবেদক

এই সমস্ত অনুশাসন লিপি হইতে আরো জানা যায় যে অশোকের রাজত্ব কালে "ধর্ম্ম মহামাত্র" নামে এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষণ এবং ধর্ম্মপ্রচার এই দুই বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত ছিল। প্রজাবর্গের নিম্নস্তরেই ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ আবশ্যক এই হেতু অনার্য্য জাতিগণের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন উল্লিখিত ধর্ম্মাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল। আর এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর নাম প্রতিবেদক, প্রজাদিগের নীতি সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করা তাহাদের ও কার্য্য ছিল। প্রজাদের আচার ব্যবহার হিতাহিত তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়া তৎসম্বন্ধীয় সকল সংবাদ প্রতিবেদকেরা মহারাজের নিকট আনিয়া দিতেন।

অশোক স্বীয় রাজ্যে ধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হন নাই,—পথের ধারে বৃক্ষরোপন, কূপবাপী খনন, পশুহিংসা নিবারণ, পশু ও মনুষ্যের মধ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় স্থাপন, অন্তঃপুর বাসিনা ও আর আর লোকের জন্য ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তন, এইরূপ বিবিধ উপায়ে প্রজাগণের হিতসাধনের চেষ্টা পান। তাঁহার অনুশাসন লিপিতে এই সমস্ত ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠানও কর্ম্মচারী নিয়োগের বার্ত্তা লিখিত আছে।

অশোকের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে পাটলিপুত্রে বৌদ্ধদের তৃতীয় মহাসভা হয়, সে সভায় প্রায় ১০০০ স্থবির ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

মুদ্গলপুত্র তিষ্য তাহার অধ্যক্ষস্থানে ছিলেন এবং সভারকার্য্য প্রায় ৯ মাস ধরিয়া চলে। বিনয় ও ধর্ম্মের পাঠ ও আবৃত্তি—তাহার কোন্ ভাগ শাস্ত্রীয় কোন্ ভাগ অশাস্ত্রীয়—কি গ্রাহ্য কি ত্যজ্য তাহা নিরূপণ, আদিসমাজের নিয়ম ও ধর্ম্ম সংরক্ষণ, সাম্প্রদায়িক মত খণ্ডন ইত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহা বলা আবশ্যক যে, উত্তর দেশীয় বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই পাটলিপুত্র সভার কোন উল্লেখ নাই; ইহার বিষয় যাহা কিছু জানা যায় তাহা এক-দেশ-দর্শী দক্ষিণ শাখার গ্রন্থ সকল হইতে জানা গিয়াছে, বিরুদ্ধ পক্ষের কথা শুনিতে পাইলে এ সভার বিবরণ আরো স্পষ্ট বুঝা যাইত।

কিন্তু এ সভার শাস্ত্রীয় বিচার যাহাই হউক না কেন, ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ইহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষিত হয় এবং এই কার্য্য সুসম্পন্ন করায় ইহার সমধিক গৌরব বলিতে হইবে। সভার কার্য্য শেষ হইবামাত্র অশোক রাজা কাশ্মীর, গান্ধার, মহীশূর, বনবাস (রাজস্থান), অপরন্তক (পশ্চিম পাঞ্জাব), মহারাষ্ট্র, যবন লোক (বক্ত্রিয়া ও গ্রীক রাজ্য), হিমালয়, সুবর্ণ ভূমি (মলয়) এবং লঙ্কাদ্বীপে ধর্ম্ম প্রচারকগণ প্রেরণ করেন। অশোকের অনুশাসন লিপিতে আরো অনেক দেশের নাম পাওয়া যায়; চোলা (তাঞ্জোর), পাণ্ড্য (মতুরা), সাতপুর (নর্ম্মদার দক্ষিণ পর্ব্বতশ্রেণী) এবং আন্টিয়োকসের গ্রীকরাজ্য, এই সকল দেশকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজয় করা অশোকের মনোগত অভিপ্রায় ছিল এবং তিনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন ধর্ম্ম বিজয়ই সমধিক বাঞ্ছনীয় ও আনন্দজনক।

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম।

ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে অশোক যে সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু দেশ

বিদেশে প্রেরণ করেন তাহাদের মধ্যে তাঁহার নিজের পুত্র মহেন্দ্রের সিংহল প্রয়াণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তখন দেবানাং প্রিয়তিষ্য সিংহলের রাজা, তাঁহার নিকট অশোকপুত্র মহেন্দ্র দলবলে উপস্থিত হয়েন। তিষ্য তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন ও আপনি অনতিকাল বিলম্বে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অনুরাধাপুরের অনতিদূরে মহিন্তালী পর্ব্বত শিখরে যে বৌদ্ধ মঠ আছে তাহা তাঁহারই আদেশ ক্রমে নির্ম্মিত হয়। এই পর্ব্বতাশ্রমে মহেন্দ্র কতিপয় বৎসর যাপন করেন। পাহাড় খুদিয়া তাঁহার জন্য যে গুহাশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার চিহ্ন সকল অদ্যাপি বর্ত্তমান। মহেন্দ্রের পর্ব্বতাশ্রম হইতে নিম্নদেশস্থ সুবিস্তৃত অধিত্যকা দৃষ্টিগোচর হয়। গিরিচ্ছত্র ছায়ায় আশ্রমটী সূর্য্যকিরণ হইতে সুরক্ষিত। জনমানব নাই সকলি নিস্তব্ধ; নিম্নদেশ হইতেও জনকোলাহল শ্রুতি-গোচর হয় না কেবল ভ্রমরের গুণ গুণ শব্দ ও বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। বৌদ্ধ শাস্ত্র বিশারদ Rhys Davids এই আশ্রম দর্শন করিয়া বলিয়াছেন "এই শান্তিপূর্ণ শীতল কক্ষে প্রবেশ করিয়া যে দিন এই স্থান দর্শন করিলাম—এই সুন্দর বিজন স্থান যেখানে ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে সেই মহোৎসাহী ধর্ম্মপ্রচার ধ্যান করিতেন ও লোক দিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন—সেদিন আমার স্মৃতি-পথ হইতে কখনই অপসারিত হইবার নহে।"

রাজার অন্তঃপুর বাসিনীদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করায় মহেন্দ্র তাঁহার বৌদ্ধ ভগিনী সঙ্ঘমিত্রাকে ডাকিয়া আনাইলেন। পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া

সঙ্ঘমিত্রা কতকগুলি ভিক্ষুণী সহ সিংহলে উপস্থিত হইলেন ও নূতন শিষ্যদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।

সঙ্ঘমিত্রা সঙ্গে করিয়া বোধিবৃক্ষের এক শাখা লইয়া আসেন—সেই অশ্বথ বৃক্ষ যাহার তলে বুদ্ধদেব দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই শাখা অনুরাধাপুরে রোপিত হয় ও ইহা বদ্ধমূল হইয়া এইক্ষণে প্রকাণ্ড অশ্বথ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐতিহাসিক বৃক্ষের মধ্যে ইহা অতি প্রাচীন বলিয়া বিখ্যাত। খৃঃ পূঃ ২৮৮ শতাব্দে ইহা রোপিত, সুতরাং ইহার বয়ঃক্রম দুই সহস্র বৎসরের অধিক হইবে।

দেবানাং প্রিয় তিষ্য ২০ বৎসর রাজত্ব করিয়া মহেন্দ্রের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বহুতর রাজ-বিপ্লব সংঘটিত হয় কিন্তু মহেন্দ্র যে বীজ বপন করিয়া যান তাহা সতেজ সবল বৃক্ষ রূপে সিংহলে এরূপ বদ্ধমূল হয় যে তাহার উপর দিয়া রাজ-বিপ্লবের প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াও তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। গৌতমের মৃত্যুর ৩৩০ বৎসর পরে বত্ত-গামনীর রাজত্ব কালে ত্রিপিটক বৌদ্ধশাস্ত্র সিংহলী হইতে পালি ভাষায় প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। (মহাবংশ)

মহেন্দ্রের কয়েক শতাব্দী পরে বুদ্ধঘোষ, সিংহলে আসিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষ্য (অর্থকথা) প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। মহেন্দ্রের নীচেই তাঁহার নাম সিংহলে প্রকীর্ত্তিত। ৪৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহল হইতে ব্রহ্মদেশে গমন পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎপরে শ্যামদেশে ঐ ধর্ম্ম প্রবেশ করে, তথা হইতে সুমাত্রা যবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য স্থানে নীত হয়। সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে অনেকানেক বৌদ্ধ ভিক্ষু তিব্বত,

নেপাল, সিংহল, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ গমন করত ধর্ম্ম প্রচার করেন। ধন্য তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগ! ধন্য তাঁহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায়!

গ্রীকরাজ মিলিন্দ।—

উত্তরে খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সময় ভারতে গ্রীকরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও ঐ ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন ও গ্রীকরাজ মিলিন্দের মধ্যে যে বৌদ্ধমত সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা আছে তাঁহাতে নাগসেন যবনরাজের সমুদয় যুক্তি তর্ক খণ্ডন করিয়া কিরূপে স্বমত সমর্থন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বৌদ্ধ তপস্বীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজা কনিষ্ক।—

খৃষ্টাব্দ প্রবর্ত্তনের কিছু পূর্ব্বে এক শক জাতীয় নৃপতি উত্তর ভারত খণ্ডে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। ঐ জাতীয় তৃতীয় রাজা কনিষ্ক কাবুল হইতে পঞ্জাব, সিন্ধু হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত এক সুবিস্তৃত রাজ্য পত্তন করিয়া যান। কাশ্মীর তাঁহার রাজধানী। কনিষ্ক একজন উৎসাহী বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে জালন্ধরে যে মহাসঙ্ঘ হয় তাহা হইতে মহাযান গ্রন্থ সকল বিনিঃসৃত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই সভায় বৌদ্ধশাস্ত্রের তিনটী মহাভাষ্য সংস্কৃত ভাষায় প্রস্তুত হয় কিন্তু এই সকল গ্রন্থ হইতে মূলধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন সাহায্য হয় নাই। দক্ষিণে প্রথম হইতে বৌদ্ধশাস্ত্র সমুদয় পালি ভাষায় প্রস্তুত হওয়াতে ধর্ম্ম বিষয়ক

উচ্ছৃঙ্খলতা অনেকাংশে নিবারিত হয় উত্তরে সেরূপ দেখা যায় না। সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম কোন বন্ধন না পাইয়া কামরূপী মেঘের ন্যায় নানা স্থানে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম।—

৬১ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকৃত পত্তন হয়। প্রবাদ এই যে তখনকার সম্রাট মিং-তি স্বপ্ন দেখেন যে একটি সোনার দেবতা তাঁহার প্রসাদে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া তাহার অর্থ মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন। মন্ত্রী এই অর্থ করেন যে পশ্চিমাঞ্চলে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়াছে হয়ত তাঁহার সঙ্গে এই স্বপ্নের কোন যোগ থাকিবে। চীন সম্রাট বুদ্ধের আসল তথ্য জানিবার নিমিত্ত ভারতে দূত প্রেরণ করেন। দূতগণ দুইজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও পুঁথি ছবি প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস লইয়া প্রত্যাগমন করেন। সম্রাট ভিক্ষুদের উপদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার রাজধানীতে এক বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। সেই সময় হইতে চীন দেশে অল্পে অল্পে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইতে লাগিল। পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী কুমারজীব অপর ৮০০ ভিক্ষুক সাহায্যে চীন ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ করেন। তৎপরে ফাহিয়ান হুয়েন সাং ইৎসিং প্রভৃতি চীন পরিব্রাজকগণ ভারতের তীর্থ হইতে ফিরিয়া স্বদেশে ঐ ধর্ম্ম বিস্তার করেন, ক্রমে কনফ্যুসস্, তাও-মত ও অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্ম সংস্কারের সংশ্রবে চীনদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্ম এইক্ষণকার বিমিশ্র ভাব ধারণ করিয়াছে। ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে চীন ও কোরিয়া হইতে ঐ ধর্ম্ম জাপানে প্রবেশ লাভ করে। এইরূপ দক্ষিণে উত্তরে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ বিস্তার হইয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

মার্কিণ দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম।—

ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণে সিংহল শ্যাম ব্রহ্মাদি দেশে, উত্তরে নেপাল তিব্বত কাবুল গান্ধার, পূর্ব্বে চীন, চীন হইতে মোঙ্গলিয়া, কোরিয়া জাপান ও মধ্য এসিয়া খণ্ডে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম 'দূরাৎ সুদূরে' ছড়াইয়া পড়ে—এ সকল ত জানা কথা কিন্তু কলম্বসের আবিষ্ক্রিয়ায় ১০০০ বৎসর পূর্ব্বেও যে বৌদ্ধ প্রচারকগণ ঐ ধর্ম্ম আমেরিকায় লইয়া যান এ কথা অনেকের নূতন ঠেকিবে। বাস্তবিক যে তাহাই ঘটিয়াছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিষয়টী এরূপ কৌতুকাবহ যে পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। "কলম্বসের পূর্ব্বে আমেরিকার আবিষ্ক্রিয়া" শীর্ষক একটী সচিত্র প্রবন্ধ আমেরিকায় এক মাসিক পত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে এই স্থলে তাহা সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল; যাঁহারা সবিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তাহারা ঐ পত্র আনাইয়া দেখিবেন।

কতকগুলি প্রমাণ হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে যে পাঁচজন বৌদ্ধ ভিক্ষু রুষের উত্তর সীমা কামাটকাস্কা হইতে পাসিফিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া আলাস্কা দিয়া আমেরিকায় প্রবেশ পূর্ব্বক দক্ষিণে মেক্সিকো পর্য্যন্ত গমন করেন। ঐ পথ দিয়া আমেরিকা যাত্রা দুরূহ ব্যাপার নহে; মধ্যে যে আল্যুসিয়াদি দ্বীপপুঞ্জ আছে তাহা অতিক্রম করিয়া কি সহজে আমেরিকা পৌঁছান যায় মানচিত্র দৃষ্টে তাহা বুঝিতে পারিবেন; বলিতে কি চীন পরিব্রাজক দিগের স্থল-পথ দিয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ অপেক্ষা অনেক সহজ। মেক্সিকো ও তৎসন্নিহিত আদিম আমেরিকান-

বৌদ্ধধর্ম্ম

।তহাস, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, প্রাচীন কীর্ত্তি-কলাপের সকল এই ঘটনার সত্যতা বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রাচীন চীন গ্রন্থাবলিতে ফুসং নামক এক পুর্ব্বদেশের উল্লেখ আছে সে দেশের এক বৃক্ষ হইতে ফুসং নাম গৃহীত হয়। বর্ণনা হইতে মেক্সিকো দেশে 'আগুয়ে' বা 'মাগুয়ে, যে বৃক্ষ জন্মে তাহার সহিত ফুসং বৃক্ষের সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি হয়।

চীন সাহিত্যে হুইসেনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নামে একটী গ্রন্থ আছে, তার লেখাটী অত্যন্ত সরল, এমন কোন অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই যাহা লেখকের কল্পনা-প্রসূত বলিয়া মনে হয়। এই বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে হুই-সেন কাবুলবাসী ছিলেন, ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে য়ু-আন সম্রাটের রাজত্ব কালে ফুসং হইতে কিঞ্চেন রাজধানীতে আগমন করেন। তখন রাজ্য-বিপ্লব বশতঃ তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই, বিদ্রোহ থামিয়া গেলে পরবর্ত্তী নূতন সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তিনি ফুসং হইতে কৌতুক জনক নানা নূতন নূতন সামগ্রী ভেট লইয়া আসেন তাহার মধ্যে এক রকম কাপড় ছিল তাহা রেসমের মত নরম অথচ তার সূতা এরূপ কঠিন যে কোন ভারি জিনিস ঝুলাইয়া রাখিলেও ছিঁড়িয়া যায় না। মেক্সিকোর 'আগুয়ে' গাছ হইতেও ঐ রকম রেসম উৎপন্ন হয়। আর একটী সুন্দর ছোট দর্পণ উপহার দেন যাহার অনুরূপ দর্পণ মেক্সিকো অঞ্চলের লোকদের মধ্যে ব্যবহৃত হইত। রাজাজ্ঞায় হুই-সেনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত তাঁহার কথা মত লিখিয়া লওয়া হয় তাহার সারাংশ এই।ঃ—

পূর্ব্বে ফুসং বাসীরা বৌদ্ধধর্ম্মের কিছুই জানিত না, ৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে

সুং বংশীয় তা-মিং সম্রাটের রাজত্ব কালে কাবুল হইতে ৫ জন বৌদ্ধভিক্ষু ফুসং গমন করত সে ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেথানকার অনেকে বৌদ্ধ ভিক্ষু রূপে দীক্ষিত হয় ও তখন হইতে লোকদের রীতিনীতি সংশোধন আরম্ভ হয়। পরিব্রাজক ভিক্ষুরা কামাটকাঙ্কা হইতে কোন্ পথ দিয়া কিরূপে যাত্রা করেন, কোন্ পথ কত দূর, অধিবাসী দিগের আচার ব্যবহার কিরূপ ঐ গ্রন্থে সকলি বিন্যস্ত আছে। ফুসং বৃক্ষের গুণাগুণ, তার ছাল হইতে সূতা বাহির হওয়া ও বস্ত্র বয়ন ও তাহা হইতে কাগজ প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত যথাযথ বর্ণিত আছে। সে দেশে এক প্রকার রাঙ্গা পিয়ারা জন্মে ও প্রচুর দ্রাক্ষা জন্মানোর কথা আছে যাহা মেক্সিকো প্রদেশের ফলের সঙ্গে ঠিক মেলে। ও দেশে তাম্র পাওয়া যায়, লৌহ খনি নাই, সোনা রূপার ব্যবহার নাই, জিনিসের দরের ঠিক নাই। ওখানকার লোকেদের রাজ্যতন্ত্র, রীতিনীতি, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি পদ্ধতি, নগর দুর্গ সেনা ও অস্ত্র শস্ত্রের অভাব এই সকল বিষয়ের যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা, আর আদিম আমেরিকা, বিশেষতঃ মেক্সিকো অঞ্চলে যাহা দেখা যায় তাহার মধ্যে চমৎকার ঐক্য দৃষ্ট হইবে।

মেক্সিকো-বাসীদের মধ্যে এক জনশ্রুতি আছে যে একজন শ্বেতকায় বিদেশী পুরুষ, লম্বা শুভ্র বসন তার উপর এক আল-খাল্লা, এই বেশে আগমন করেন। তিনি লোকদিগকে পাপ পরিহার, ন্যায় সত্য ব্যবহার, শিষ্টাচার, মিতাচার এই সমস্ত ব্যবহার ধর্ম্মের উপদেশ দেন। পরে সেই সাধু পুরুষের উপর লোকের উৎপীড়ন আরম্ভ হওয়াতে তিনি প্রাণ-ভয়ে হঠাৎ এক-

দিন কোথায় চলিয়া গেলেন কেহই সন্ধান পাইল না, এক পাহাড়ের উপর তাঁর পদ চিহ্ন রাখিয়া গেলেন। তাঁহার স্মরণার্থ ম্যাগডালিনা গ্রামে তাঁহার এক প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় তার নাম উই-সি-পেকোকা, সম্ভবতঃ 'হুই-সেন-ভিক্ষু' নামের অপভ্রংশ। আর একজন বিদেশী ভিক্ষু কতকগুলি অনুচর সঙ্গে প্যাসিফিক সাগর তীরে আসিয়া নামেন। হয়ত তাঁহারা উল্লিখিত পঞ্চ ভিক্ষু। এই সকল ভিক্ষুরা যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন তাহা অনেকটা বৌদ্ধমতের অনুরূপ। স্প্যানিষ জাতি কর্ত্তৃক আমেরিকা বিজয় কালে তাঁহারা মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার জনপদে যে ধর্ম্ম মত ও বিশ্বাস প্রচলিত দেখেন, তাহাদের শিল্প, গৃহ নির্ম্মাণ-কৌশল, মাস গণনার রীতি প্রভৃতি যাহা প্রত্যক্ষ করেন, এসিয়ার ধর্ম্ম ও সভ্যতার সহিত তাহার এমন আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য যে তাহা দুই দেশের পরস্পর লোক সমাগম ভিন্ন আর কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

আর এক প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা ভাষাগত। এসিয়া খণ্ডে 'বুদ্ধ' নামের তেমন চলন নাই। বুদ্ধের জন্মনাম গৌতম এবং জাতীয় নাম শাক্যই প্রচলিত। এই দুই নাম এবং তাহার অপভ্রংশ শব্দ মেক্সিকোর প্রদেশ-সমূহের নামে মিলিয়া গিয়াছে। দেশীয় যাজকদের নাম এবং উপাধি ও ঐরূপ সাদৃশ্য ব্যঞ্জক।

গ্বাতেমালা = গৌতম-আলয়, হুয়াতামো ইত্যাদি স্থানের নাম; পুরোহিতের নাম গ্বাতেমোট্‌-জিন—'গৌতম' হইতে ব্যুৎপন্ন বোধ হয়। ওয়াস্কাকা, জাকাটেকাস, শাকাটাপেক, জাকাটলাম, শাকা-পুলাস এই সকলের আদি পদে শাক্য নামের সাদৃশ্য দেখা

যায়। মিক্স্‌টেকার প্রধান পুরোহিতের উপাধি হচ্ছে "তায়-সাক্কা" অর্থাৎ শাক্যের মানুষ। পালেঙ্কে একটী বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি আছে তাহার নাম "শাক্‌-মোল" (শাক্যমুনি)। কোলোরাডো নদীর একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে একজন পুরোহিত বাস করিতেন তাঁর নাম গৌতুশাক্কা (গৌতম শাক্য)। তিব্বতী কোন নাম চা'ন ত দেখিতে পাইবেন মেক্সিকোর পুরোহিতের নাম ত্লামা। আর এক কথা—মেক্সিকো দেশের নাম সেখানকার এক বৃক্ষ হইতে হইয়াছে; হুই-সেন যদি ঐ দেশে গিয়া থাকেন তাহা হইলে ফুসং বৃক্ষ হইতে দেশের নামকরণ করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমেরিকায় এমন কতকগুলি জিনিস পাওয়া গিয়াছে যাহা সে দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের মূর্ত্তি-মান প্রমাণ স্বরূপ। ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি, সন্ন্যাসী বেশধারী বৌদ্ধ-ভিক্ষু মূর্ত্তি, হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি (আমেরিকায় হস্তীর ন্যায় কোন জন্তু নাই), চীন পাগোডাকৃতি দেবালয়, প্রাচীরের গায়ে চিত্র, খোদিত শিলা, স্তূপ বিহার অলঙ্কার, এই সকল জিনিসে বৌদ্ধধর্ম্মের ছাপ বিলক্ষণ পড়িয়াছে।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে অধ্যাপক ফ্রায়র (Fryer) * স্থির করিয়াছেন যে ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রচার কার্য্যে আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক বিঘ্ন বাধা আপদ বিপদ অতিক্রম করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্য-সিদ্ধি ও

---

* "The Buddhist Discovery of America," *Harper's Magazine*, *July, 1901.*

করিয়াছিলেন। এইক্ষণে জাপানের সিন্-স্যু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ী তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রতী হইয়াছেন। স্যানফ্রান্সিস্কো সহর তাঁহাদের মিসনের পীঠস্থান। ইহার মধ্যে তাঁহারা ক্যালিফর্ণিয়া অঞ্চলে পাঁচজন প্রচারক প্রেরণ করিয়া মিসনের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রচারকেরা সেখানে যে ধর্ম্ম-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ৫০০ জাপানী বৌদ্ধ তাহার সভ্য। ক্যালিফর্ণিয়ার আর আর সহরে এই সভার ভিন্ন ভিন্ন শাখা সংস্থাপিত হইয়াছে। আমেরিকানদের জন্য প্রতি রবিবারে ইংরাজি ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্মানুযায়ী উপাসনাদি হইয়া থাকে। বিংশতি বা ততোধিক আমেরিকান তথায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে ১১ জন আমেরিকান বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইয়াছেন, ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের সারবত্তার সামান্য পরিচায়ক নহে।

উপসংহার।—

গৌতম যদি শুধু দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারে কৃতকার্য্য হইতেন কি না সন্দেহ। ন্যায় সাংখ্য বেদান্তাদি ষড় দর্শনের পাশে হয়ত বৌদ্ধ দর্শন সাত ভাইয়ের এক ভাই বলিয়া গণ্য হইত, আর কিছু নয়। সেইরূপ আবার বৌদ্ধনীতি শাস্ত্র বলে ও হিন্দু সমাজ বিকম্পিত হইত না। জাতি বর্ণ ছোট বড় বিচার না করিয়া বুদ্ধদেব সাধারণ সকল মনুষ্যের উপযোগী বিশুদ্ধ ব্যবহার ধর্ম্মের শিক্ষা ও উপদেশ দিয়াছেন সত্য বটে কিন্তু তাঁহার উপদিষ্ট নীতি শিক্ষা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ও অঙ্গীভূত, সেরূপ উচ্চ শিক্ষার গুণে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সাহায্য হইবার ও

সম্ভাবনা ছিল না। বাকী রহিল, বিনয়-শাস্ত্র নিয়মে বৌদ্ধ সমাজ বন্ধন, এক কথায় 'সঙ্ঘ'—এই এক শক্তি বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের মুখ্য সাধন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহা ছাড়া, সেই সময়কার রাজকীয় অবস্থা ও এই নূতন ধর্ম্ম বিস্তার পক্ষে অনুকূল বলিতে হইবে। নানাদিক্ হইতে নানা প্রকার শক্তি আসিয়া তখন ভারতের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই যে তৎকালে দেশীয় আচার বিচারের অনেক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। বৈদিক ধর্ম্ম কতকগুলি কর্ম্মজালে আচ্ছন্ন হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। সেই সময় আবার সেকন্দর-সা'র ভারত আক্রমণ হইতে যবন আধিপত্যের সূত্রপাত; অবশেষে গ্রীক প্রতাপ রোধ করিয়া মৌর্য্যবংশীয় শূদ্র রাজাদের অভ্যুদয়। সেকন্দর এদেশে কোন চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কিছু দিন পরে চন্দ্র গুপ্ত চানক্যের সাহায্যে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধ রাজ্য অধিকার করেন। চন্দ্র গুপ্ত জাতিতে শূদ্র ছিলেন। মৌর্য্য বংশীয় শূদ্র রাজাদের রাজত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় ও বিস্তার। মৌর্য্য বংশীয় রাজাদের এই ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক টান থাকা স্বাভাবিক। ভারতে এ দুইই নূতন শক্তি, উভয়েই ব্রাহ্মণ্যের বিরোধী—বৈদিক ধর্ম্মাসনে বৌদ্ধধর্ম্ম—ক্ষত্রিয়ের আসনে শূদ্র রাজা। শীঘ্রই এই দুই দলের মধ্যে সখ্য বন্ধন হইল। অশোক রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও পোষণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ এবং রাজকীয় দূরদর্শিতা দুয়েরই পরিচয় দিলেন। দূর দূর স্থিত রাজাদের সহিত অশোকের মিত্রতা-বন্ধন এই ধর্ম্ম প্রচারের আনুষঙ্গিক ফল।

তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রকে দিয়া দাক্ষিণাত্যেও তিনি তাঁহার ধর্ম্মাধিকার বিস্তার করিলেন। পরে একদিকে যেমন মৌর্য্যবংশের অবনতি হইল, অন্যদিকে, অর্থাৎ ভারতের উত্তর খণ্ডে, কয়েক শতাব্দী ধরিয়া গ্রীক্, পার্থিয়ান শকজাতির প্রভুত্ব বিস্তার হইতে চলিল। বৌদ্ধধর্ম্ম এই রাজ-বিপ্লবের ফলভাগী হইলেন। ব্রাহ্মণ্য কেবল হিন্দু জাতিতেই আবদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম্ম সকল জাতির সাধারণ সম্পত্তি। যবন রাজাদের সঙ্গে উত্তর হইতে যে সকল অসভ্য জাতি ভারতে প্রবেশ করিল বৌদ্ধধর্ম্ম তাহাদের আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। তা ছাড়া অশোকের প্রতাপে যেমন দাক্ষিণাত্য বিজিত হইয়াছিল, ঐ সকল রাজার প্রভুত্ব বলে তেমনি হিমালয়ের ওদিক্‌কার প্রদেশ, আফগানিস্থান, বাক্ট্রিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে তাহার প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত হইল।

উদয়াচল হইতে মধ্যাহ্নে উঠিয়া পরে ঐ ধর্ম্ম কালক্রমে অস্তোন্মুখ হইল। একদিকে যেমন সঙ্ঘ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও উন্নতি আবার সে ধর্ম্মের পতনের কারণ ও সেই সঙ্ঘ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মজ্জাগত একটী ঔদার্য্য আছে তাহাতে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকদিগকে স্বদলে টানিয়া লওয়া তাহার পক্ষে কঠিন নহে। মত ও বিশ্বাসের প্রভেদে তাঁহার এমন কিছু যায় আসে না। মতের অমিলে তিনি খৃষ্টীয় ইনকিজিসানের অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু একটী বিষয় তাঁহার অসহনীয়, সে কি না বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ—জাতি ভেদ প্রথার মূলোচ্ছেদ চেষ্টা। কোন নূতন সম্প্রদায় যতক্ষণ হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের বিরোধী হইয়া না দাঁড়ায়, ততক্ষণ

তাহাদের মতামত তিনি নিরপেক্ষ ভাবে দৃষ্টি করেন। এই হেতু বৌদ্ধ দর্শন শাস্ত্র ও নয়, বৌদ্ধ নীতি শাস্ত্র ও নয়, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্যের বৈরভাব উদ্রেক হইবার কারণ অন্য। আমার মতে "সঙ্ঘ"—তাহার খাঁটী ধর্ম্ম ভাগটুকু নয় সঙ্ঘের সামাজিক বন্ধন—দুই প্রতিযোগী ধর্ম্মের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার প্রধান কারণ। যখন বৌদ্ধ সঙ্ঘ কতকগুলি বিশেষ নিয়মে গঠিত হইয়া হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইল, যখন সে ব্রাহ্মণ শূদ্র গৃহী সন্ন্যাসী সকলকেই অবাধে স্বদল-ভুক্ত করিতে লাগিল, বিশেষতঃ যখন রাজারা, ধনাঢ্য গৃহস্থেরা ও তাহাকে বহুমূল্য দানাদি দ্বারা প্রশ্রয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন তাহা হিন্দু সমাজের চক্ষুঃ-শূল হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণ্য স্বীয় আধি-পত্য ও অর্থোপার্জনের পথ যুগপৎ অবরুদ্ধ দেখিয়া তাহার বিরুদ্ধে কটিবদ্ধ হইল। আমার মনে হয় বেদাচার বিরুদ্ধ সঙ্ঘের স্বতন্ত্র গঠন প্রণালী হইতেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের সাঙ্ঘাতিক বিরোধের সূত্রপাত। একদিকে ব্রাহ্মণ্যের গৃহাশ্রম, অন্যদিকে বৌদ্ধ সঙ্ঘের সন্ন্যাসধর্ম্ম; এক সমাজ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বর্ণাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্য সমাজ মনুষ্যের সাম্যবাদী কঠোর ধর্ম্মনীতি-মূলক; এই দুই পরস্পর বিরোধী শক্তি কত দিন আর শান্তি সদ্ভাবে কার্য্য করিবে? এই বিরোধ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া অবশেষে ব্রাহ্মণ্যের জয়, বৌদ্ধধর্ম্মের পতন সঙ্ঘটিত হইল।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম কোনকালে সমূলে নির্মূল হয় নাই। অনেক বৎসর ধরিয়া এই দুই ধর্ম্ম পরস্পর শান্তি সদ্ভাবে একত্রে বাস করে। হুয়েন সাং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত

হইতে ইতিপূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে, রাজা শিলাদিত্য ব্রাহ্মণ শ্রমণ উভয় পক্ষেরই আনুকূল্য করিতেন, উভয় দলকেই আমন্ত্রণ দানাদি দ্বারা পরিতুষ্ট রাখিবার প্রয়াসী ছিলেন। প্রয়াগে যখন তাঁহার মহাসভা হয় তখন তাহাতে উভয়ধর্ম্মাবলম্বী আচার্য্যদের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা চলে এবং বুদ্ধ সবিতা শিবমূর্ত্তি এক এক দিনে এক এক প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হয়। নাগানন্দ নামক বৌদ্ধ নাটক ঐ সময়কার প্রণীত, তাহাতেও বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়; ঐ নাটকের নান্দীতে 'মার দুহিতা অপ্সরাগণের মায়ামন্ত্রে অপরাজিত' ধর্ম্মবীর বুদ্ধের অবতারণা আছে। ইলোরা ও অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধ ও হিন্দু গুহামন্দির পাশাপাশি দেখা যায়, তাহাও এই দুই ধর্ম্মের সদ্ভাব-সূচক। খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দেও পশ্চিমাঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব উপলক্ষিত হয়। বেহার ও গোদাবরী প্রদেশে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ নৃপতিগণের রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের নিতান্ত হীনাবস্থা। 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটক, যাহা সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর ব্রাহ্মণ্যের আসন্ন বিজয় সূচিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উহার চিহ্ন সকল স্থানে স্থানে বর্ত্তমান, তৎপরে বৌদ্ধধর্ম্ম কিরূপে কোথা হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, আশ্চর্য্য!

বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংস—কারণ-নির্ণয়।—

ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার কারণ কি? এই প্রশ্ন লোকের মনে সহজেই উৎপন্ন হয় এবং ইহার উত্তরে

নানা মুনি নানা মত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও মুসলমানদের উৎপীড়নে বৌদ্ধেরা এদেশ হইতে বিতাড়িত হয়; এ মত যে নিতান্ত অমূলক তাহাও বলা যায় না। হিন্দুরা এক সময় বৌদ্ধদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহার উদাহরণ স্বরূপ রাজা সুধন্বার নৃশংস আদেশ-পত্র প্রকটিত হইয়াছে। তেমনি আবার মুসলমানেরা মুণ্ডিত মস্তকগণকে যার পর নাই উৎপীড়ন করেন—তাহাদের তীর্থক্ষেত্র সকল লণ্ডভণ্ড বিনষ্ট করিয়া ফেলেন, তাহারও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথা মানিয়া নিলেও এইরূপ স্থানীয় সাময়িক অত্যাচার বৌদ্ধধর্ম্মের সমূল উৎপাটনের প্রকৃত কারণ রূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। যে দেশ ধর্ম্মবিষয়ক এমন ঔদার্য্যগুণের জন্য প্রথিত; যে দেশে পরস্পর বিরোধী এত প্রকার মত ও সম্প্রদায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবাধে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে, সে দেশ হইতে নিরীহ বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলী তাড়াইবার জন্য কেনই বা সকলে খড়্গহস্ত হইবে? আর এক দলের মত এই যে, বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশ হইতে বলপূর্ব্বক বিতাড়িত হয় নাই—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত আস্তে আস্তে মিশিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম আপনার নিজস্ব মত-সম্পত্তির বিনিময়ে ব্রাহ্মণ্যের কিয়দংশ হরণ করিলেন—ব্রাহ্মণ্য ও কতক কতক বিষয়ে প্রতিপক্ষের মত ও ভাব গ্রহণ করিলেন এইরূপে পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষীণপ্রাণ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রখর ব্রহ্মতেজে বিলীন হইয়া গেল! আমার বিবেচনায় এরূপ হওয়া খুবই সম্ভব। শৈব শাক্ত তান্ত্রিক মত বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাহার যে কি রূপান্তর ও বিকৃতি উৎপাদন করিয়াছে আমরা

তাহা কতক কতক দেখিয়াছি, এইরূপে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত ও তাহার আদান প্রদান সংঘটিত হয় সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের ঐকান্তিক দুঃখবাদরূপ কঠোর ধর্ম্মনীতির কাঠিন্য নিবারণ চেষ্টা—আত্মপ্রভাবের সহিত দেবপ্রসাদের সম্মিশ্রণ—নিরীশ্বর বাদের স্থানে বুদ্ধ-দেবাদির পূজার্চ্চনা—নির্ব্বাণের স্থানে স্বর্গনরক কল্পনা—এই সমস্ত পরিবর্ত্তনে ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব বিলক্ষণ প্রতিভাত হয় কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম এইরূপে তাঁর নিজস্বত্ব বিসর্জ্জন করিবার দরুন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। আর একদিকে দেখিতে পাই বৌদ্ধধর্ম্মের সার্ব্বভৌম প্রেম ও মৈত্রীভাব, অহিংসা দয়া দাক্ষিণ্য, মনুষ্যে মনুষ্যে সাম্যভাব ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ, বর্ণবিচার বর্জনে আপামর সাধারণের জ্ঞান-ধর্ম্মে সমান অধিকার, বৈষ্ণব ধর্ম্ম এই সমস্ত উদার নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক বৌদ্ধদের নিজের অস্ত্রে তাহাদিগকে মর্ম্মাহত করিলেন। অপিচ, বিষ্ণুর দশাবতার অবতারণ করিয়া বুদ্ধাবতারগণকে পদচ্যুত করিলেন—শুধু তা নয়, বুদ্ধদেবকেও আপনাদের দেবমণ্ডলী মধ্যে স্থান দান করত আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। দেখুন হিন্দুরা লোক ভুলানো মন্ত্র তন্ত্র প্রয়োগে কেমন পটু!—তাঁহারা ধ্যানস্থ বুদ্ধকে যোগাসনারূঢ় মহাদেব গড়িয়া তুলিয়াছেন, কত কত বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধক্ষেত্র আপনাদের তীর্থ ও ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন, এবং বৌদ্ধদের ধর্ম্মক্রিয়া যাত্রা মহোৎসবাদিরও অনুকরণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বুদ্ধ গয়ায় একটি দেবালয়ে একখানি গোলাকৃতি প্রস্তরে দুইটি পদচিহ্ন আছে। ঐ দেবালয়ের নাম বুদ্ধপদ। প্রথমে উহা বুদ্ধপদ ছিল, পরে তাহা বিষ্ণুপদ বলিয়া প্রচারিত হয়। গয়াও পূর্ব্বে বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল;

পরে একটি প্রধান হিন্দুতীর্থ হইয়া উঠিয়াছে। গয়া মাহাত্ম্যে সুস্পষ্ট লিখিত আছে, তীর্থযাত্রীরা বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিবার পূর্ব্বে বুদ্ধগয়া গমন পূর্ব্বক বোধিবৃক্ষকে প্রণাম করিবেন—

ধর্ম্মং ধর্ম্মেশ্বরং নত্বা মহাবোধি তরুং নমেৎ।

জগন্নাথ ক্ষেত্র।—

জগন্নাথ ক্ষেত্রের ব্যাপারটিও বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বিলক্ষণ সংশ্লিষ্ট। জগন্নাথ বুদ্ধাবতার এইরূপ একটি জনশ্রুতি সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। দশাবতারের চিত্রপটে বুদ্ধাবতার স্থলে জগন্নাথের প্রতিরূপ চিত্রিত হয়। জগন্নাথের ত্রিমূর্ত্তি, রথযাত্রা, বিষ্ণুপঞ্জর প্রবাদ, বর্ণবিচার পরিহার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বৌদ্ধভাব প্রচ্ছন্ন দেখা যায়। শ্রীক্ষেত্রে বর্ণবিচার পরিত্যাগ হিন্দুধর্ম্মের অনুগত নয়—সাক্ষাৎ বৌদ্ধ-আদর্শ হইতে গৃহীত বলিলে বলা যায়। হুয়েন সাং উৎকলের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্র তটে চরিত্রপুর নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ বন্দর দেখিয়া যান। ঐ চরিত্রপুরই এইক্ষণকার পুরী বোধ হয়। উহার নিকটে পাঁচটি অত্যুন্নত স্তূপ ছিল। কনিংহাম সাহেব অনুমান করেন তাহারই একটি জগন্নাথের মন্দির। খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন বৌদ্ধেরা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তখন এই মন্দির প্রস্তুত হয়। স্তূপের মধ্যে বুদ্ধদেবের অস্থি কেশ প্রভৃতি দেহাবশেষ সমাহিত থাকে, ইহার দেখাদেখি জগন্নাথের বিগ্রহ মধ্যে বিষ্ণুপঞ্জর অবস্থিত, এইরূপ এক প্রবাদ রটিয়া গিয়াছে। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতে তীর্থযাত্রার সময় পথিমধ্যে তাতার দেশের অন্তর্গত খোটান নগরে একটি বৌদ্ধ মহোৎসব সন্দর্শন করেন, তাহাতে এক রথে তিনটি প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া

আসেন। মধ্যস্থলে বুদ্ধ মূর্ত্তি ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি বোধি-সত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। জগন্নাথের রথযাত্রা সম্ভবতঃ খোটানস্থ বৌদ্ধদিগের রথযাত্রার অনুকরণ এবং জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা বৌদ্ধত্রিমূর্ত্তির রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভূপালের প্রায় ৯ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তর বেতোয়া নদীতীরস্থ সাঞ্চিগ্রামে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অনেকগুলি স্তূপাদি আছে। সেই স্থানের দক্ষিণ দ্বারে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ী তিনটি ধর্ম্মযন্ত্র একত্র খোদিত রহিয়াছে। কনিংহাম্ সাহেব ঐ তিনটি বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এই ত্রিমূর্ত্তির বিজ্ঞাপক হওয়াই অতিমাত্র সম্ভাবিত বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি সাঞ্চি, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নানাস্থান হইতে, এমন কি, শক রাজাদিগের মুদ্রা হইতেও ঐ ধর্ম্ম-যন্ত্র অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লিখিত তিনটি ধর্ম্মযন্ত্রের সহিত জগন্নাথাদির তিন মূর্ত্তির বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কনিংহাম সাহেব ভিলসা স্তূপ বিষয়ক বত্রিশ সংখ্যক চিত্রপটে ঐ উভয়কেই পাশাপাশি করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন; দেখিলেই, শ্রীক্ষেত্রের বৈষ্ণব ত্রিমূর্ত্তি উল্লিখিত তিনটি বৌদ্ধ ধর্ম্মযন্ত্রের অনুকরণ বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হয়, বেশীর ভাগ কেবল চোখ নাক আর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ওষ্ঠ। বৌদ্ধেরা সচরাচর ‘ধর্ম্ম’কে স্ত্রীরূপে কল্পনা করেন, প্রস্তরেও ধর্ম্মের স্ত্রীমূর্ত্তি খোদিত দৃষ্ট হয়। নেপালে এই ধর্ম্ম ‘পারমিতা প্রজ্ঞা’ রূপিনী দেবী। খুব সম্ভব ইনিই জগন্নাথের সুভদ্রা—এইরূপ নারী-মধ্য ত্রিমূর্ত্তি অন্য কোন হিন্দু দেবালয়ের কোনরূপ পরিজ্ঞাত দেবাকৃতি নয়। তবেই হইতেছে জগন্নাথের জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্ম্ম।

বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধপদের চক্রচিহ্ন সবিশেষ বর্ণিত আছে। বৌদ্ধেরা বহুপূর্ব্বাবধি তাহার একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত থাকে। তাহাদের অনেকানেক মুদ্রা ও ঐ চিহ্নে চিহ্নিত দেখা যায়। শ্রীক্ষেত্রে বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্র খোদিত আছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেই বিষ্ণুচক্রকে বৌদ্ধদিগের ঐ বুদ্ধচক্র বলিয়া অনুমান করেন। জগন্নাথ ভিন্ন অন্য কোন দেবতার নিকট সুদর্শনের প্রতিরূপ দৃষ্ট হয় না, মিত্র মহাশয়ের উল্লিখিত অভিপ্রায়ই সমধিক সম্ভাবিত বলিতে হয়।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জগন্নাথক্ষেত্র পূর্ব্বে একটী বৌদ্ধ-ক্ষেত্র ছিল এই অনুমানটি একরূপ নিঃসংশয়ে নিষ্পন্ন হইতেছে।*

বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল বটে, তবুও হিন্দুসমাজে তার পূর্ব্ব প্রভাবের যে কতকগুলি চিহ্ন রাখিয়া গেলেন তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে। আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছি, অনেক সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি সে ঋণভার যেন আমরা বিস্মৃত না হই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৌদ্ধেরা ভারতে গৃহ নির্ম্মাণ বিদ্যার আদি গুরু—তাহাদের হস্তের কারুকার্য্য সকল সর্ব্বত্র তাহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি প্রচার করিতেছে। বৌদ্ধেরা কর্ম্মফলের অখণ্ডনীয় নিয়ম লোকের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেন। তাঁহারাই যজ্ঞে পশু হত্যা নিবারণ করিয়া,

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—দ্বিতীয়ভাগ।

অক্ষয়কুমার দত্ত।

The antiquities of Orissa Vol. II.

Dr. Rajendralal Mitra.

অহিংসা* ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করেন। দেখুন, কবি জয়দেব কি বলিতেছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধে রহহ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং
কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে!

বৌদ্ধেরাই সংযম, স্বার্থত্যাগ, জলন্ত ধর্ম্মানুরাগ, উদার ভ্রাতৃ-বন্ধনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যান, তাঁহাদের ব্যবহার ধর্ম্মের প্রভাব হিন্দুসমাজ হইতে কখনই সম্পূর্ণ বিদূরিত হইবার নহে। বুদ্ধ-জীবনীর সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, নিঃস্বার্থতা, ও উদার প্রেমগুণে সে ধর্ম্ম ভারতে চির-রঞ্জিত থাকিবে।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি ও বৌদ্ধ মতাবলম্বী লোকসংখ্যা গণনা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর প্রায় ৫০ কোটী লোক বৌদ্ধ মতাবলম্বী। কেহ কেহ বলেন এ গণনায় অত্যুক্তি দোষ আছে। হিসাবে অনেক বাদসাদ দিয়া ধরিয়া নিলেও এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ধর্ম্মের তুলনায় এ ধর্ম্মের ভক্ত-সংখ্যা

---

* বৌদ্ধদের ন্যায় জৈন-সম্প্রদায়ের লোকেরাও 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' পালন করিয়া থাকেন। ইঁহারা নিরামিষ ভোজী এবং অকারণ প্রাণিহত্যা নিবারণ উদ্দেশে সূর্য্যাস্ত পূর্ব্বে ইঁহাদের ভোজনের নিয়ম। তাহা ছাড়া ইঁহাদের অন্যান্য অনেক রীতিনীতি আচার ব্যবহারে জীবের প্রতি দয়া মায়া প্রকাশ পায়। কি জানি নিঃশ্বাস সহকারে কোন কীটপতঙ্গ উদরস্থ হয় এই আশঙ্কায় কেহ কেহ মুখে একরূপ বস্ত্র বন্ধন করিয়া রাখে। পশুর হাঁসপাতাল (পিঞ্জরা পোল), এই হাঁসপাতালে জরাজীর্ণ রুগ্ন অশক্ত পশু গ্রহণ ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন জৈনদের অহিংসা ধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব সুন্দর দৃষ্টান্ত।

নিতান্ত অবমাননার পাত্র নহে। এ ধর্ম্মের প্রথম অবস্থায় কে মনে করিতে পারিত—বুদ্ধদেব স্বয়ং কল্পনা করিতে পারেন নাই—যে ইহা কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সমুদায় এসিয়া খণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া অসংখ্য মানবকে আশ্রয় দান করিবে, অথচ ইহার নিজের জন্মভূমি ইহাকে দেখিবে না, চিনিবে না। আপন মাতৃক্রোড় হইতে বিতাড়িত হইয়া পৃথিবীর অজ্ঞাত কুলশীল বিজন প্রান্ত-বর্ত্তী অধিবাসীদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া বদ্ধমূল হওয়া আশ্চর্য্যের ব্যাপার সন্দেহ নাই। আপনারা এই বিচিত্র ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করুন। এ ধর্ম্ম জোর জবরদস্তীতে এ দেশ হইতে বিতাড়িত হইল কিম্বা শৈব শাক্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মে মিশিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল অথবা ইহা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া কাল-বিবরে প্রবিষ্ট হইল? হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান, হিন্দু আচার্য্যদিগের বুদ্ধি ও যুক্তি বল প্রয়োগ, মুসলমান অত্যাচার, বৌদ্ধধর্ম্মে ভজন পূজনের অনাদর, বেদাচারে অনাস্থা, অনাত্মবাদ, শূন্যবাদ, মন্ত্রতন্ত্র ভূতপ্রেত পিশাচ সিদ্ধি ইত্যাদি তান্ত্রিক কাণ্ডের প্রবেশ জনিত আদিম ধর্ম্মের অশেষ দুর্গতি, হিন্দু সমাজে সঙ্ঘ-নিয়ম প্রণালীর অনুপযোগিতা, উদ্বাহ বন্ধনের শৈথিল্য—এই ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম ধ্বংসের অনেকগুলি কারণ মনে হইতেছে। ইহাদের কোন্‌টা সযৌক্তিক কোন্‌টা অমূলক, আপনারা তাহা নিরূপণ করুন, আমি এইখানে এই প্রবন্ধ শেষ করি।

পরিশিষ্ট।

তেবিজ্জ সূত্ত।*

(ব্রাহ্মণ যুবকের প্রতি বুদ্ধদেবের উপদেশ।)

একদা বুদ্ধদেব বহুশিষ্য সমভিব্যাহারে কোশলরাজ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে 'মনসাক্বত' গ্রামে উপনীত হইলেন; গ্রামে পুষ্করসাতী, তারুখ্য প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর বসতি। তথায় তিনি অচিরাবতী নদী তীরস্থ এক আম্রবনে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন।

সেই সময়ে দুইজন ব্রাহ্মণযুবক তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা উভয়ে সত্যান্বেষী; ধর্ম্মালোচনায় অনেক তর্ক বিতর্কের পর তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। তাঁহাদের একজনের নাম বশিষ্ট ও অপরের নাম ভরদ্বাজ। বশিষ্ট যিনি, তিনি বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত হইয়া নিবেদন করিলেন।—

" মহাত্মন্, সত্য পথ কি এ বিষয় লইয়া আমাদের মহা তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, আমরা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। আমি বলি যে পথ দিয়া ব্রহ্মের সহিত মিলন হয়, পুষ্করসাথী ব্রাহ্মণ যাহার উপদেশ দিয়াছেন সেই সত্য পথ; ইনি বলেন, ব্রহ্মবাদী তারুখ্য ব্রহ্মলাভের যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই ঠিক। হে শর্ম্মণ, লোকে আপনাকে জগদ্‌গুরু বুদ্ধ বলিয়া

---

* ত্রয়ীবিদ্যা সূত্র Buddhist Suttas. Sacred Books of the East.—Rhys Davids.

জানে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি এই উভয় পথের মধ্যে কোন্ পথ ঠিক? এই ভিন্ন ভিন্ন পথ কি সকলি সত্য? এই মনসাকৃত গ্রামে নানাদিক্ হইতে নানান্ রাস্তা আসিয়া মিলিয়াছে সেইরূপ ঐ সমস্ত ধর্ম্ম-পথ কি সকলি আমাদিগকে গম্যস্থানে আনিয়া পৌছাইয়া দেয়? সকলি কি সরল সত্য পথ বলিয়া অনুসরণ করা যাইতে পারে?

বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের বিবেচনায় এ সমস্ত পথই কি সোজা পথ? ঠিক্ পথ?

দুজনেই উত্তর করিলেন—হাঁ আমরা তাহাই মনে করি।

বুদ্ধদেব কহিলেন—আচ্ছা, বল দেখি, সেই বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের মধ্যে কি এমন কেহ আছেন যিনি ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছেন?

উত্তর—না,

প্রশ্ন—তাঁহাদের গুরুর মধ্যে কি কেহ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন?

উত্তর—না,

প্রশ্ন—অনেকানেক বেদ রচয়িতা ঋষির নাম শ্রবণ করা যায়—যথা অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গীরস ভরদ্বাজ, বশিষ্ট, কাশ্যপ, ভৃগু—তাঁহারা কি বলিয়াছেন—আমরা ব্রহ্মকে জানি, আমরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি?

ব্রাহ্মণেরা পুনর্ব্বার ইহার উত্তরে 'না' বলায় বুদ্ধদেব দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু'একটী কথা পাড়িলেন—

মনে কর, এই চৌরাস্তার মাঝখানে কোন এক ব্যক্তি একটী সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিতেছেন—কিসের জন্য না সেই সিঁড়ি

দিয়া কোন এক বাড়ীতে উঠিতে হইবে। লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কৈ, বাড়ী কোথায়? যাহাতে চড়িবার জন্য এই সিঁড়ি নির্ম্মিত হইতেছে সেই বাড়ী কোথায়? পূর্ব্ব, পশ্চিম—দক্ষিণে কি উত্তরে? ইহা ছোট বড় মাঝারি, কি আকারের বাড়ী? ইহা প্রাসাদ কি কুটীর? ইহার উত্তরে যদি নির্ম্মাতা 'বলেন, আমি তা জানি না, তখন লোকে কি তাহাকে উপহাস করিয়া বলিবে না, যে বাড়ীতে উঠিতে চাহ সে বাড়ী কোথায় তাহা জান না,—সে বাড়ী কখন দেখ নাই অথচ তাহার সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিতে এত ব্যস্ত—এ কি কথা? ইহা কি বাতুলের প্রলাপ-বাক্য বলিয়া ধার্য্য হইবে না?

ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিলেন—তাঁহার সে কথা পাগলামী ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। বুদ্ধদেব কহিলেন, যে ব্রহ্ম বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, যাঁহাকে তাঁহারা জানেন না—যিনি তাঁহাদের প্রত্যক্ষ গোচর নহেন, ব্রাহ্মণেরা সেই ব্রহ্মের সহিত মিলন করাইয়া দিতে চান—সেই মিলনের পথ দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের কথা কি বাতুলের প্রলাপবাক্য তুল্য অগ্রাহ্য নহে? তাঁহাদের ব্রহ্মোপদেশের কি কোন্ অর্থ আছে?

অন্ধ কর্তৃক অন্ধ নীয়মান হইলে যাহা হয় এও তাহাই। যে অগ্রগামী সেও কিছু দেখিতে পায় না, যে পশ্চাতে চলিয়াছে সেও দেখিতে পায় না—ইঁহারাও সেই অন্ধের দল! বক্তাও অন্ধ, শ্রোতাও অন্ধ। এই সকল বেদবিৎ ব্রাহ্মণের উপদেশ সারহীন, অর্থহীন, তাৎপর্য্যশূন্য—কথাই সর্ব্বস্ব, তাহার কোন অর্থ নাই।

শোন বশিষ্ঠ, আর এক ব্যক্তি বলিতেছেন—এই নগরীর

মধ্যে একটী পরমা সুন্দরী রমণীর জন্য আমার চিত্ত বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। তাহার প্রতি আমার যে কি প্রগাঢ় প্রেম, কি অগাধ ভালবাসা তাহা কি বলিব? লোকে জিজ্ঞাসা করিল— আচ্ছা, এই পরমাসুন্দরী রমণী যাহার জন্য তোমার মন এমন চঞ্চল—এতই উতলা হইয়াছে এই রূপসী কিরূপ? ইনি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়—বৈশ্য শূদ্র কোন্ জাতীয়? ইনি কালো কি গৌরবর্ণ, ইঁহার নাম কি, নিবাস কোথায়?

ইহার উত্তরে যদি তিনি অন্ধকার দেখেন আর বলেন আমি তা কিছুই জানি না, তখন লোকে কি তাঁহাকে উন্মাদ ভাবিয়া উপহাস করিবে না? তাঁহার কথা কি কিছুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য মনে করিবে? কখনই না। পুনশ্চ মনে কর, -এই অচিরাবতী নদী বন্যার জলে ভরিয়া গিয়াছে—দুই পাড়ের উপর পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে—এমন সময়ে এক জন কোন কার্য্যবশতঃ পরপার যাইবার ইচ্ছা করে। সে যদি নদীকে ডাকিয়া বলে "হে নদি, তোমার ওপারটা উঠাইয়া আমার কাছে নিয়ে এস।" তাহা হইলে কি তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে?

ব্রাহ্মণেরা বলিল "হে গৌতম, তাহা কখনই হইতে পারে না।"

বুদ্ধদেব কহিলেন তোমাদের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণদেরও এই দশা। যে সকল সদ্‌গুণ যথার্থ ব্রাহ্মণ-লক্ষণ তাহা তাহাদের অঙ্গে নাই, যে সমস্ত অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব তাহা হইতে তাহারা বিরত অথচ তাহারা হে ইন্দ্র, হে সোম, হে বরুণ—ইন্দ্র সোম বরুণকে ডাকিয়া চীৎকার করে! এইরূপ প্রার্থনা, এই কাকুতি মিনতি স্তবস্তুতির কি ফল? তাহাতে

কি তাহাদের ইহলোকে ব্রহ্মলাভ হইবে, না মৃত্যুর পরে পরলোকে ব্রহ্মের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে? এরূপ কি সম্ভব?

হে বশিষ্ঠ, আরো ভাবিয়া দেখ, এই নদী জলপ্লাবনে প্লাবিত হইয়াছে, পাড়ের উপর পর্য্যন্ত জল ছাপাইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় কোন এক ব্যক্তি নদী পার হইতে চাহে, কিন্তু তার হাত পা কঠোর শৃঙ্খলে বাঁধা, সে যদি এইরূপে শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া এ পাড়ে দাঁড়াইয়া ভাবে আমি নদী পার হইব তাহা হইলে কি মনে কর তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে?

উত্তর—হে গৌতম, তাহা কথন হইতে পারে না।

বুদ্ধদেব কহিলেন—

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে পাঁচটি শৃঙ্খলের কথা আছে, পঞ্চপাশ, পঞ্চবন্ধন, পঞ্চ আবরণ;—সে পাঁচটি কি কি?

কাম।

দ্বেষ, হিংসা।

অহঙ্কার, আত্মাভিমান।

আলস্য।

বিচিকিৎসা—ধর্ম্মের প্রতি সংশয়।

এই পঞ্চ মোহ পাশ—পঞ্চ বন্ধন। এই বন্ধনে বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা আবদ্ধ, এই পঞ্চপাশে জড়িত হইয়া তাঁহারা চলৎশক্তি রহিত। হে বশিষ্ঠ, আমি সত্য বলিতেছি, এই ব্রাহ্মণেরা যতই বেদাভ্যাস করুন না কেন কিন্তু যে সকল গুণে যে সমস্ত অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব সে সকল গুণ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত,—সে সমস্ত অনুষ্ঠানে বিমুখ, তাঁহারা সংসার বন্ধনে

আবদ্ধ। মোহপাশে জড়িত তাঁহাদের আত্মা দেহত্যাগানন্তর ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবে ইহা কদাপি সম্ভব নহে।

হে বশিষ্ঠ, তোমরা ত অনেকানেক বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছ; ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বিষয়ে তাঁহারা কি উপদেশ দেন ?

ব্রহ্মের কি ধন-সম্পত্তি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আছে?

উত্তর—না।

ব্রহ্ম কি কাম ক্রোধে বিচলিত ?

উত্তর—না।

তিনি কি দ্বেষ হিংসা পরবশ ?

তিনি কি মদমাৎসর্য্য আলস্যের অধীন ?

উত্তর—না।

তিনি সংযমী না ব্যসনী ?

উত্তর—সংযমী।

তিনি পবিত্র স্বরূপ কি অপবিত্র ?

উত্তর— পবিত্র স্বরূপ।

কিন্তু হে বশিষ্ঠ, ব্রাহ্মণ চরিত্র কি ইহার বিপরীত নহে ?

তাঁহারা কি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন নহেন ?

উত্তর —হাঁ।

তাঁহারা কি কামাসক্ত ক্রোধ পরায়ণ নহেন ?

উত্তর—হাঁ।

তাঁহারা কি দ্বেষ হিংসা বর্জ্জিত ?

উত্তর—না।

তাঁহারা সংযমী অথবা বিলাসী ?

উত্তর—বিলাসী।

তাঁহাদের অন্তরাত্মা পবিত্র না পাপ-কলুষিত?

উত্তর—কলুষিত।

বুদ্ধদেব—ব্রাহ্মণেরা যখন সংসারাসক্তি হইতে বিমুক্ত হয় নাই—বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হয় নাই—তাহারা যখন ইন্দ্রিয় সেবায় অহোরাত্র নিমগ্ন—কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি মোহ বন্ধনে আবদ্ধ আর ব্রহ্ম, যিনি ইহার বিপরীতধর্ম্মা, তাঁহার সহিত মরণান্তর তাহারা মিলিত হইবে ইহা কি কখন সম্ভব মনে কর? তাহাদের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য কোথায়? আমি সত্য বলিতেছি এই সকল ব্রাহ্মণের উপদেশ ব্যর্থ, তাহাদের ত্রয়ীবিদ্যা পথশূন্য অরণ্য, নির্জলা নিষ্ফলা মরুভূমি সমান। তাহাদের লক্ষ্য এক, কার্য্য অন্যরূপ। তাহারা তাহাদের গম্য স্থানে পৌঁছিবার প্রকৃত সরল পথ ছাড়িয়া বিপথে পদার্পণ করে ও পথহারা পথিকের ন্যায় দিগ্‌ভ্রষ্ট হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

বুদ্ধদেব এইরূপ উপদেশ করিলে পর বশিষ্ঠ কহিলেন—

হে শর্ম্মণ, আমরা শুনিয়াছি—শাক্যমুনি সেই ব্রহ্ম-মিলনের পথ সম্যক্‌রূপে অবগত। আপনার নিকট হইতে আমরা সেই উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি—আমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়া মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করুন, ব্রহ্মকুল উদ্ধার করুন।

বুদ্ধদেব কহিলেন—

যে ব্যক্তি এই মনসাকৃত গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—যিনি এখানে আজীবন বাস করিতেছেন তিনি কি এই গ্রামের তাবৎ পথঘাট বলিয়া দিতে পারেন না?

উত্তর—অবশ্যই পারেন।

এই পৃথিবীতে সেইরূপ তথাগত বুদ্ধ সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন—তিনি বিজ্ঞানময়—মঙ্গল নিকেতন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ব্রহ্ম শর্ম্মন্ ব্রাহ্মণ—সুর নর মার ভূত প্রেত—সর্ব্ব চরাচর তিনি জানিতেছেন—সত্য তিনি নিজে জানিতেছেন ও অন্যকে উপদেশ দিয়া থাকেন। তিনি জগদ্গুরু—সেই সত্য ধর্ম্ম তিনি জগতে প্রচার করেন—যে ধর্ম্মের আদি মধুর, অন্ত মধুর—মধুর যাহার গতি—যাহার উন্নতি মধুময়।

যখন কোন গৃহস্থ উচ্চবংশীয়ই হউন আর নীচকুলজাতই হউন—তথাগত কথিত সত্য যখন তাঁহার শ্রুতি গোচর হয়—সে সত্য শ্রবণ করিয়া তিনি তথাগতের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করেন—

সংসার কেবলই দুঃখময়—সংসারী ব্যক্তি মোহ-পাশে আবৃত, বাসনাপঙ্কে নিমগ্ন—যিনি সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন বায়ুর ন্যায় তাঁহার মুক্ত জীবন। সংসারের মধ্যে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারে পরিবৃত হইয়া তিনি মহত্তর পবিত্রতর জীবনের স্বাদগ্রহে অক্ষম। অতএব অদ্য হইতে আমার প্রতিজ্ঞা এই যে শিরোমুণ্ডন ও গৈরিক বসন পরিধান করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসব্রতে জীবন উৎসর্গ করিব।

এইরূপে ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া তিনি প্রাতিমোক্ষের নিয়মানুসারে আত্মসংযম অভ্যাস করেন। ইনি সত্যেতে রমণ করেন—ধর্ম্ম ইঁহার জীবনের ব্রত। ইনি পাপের কুটিলপথ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ধর্ম্ম নিয়মে নিয়মিত করেন—প্রত্যেক কথায় প্রতি কার্য্যে ইনি ধর্ম্মের আদেশ পালন করেন—

ধর্ম্মপথ হইতে কদাপি বিচলিত হয়েন না। সাধু ইঁহার সঙ্কল্প—সাধু ইঁহার চরিত্র—ইন্দ্রিয়দ্বারের আটে ঘাটে শত শত প্রহরী নিযুক্ত—আত্মনির্ভর ইঁহার নির্ভর-যষ্টি—আত্মপ্রসাদে ইনি সদাই সুপ্রসন্ন—ইঁহার বিশুদ্ধ চিত্তক্ষেত্রে আনন্দের উৎস নিয়ত উৎসারিত হইতে থাকে।

সুগভীর ভেঁরী নিনাদ আকাশে উত্থিত হইয়া যেমন সহজে দিগ্বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করে ইঁহার প্রেমও সেইরূপ বিশ্বব্যাপী; ক্ষুদ্র বৃহৎ উচ্চ নীচ কাহাকেও ইনি অবহেলা করেন না—কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। ইঁহার প্রীতি মৈত্রী মমতা সর্ব্বভূতে সমভাবে বিস্তৃত। সর্ব্ব জীবে ইঁহাব দয়া বাৎসল্য। ইঁহার চক্ষে উচ্চ নীচে প্রভেদ নাই, আত্মপর সমান। ব্রহ্মলাভের এই একমাত্র পথ। যিনি সত্য অবলম্বন করিয়াছেন, কাম ক্রোধ লোভ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, যিনি বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছেন—দ্বেষহিংসা যাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না—পবিত্র যাঁহার চরিত্র—কায়মনোবাক্যে যিনি ধর্ম্মের অষ্টবিধ মহামার্গ অবলম্বন করিয়া চলেন—সেই যে ভিক্ষু সাধু পুরুষ, ব্রহ্মের সহিত তাঁহার জীবনের সাদৃশ্য আছে কি না?

—উত্তর—অবশ্যই আছে।

এই ভিক্ষু সাধু পুরুষ দেহত্যাগানন্তর ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবেন ইহা সর্ব্বতোভাবে সম্ভব।

বুদ্ধদেবের উপদেশ সমাপ্ত হইলে বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া নিবেদন করিলেন—

হে প্রভো! আপনার এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমরা ধন্য হইলাম, যাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাহা আপনি

গড়িয়া তুলিলেন—যাহা প্রচ্ছন্ন তাহা প্রকাশ করিলেন—যে বিপথগামী তাহাকে সৎপথ প্রদর্শন করিলেন—অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিয়া অন্ধকে চক্ষু দান করিলেন। প্রভো! আমরা বুদ্ধের শরণাপন্ন হইতেছি—ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইতেছি—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি (বৌদ্ধভ্রাতৃ-বর্গের) শরণাপন্ন হইতেছি। অদ্য হইতে আমাদিগকে আপনার চিরভক্ত শিষ্যরূপে দীক্ষিত করিয়া কৃতার্থ করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

ব্যাখ্যা—

বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলন করিতে করিতে সহজেই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়—ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মত ও বিশ্বাস কি ছিল? তৎকাল প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত তাঁহার সম্বন্ধই বা কিরূপ ছিল? উল্লিখিত সূত্র হইতে এই প্রশ্নের উত্তর কিয়দংশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণ যুবকেরা মৃত্যুর পরে ব্রহ্মের সহিত মিলনের উপায় অন্বেষণ করিতেছেন অর্থাৎ বৈদান্তিক মতে জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গিয়া সে ব্রহ্মেতে কিসে লয় প্রাপ্ত হইতে পারে তাহার সরল পথ তাঁহারা জানিতে চাহেন—গৌতমের প্রতি তাঁহাদের প্রশ্নও তদনুযায়ী। বুদ্ধদেব যে উপায় বলিয়া দিলেন, যে পথ প্রদর্শন করিলেন তাহা ধর্ম্ম-নীতিসূচিত সহজ মার্গ। আত্মসংযম—বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন—সন্ন্যাসগ্রহণ—চরিত্রশোধন—সার্ব্বভৌম মৈত্রী মমতা—এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মলাভের কোন ঐন্দ্রজালিক উপায় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

এই সূত্রে ব্রহ্মের সহিত মিলনের কথা যাহা প্রশ্নোত্তরে ব্যক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ কি? বৌদ্ধধর্ম্ম মতে তাহার অর্থ ঠিক

করা সহজ নহে। ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে বুদ্ধের সময় পৌরাণিক ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন নাই। বেদান্ত ও উপনিষদের ব্রহ্ম আর বৌদ্ধ ব্রহ্মা যে একই এমনও মনে করিবেন না। নাম এক হইতে পারে কিন্তু ভিন্নার্থে প্রয়োগ সন্দেহ নাই। আর্য্যধর্ম্ম প্রকৃতি পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ মঞ্চে এক ব্রহ্মের উপাসনায় বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে এই বৈদান্তিক ব্রহ্মোপাসনার ভাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ব্রহ্মবিদ্যার কথা দূরে থাকুক, বৌদ্ধধর্ম্ম দেহাভ্যন্তরে আত্মার পৃথক সত্তাই স্বীকার করেন না, অথচ দেখিতে গেলে হিন্দুধর্ম্মের দেব দেবীর নাম, দেব দেবীর প্রতি বিশ্বাস তাহার মধ্যে কতক অংশে স্থান পাইয়াছে—এই দুই ভিন্ন জিনিস, বিভিন্ন ভাবের সামঞ্জস্য করা এক বিষম সমস্যা।

বৈদিক দেবতাগণ বৌদ্ধধর্ম্মে সাধুপুরুষের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন তাহার উর্দ্ধে পদনিক্ষেপ করেন না।—বড় জোর তাঁহারা বৌদ্ধ ভিক্ষুর সমকক্ষরূপে পরিগণিত হইতে পারেন। এই সকল দেবতার আরাধনা পূজার্চ্চনা বৌদ্ধধর্ম্মে আদিষ্ট হয় নাই। দেবতারা অমর নহেন, অন্যান্য জীবের ন্যায় তাঁহারাও মরণধর্ম্মশীল। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে তাঁহারা নিজ নিজ কর্ম্মগুণে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিয়া ক্রমে নির্ব্বাণরাজ্যে—হয়ত বৌদ্ধ অর্হৎ মণ্ডলীর মধ্যে স্থান পাইতে পারেন। ব্রহ্মাও সেইরূপে কল্পিত। অপর জীবের ন্যায় তিনিও মৃত্যুর অধীন—তিনিও বুদ্ধ নির্দ্দিষ্ট সন্মার্গ অবলম্বন করিয়া কালক্রমে নির্ব্বাণমুক্তি লাভের অধিকারী।

সে যাহা হউক, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বৌদ্ধমতে ব্রহ্মা ইতরজীব অপেক্ষা বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মহা-পুরুষ বলিয়া পরিগণিত, সুরবৃন্দের মধ্যে যেমন সুরপতি দেবেন্দ্র। কথিত আছে যে তাঁহার পূর্ব্বজন্মে যখন কাশ্যপবুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন ব্রহ্মা সাহক নামক পরমভক্ত ভিক্ষু বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। জাতক টীকাকার বলেন যে ব্রহ্মা বুদ্ধ-দেবের ভবিষ্যৎ জন্ম ধারণ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহবান ছিলেন এবং তৎপরে বোধিসত্ত্বের জীবনে 'মার' রাক্ষস যখন তাহাকে অশেষ প্রলোভন ও বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া ঘোরতর বিপদে ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল সেই 'মার' দমনে ব্রহ্মা দুইবার সহায়তা করেন। 'মার' বিজয়ের পর যখন বুদ্ধদেব তাঁহার উপার্জ্জিত সত্য প্রচারে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন তখন ব্রহ্মাদেব তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া সে সংশয় ভঞ্জন করত তাঁহাকে সত্য ধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহিত করেন। আবার কথিত আছে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুকালে যে গগনভেদী গভীর শোকধ্বনি সমুত্থিত হয় ব্রহ্মা সহাম্পতির কণ্ঠ হইতে প্রথমে সে বাণী উদ্গীরিত হইয়াছিল ও পরবর্ত্তী কালে একবার বৌদ্ধধর্ম্মসমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৌদ্ধনেতৃবর্গের মধ্যে সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপনপূর্ব্বক সে বিপ্লব প্রশমন করেন।

এই সমস্ত উদাহরণ হইতে বৌদ্ধজগতের সহিত ব্রহ্মার কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। শুধু এই মর্ত্ত্যলোক নয় কিন্তু অনন্ত আকাশের স্থানে স্থানে যে লোক-পুঞ্জ অবস্থাপিত এক এক জন ব্রহ্মা তাহার অধিপতিরূপে কল্পিত দেখা যায়।

এই ব্রহ্মার সহিত মিলন আর বৈদান্তিক ব্রহ্মেতে জীবাত্মার

বিলীন হইবার ভাব যে একই তাহা কে বলিবে ? বৌদ্ধমতে সে মিলনের অর্থ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত একত্র সহবাস ভিন্ন আর কিছুই কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এই সহবাস-লাভ বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ নহে; বৌদ্ধমতে মনুষ্যজীবনের পরম গতি —চরম লক্ষ্য স্বতন্ত্র। বৌদ্ধধর্ম্মের সার উপদেশ এই যে প্রত্যেক মনুষ্য নিজ কর্ম্মগুণে, নিজ পুণ্যবলে, আত্মপ্রভাবে, স্বার্থবিসর্জ্জনে, সত্যোপার্জ্জনে, প্রেম দয়া মমতা বর্দ্ধনে ইহজীবনে অথবা পরলোকে নির্ব্বাণরূপ পরমপুরুষার্থ সাধনে সমর্থ।

এই নির্ব্বাণমুক্তি কি —আলো কি অন্ধকার —জাগরণ কি মহানিদ্রা—অনন্তজীবন কিম্বা চিরমৃত্যু—শাশ্বতআনন্দ অথবা চেতনাশূন্য মহানির্ব্বাণে জীবাত্মার অস্তিত্বলোপ ;—এই নির্ব্বাণমুক্তি কি, বৌদ্ধশাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া আপনারা তাহা স্থির করুন—আমি এইখানে এই প্রবন্ধের উপসংহার করি।*

---

* এই ব্যাখ্যায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল Rhys Davids 'তেবিজ্জ সুত্তের' টীকায় সেইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। সুত্রের বুদ্ধকথিত ভাগে ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ঠিক বলা যায় না—মূল পালি না দেখিলে ইহার মীমাংসা হয় না কিন্তু ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইলেও ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়া এই তত্ত্বে যে বুদ্ধের নিজের বিশ্বাস তাহা সপ্রমাণ হয় না। তিনি ব্রাহ্মণদের কথার সত্যতা ধরিয়া নিয়া স্বমতানুযায়ী ধর্ম্মপথ দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র।